বিশ্ব বিচিত্র

শচীন্দ্রনাথ বসু



୨୮୮୧

বিশ্ব বিচিত্র

লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞান :

প্রাগিতিহাসের মানুষ (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)

জীবনী :

Jagadis Chandra Bose

ভ্রমণ :

দেশান্তরী

সব হারানোর দেশে

রম্য রচনা :

মিহি ও মোটা

গল্প :

শনিবারের সন্ধ্যায়

কয়েকটি ঋতু

উপন্যাস :

মায়াপুরী

সাত সমুদ্র

সীতার স্বয়ংবর

নতুন ঠিকানা

শিল্পী : শ্যামল সেন ও শচীন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ব বিচিত্র

মহাকাশ ও জ্যোতির্লোকের কাহিনী

শচীন্দ্রনাথ বসু

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
বোম্বাই • কলিকাতা • মাদ্রাজ • নয়াদিল্লী
ব্যাঙ্গালোর • হায়দ্রাবাদ

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস
৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১
অন্যান্য অফিস
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০১৩
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই ৪০০০৩৮
৩৬এ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০১
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩-৫-৮২০ হায়দারগুডা, হায়দ্রাবাদ ৫০০০০১

প্রথম মুদ্রণ : ১৯৭৪

দাম : বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রাকর : শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশক : শ্রী এন. ভেঙ্কু আয়ার, ম্যানেজার
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলিকাতা ৭০০০১৩

ভূমিকা

কয়েক বছর আগে ইচ্ছা হয়েছিল বিশ্বের সৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষের প্রথম সভ্যতাগুলির শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিবৃত্ত সাধারণের উপযুক্ত করে লিখবার। মাত্র এক খণ্ডে এই মহাকাহিনীর সম্যক বর্ণনা সম্ভব নয়। প্রথম বইখানি ('প্রাগিতিহাসের মানুষ') আসলে দ্বিতীয় পর্ব, পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ থেকে আরম্ভ করে তা শেষ হয়েছে সভ্যতার দরজায় এসে। 'বিশ্ব বিচিত্র' প্রথম পর্ব, কিন্তু দুইই স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী।

বর্তমান বইয়ের বিষয় মহাকাশ ও জ্যোতির্লোক—এতে আছে সর্বাধুনিক তথ্য অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড, নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির পরিচয়; পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের কথা; পরিশেষে গ্রহান্তরে প্রাণের সম্ভাবনার আলোচনা। মহাকাশে নতুন আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের খবরে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা বেড়ে চলেছে, সুতরাং আশা করি এ রচনা কালোপযোগী। প্রায় প্রতি দিন আমরা বিশ্বলোকের নানা স্থানে চমকপ্রদ আবিষ্কার ও সম্ভাবনার কথা শুনতে পাই, এ সব তথ্যের অনেক কিছু এতই সাম্প্রতিক যে তা এখনও কোনও দেশী বা বিদেশী গ্রন্থে স্থান পায় নি। এগুলি এই বইতে শেষ পর্যন্ত সংযোজিত হয়েছে।

মাপজোকের মান সম্বন্ধে দু-কথা বলা দরকার। এ দেশে এখনও মিটার গ্রামের পাশাপাশি ফুট পাউন্ড চলছে, অন্তত সাধারণ লোকের হিসাবে, সুতরাং এখানে সাধারণত ক্ষেত্র অনুসারে দুই রীতিরই ব্যবহার হয়েছে। তবে তাপের মাত্রা (ডিগ্রি) সর্বত্র দেওয়া হয়েছে সেন্টিগ্রেডে। এ ছাড়া উল্লেখ্য যে ইংরেজি z অক্ষরের উচ্চারণ বোঝাতে জ় হরফটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

শচীন্দ্রনাথ বসু

সূচীপত্র

১। ঐতিহাসিক বিবর্তন

অনেকে বলেন যত রকম বিজ্ঞান আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জ্যোতিষ। বহু সহস্র বছর আগেও আদি কালের বন্য মানুষ আকাশের দিকে চেয়ে অবাক হয়েছে। প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্মান সূর্যকে ঐ জগতের প্রভু বলে মেনে নিতে কষ্ট হয় নি, তার তুলনায় মৃদু স্নিগ্ধ চন্দ্রকে মনে হয়েছে স্ত্রীধর্মী (যদিও অনেক দেশে চাঁদ প্রথমে পুরুষ রূপে কল্পিত)। তা ছাড়াও আছে রাত্রির গোলাকার আকাশের অসংখ্য তারা। সূর্যের দৈনিক গতি, চাঁদের মাসিক হ্রাস বৃদ্ধির থেকে সহজেই এদের প্রাণী বলে ভেবে নিয়েছে আদিমানব; উপরন্তু ঐ জগৎটার থেকেই ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ তেড়ে এসে তাকে বিপর্যস্ত করেছে, সুতরাং তাদের ক্ষমতাও সে সভয়ে স্বীকার করেছে। সূর্য চন্দ্র হয়তো মানুষের প্রথম দেবতা, আজও পূজিত অনেক জায়গায়।

কিন্তু মানুষের মন আর পশুর মন এক নয়, ভয় ভক্তির মধ্যেও অনুসন্ধিৎসা মরে নি, তার সঙ্গে ছিল ঐ আকাশটাকে নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা। পথহারা পথিক বা যাযাবর গোষ্ঠী আকাশের তারার দিকে চেয়ে দিক নির্ণয় করেছে, নাবিক তার নৌকার হাল ঘুরিয়েছে; সূর্যের গতি জানিয়েছে দিনের ক্ষণ, চাঁদ ও তারাদের অবস্থান রাত্রির প্রহর। পরিবর্তন ও গতি লক্ষ করে দিন মাস ঋতু বছর ভাগ করেছে মানুষ। এরা ইঙ্গিত দিয়েছে কখন বর্ষা আসবে, কখন বীজ বুনতে হবে।…

লিখতে শিখবার আগেই মানুষ এই সব জ্যোতিষ্কের নামকরণ করেছে, লিখতে শিখে সে যখন সভ্যতার সূচনা করলে তখন থেকেই দেখি আকাশ দেবতার পুরোহিতরা তার তুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐ নতুন বিদ্যা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে তৎপর হয়েছে। অবশ্য তখনও এই বিদ্যাকে জ্যোতিষ বলা যায় না, তা ছিল বরং ছদ্ম জ্যোতিষ, বা গণৎকারের শাস্ত্র (astrology), কিন্তু বিজ্ঞান না হয়ে থাকলেও তার ব্যবহারিক মূল্য কম ছিল না। প্রায় ৬০০০

বছর আগে ইতিহাসের উষায় মানুষের মন যখন অর্ধসুপ্ত তখন নীল নদীর কূলের চাষীরা বীজ বুনত যে দিন উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধক (Sirius) দেখা দিত পুব গগনের এক বিশেষ জায়গায়। সেই কালেই কাল্‌দীয় (Chaldean) পুরোহিতরা মিনারের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রহরের পর প্রহর আকাশ নিরীক্ষণ করেছে, বানিয়েছে নক্ষত্র কুলের মানচিত্র ও গতির তালিকা, ক্রমে গড়ে উঠেছে বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্‌ডার, সুবিধা হয়েছে চাষ আবাদের বা নানা রকম ধর্ম কর্মের তারিখ নির্ণয় করতে। এ দেশে বেদের এক শাখা বা বেদাঙ্গ হল জ্যোতিষ—আদি কালে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন যাগ যজ্ঞের দিন ক্ষণ স্থির করা।

বর্তমান ইরাকের আদি নাম মেসোপটেমিয়া, অর্থাৎ দুই নদীর অন্তর্বেদী দেশ; টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর কোলে এইখানে মানুষের সভ্যতা নানা ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। পুরোহিতরা সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের গতিবিধির সম্পূর্ণ হিসাব রাখত, চন্দ্র গ্রহণের কারণ না জানলেও তার দিন ক্ষণ বলতে পারত। এই অঞ্চলে অক্কদ-সুমের রাজ্যের অধিপতি সারগন রাজত্ব করেছেন প্রায় ৪৫০০ বছর আগে, মাটির ফলকে উৎকীর্ণ তখনকার যে লিপি প্রত্নবিৎরা উদ্ধার করেছেন তার থেকে পাওয়া যায় জ্যোতিষ চর্চার সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য; যথা, বছরের মাপে ছিল এক সহস্রাংশেরও কম ভুল। দক্ষিণ আমেরিকার লোকে প্রায় এ যুগে বাইরের জগতের আড়ালে এই বিদ্যায় আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখিয়েছে, তাদের মায়া সভ্যতা যে বর্ষপঞ্জী বানিয়েছে তা নাকি আজকের পাশ্চাত্ত্য ক্যালেন্‌ডারের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেয়। চীন দেশের দলিলেও ৪০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রহণের খবর আছে। প্রকৃত পক্ষে, যখন থেকে জ্যোতিষ্কের গতি দিয়ে মানুষ সময় মাপতে শিখেছে তখন থেকেই প্রকৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু।

অবশ্য নানা রকম সমস্যাও ছিল। ভবিষ্যৎ গ্রহণের তারিখ জানা এক কথা আর তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। চাঁদের স্নিগ্ধ থালাটিকে কে ঢেকে দিল, দিনের রাজা ঐ প্রকাণ্ড সূর্য আস্তে আস্তে কার পেটে চলে গেল, দিন দুপুরে আঁধার নেমে এল ধরায়—এ সব নিশ্চয় খুব আশ্চর্য মনে মনে হয়েছে। সে কালের মানুষ আকাশের গায়ে বিভিন্ন তারামণ্ডলের (constellation) নাম দিয়েছে, সূর্য যে মণ্ডলে চলাফেরা করে তাকে ১২

ভাগে ভাগ করে দ্বাদশ রাশি বানিয়েছে, কিন্তু গোটা পাঁচেক অস্থির তারা যারা এই ঈষৎ বিস্তৃত চক্রের মধ্যেই অবস্থান করে তাদের অবাধ্য গতি-বিধি এদের কাছে একেবারেই বোধগম্য হয় নি। আজ আমরা জানি এই অস্থির যাযাবররা তারা নয়, গ্রহ। এ সব দেখে শুনে ঐ জগৎটাকে যে এক অতিপ্রাকৃত দেবলোক মনে হয়েছে তা আর আশ্চর্য কি। সেই জন্যই দেখি মিশর ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়ায় শত শত মন্দির তৈরি হয়েছে সূর্য বা কোনও স্থির তারার দিকে মুখ করে; খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দের কাছাকাছি তৈরি ইংলন্ডের স্টোনহেন্জ মন্দির গ্রীষ্ম-মধ্যদিনের সূর্যোদয়ের মুখোমুখি, পিকিং শহরের 'স্বর্গবেদী' শীত-মধ্যদিনের সূর্যোদয়ের।

বলা বাহুল্য, আদি মানুষের কল্পনাপ্রবণ মন দেশে দেশে বিশ্বের নানা রকম চেহারা গড়ে তুলেছে। ব্যাবিলনী, মিশরী ও হিব্রুদের বিশ্ব ছিল ঝিনুকের মত, তার মুখ শক্ত করে বন্ধ, চার দিকে জল। ব্যাবিলনের ঝিনুকটি গোল, পৃথিবী তার মধ্যে এক ফাঁপা পাহাড়; মিশরের বিশ্ব চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র (rectangle) রূপী অথবা অনেকটা বাক্সের মত ব্যাপার। পৃথিবী তার মেঝে, আকাশ হয় একটা গরু যার চার পা পৃথিবীর চার কোণে অবস্থিত, নয়তো একটি স্ত্রীলোক যে আছে কনুই ও হাঁটুর উপর ভর করে; পরে আকাশকে কল্পনা করা হয়েছে এক গোল ধাতব ঢাকনার মত। বিশ্ব-বাক্সের ভিতরে দেয়ালের উঁচু স্তর ঘিরে বয়ে চলেছে এক নদী। তার উপর নৌকায় চলছে সূর্য ও চন্দ্র দেবতা, নানা দরজা দিয়ে কখনও বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢুকছে। নক্ষত্রের দল অসংখ্য প্রদীপ, হয় তারা আকাশ-ঢাকনার থেকে ঝুলছে, নয়তো অন্যান্য দেবতারা তাদের ধরে আছে। গ্রহরাও নৌকা করে চলেছে নানা খাল বেয়ে, তাদের উৎপত্তি ছায়াপথে (Milky Way)। প্রতি মাসের ১৫ তারিখের কাছাকাছি এক হিংস্র মাদি শুয়োর চন্দ্র দেবতাকে আক্রমণ করে এবং পক্ষ কাল ধরে গেলে; তার পরে তার নতুন করে জন্ম হয় আবার। কখনও কখনও শুয়োরটা তাকে একেবারে সম্পূর্ণ গিলে ফেলে, তখন হয় চন্দ্র গ্রহণ। কখনও এক সাপ সূর্যকে গেলে, তখন সূর্য গ্রহণ। বিভিন্ন দেশের পুরাণে এই রকম অসংখ্য গল্প পাওয়া যায়।

আমাদের বৈদিক বিশ্বের পৃথিবী থালার মত, তার উপরে স্বর্গ, সেখানে

চলাফেরা করে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রের দল ; এর মাঝামাঝি অন্তরীক্ষ—পাখি, মেঘ ও অর্ধদেবতাদের বাসক্ষেত্র। ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ ব্রহ্মের ডিম, তার কারণ হিন্দু ধর্মে বিশ্বের তাই রূপ ; অণ্ডটি ২১ স্তরে ভাগ করা, উপর থেকে গুনলে সপ্তম স্তরে পৃথিবী, ছ রকম স্বর্গের নীচে ; পৃথিবীর তলায় যথাক্রমে সাত পাতাল ও সাত নরক। এই ব্রহ্মাণ্ড ঝুলছে মহাশূন্যে, অন্যান্য বিশ্বের অনেক দূরে।

গ্রীসের কবি হোমারের ধারণায়ও পৃথিবী এক থালা, তাকে ঘিরে ওশিয়েনাস নামক নদী, উপরে উলটো করা বাতির মত আকাশ-ঢাকনা। কিন্তু আর মাত্র দু তিন শো বছর পরে এই গ্রীসেই মানুষ প্রথম আজগুবী অতিকথায় বিশ্বাস হারিয়ে বৈজ্ঞানিক পথে ভাবতে শিখল। সেটা ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দে, যে সময়ে ভারতে বুদ্ধ, চীনে কনফ্যুসিয়াস ও লাও ৎসে দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনার বিপ্লব সাধন করেছিলেন। যে সব গ্রীসীয়রা বিশ্ব ও বিশ্বের উপাদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথিকৃৎ তাঁদের নাম আইয়োনীয়, তাঁরা প্রকৃত গ্রীসবাসী নন, ঈজীয় সাগরের অপর পারে বর্তমান তুরস্কের নানা গ্রীসীয় শহরে তাঁদের বাস ছিল।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ব্যক্তি মাইলিটাস শহরের থেলিজ়, প্রায় ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি পৃথিবীর গোল চেহারা কল্পনা করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালে এক সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যা পরে ফলেছিল। তিনি বলতেন বিশ্বের উপাদান জল, সব কিছুই জল থেকে তৈরি। থেলিজ় সম্বন্ধে এক মজার গল্প অ্যারিস্‌টট্‌ল বলেছেন তাঁর 'রাজনীতি' পুস্তকে। সবাই নাকি তাঁকে গরিব বলে খোঁটা দিত, বলত এর থেকেই বোঝা যায় দর্শন চর্চা কোনও কাজে লাগে না। কিন্তু রাশি নক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর যে জ্ঞান ছিল তার থেকে এক শীতে তিনি টের পেলেন যে পরের বছর প্রচুর জলপাই ফলবে। সুতরাং যা কিছু পয়সা ছিল তা দিয়ে তিনি জলপাই-পেষা কলগুলি সস্তায় সংগ্রহ করলেন। গাছ যখন ফলে ছেয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে কল ভাড়া করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন তিনি নিজের খুশি মত দর হেঁকে সেগুলি ভাড়া দিলেন, বেশ কিছু পয়সা এল ঘরে। তিনি প্রমাণ করলেন যে ইচ্ছা করলে দার্শনিকরাও ধন

সংগ্রহ করতে পারে—কিন্তু ইচ্ছাটা তাদের অন্য দিকে।

মাইলিটাস গোষ্ঠীরই দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যান্ডার বলতেন বিশ্ব মহাকালে (time) অনন্ত ও মহাকাশে (space) অসীম, এবং ইতিপূর্বে অসংখ্য বিশ্ব এসেছে, আবার মিলিয়ে গিয়েছে। এই ধারণার মধ্যে আমরা ভারতীয় ভাবনার প্রতিধ্বনি পাই। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের পৃথিবী কিন্তু বাতাস-পরিবৃত থামের মত এক বস্তু, বিশ্বের কেন্দ্রে সোজা হয়ে ভাসছে তা; গোল আকাশে বায়ুমণ্ডল আবদ্ধ; আগুনভরা এক চাকার গায়ে ফুটো আছে, সেখান দিয়ে যে তেজ বার হচ্ছে তাকেই আমরা সূর্য বলে জানি। এই ধরনের মতবাদ সে কালের গ্রীসে আরও মিলবে, এগুলি আজগুবী হলেও একটা জিনিস লক্ষনীয় যে ঐ ব্যাখ্যাগুলি অতিপ্রাকৃত নয়—কোনও অদৃশ্য দেবতার হাত বা সূর্য-গেলা সাপ ইত্যাদি কল্পনা করতে হয় না।

অনেকে বলেন পিথাগরাস (জন্ম ৫৭০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি) সর্বপ্রথম পৃথিবীকে গোলক রূপে কল্পনা করেন; পরে তাঁরই শিষ্যরা এও বলেন যে পৃথিবী স্থির নয়, মহাকাশে গতিশীল। তাঁর বাস ছিল সেমস দ্বীপে। দার্শনিক মহারথ প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ) অবশ্য খাস গ্রীসের লোক, প্রথম দিকে তিনি ভাবতেন যে দেবতারা জ্যোতির্ময় রথে চড়ে আকাশে চলে বেড়ান, তাই আমরা জ্যোতিষ্ক বলে জানি; পৃথিবী গোলক না চ্যাপটা তা নিয়ে ভেবে তিনি প্রথম সম্ভাবনাই মেনে নিলেন চন্দ্র গ্রহণের সময়ে চাঁদের গায়ে তার ছায়া দেখে। পৃথিবী যে নিজের অক্ষকে (axis) ঘিরে ঘোরে তাও তিনি মেনে নিয়েছিলেন। প্লেটো ছিলেন আদর্শবাদী কবি, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে এই দৃশ্যমান জগৎ, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র প্রকৃত জগৎ নয়, তার ছায়া মাত্র—প্রকৃত জগৎ জানা কখনও সম্ভব নয়। এই নিরঙ্কুশ আদর্শ-প্রীতির ফলে তাঁর মনে সব রকম আকৃতির মধ্যে নিখুঁত বৃত্তের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল : তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীই শুধু গোলক নয়, সব জ্যোতিষ্ক চলে বৃত্তাকার পথে।

প্রাকৃতিক জগৎটা সম্বন্ধে আর এক মহারথ অ্যারিস্টট্লের বেশ কিছু ভুল ধারণা ছিল। তাঁর পৃথিবী স্থির, তাকে ঘিরে পেঁয়াজের খোসার মত একের পর এক ন'টি ফাঁপা গোলক, নিকটতম খোসায় চাঁদের স্থান, অষ্টমটিতে স্থির তারাদের দেশ, এবং একেবারে শেষেরটিতে আছেন

সৃষ্টির ধাতা, এই জটিল যন্ত্রের চালক। অ্যারিস্‌টট্‌লের পরমেশ্বর অনেকটা আমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত—“অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তা”, ইত্যাদি।

গ্রীসে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা পড়লে গ্রীসীয় সংস্কৃতির রাজধানী এর পরে মিশরের অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রিয়া শহরে স্থানান্তরিত হল। এই শহর অবশ্য অ্যালেক্‌জ্যান্‌ডার জয় করেছিলেন, তাঁর নামেই নাম, এইখানে খৃষ্ট জন্মের দু তিন শো বছর আগে অনেক আশ্চর্য জ্যোতিষীয় চিন্তার সূত্রপাত হয়েছে। পৃথিবী যে অত্যন্ত অস্থির, সে যে শুধু নিজের অক্ষকে ঘিরে লাট্টুর মত ঘুরপাক খায় না, এই স্বাবর্তন (rotation) ছাড়া বিস্তীর্ণ কক্ষে (orbit) প্রদক্ষিণও (revolution) করে তা দৃঢ় বিশ্বাস করতেন অ্যারিস্‌টার্কাস (৩১০-২৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দ)। তা ছাড়া তিনি এও বলেছিলেন যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। এই সব বিশ্বাসের জন্য তাঁকে অধার্মিকতার দোষে দায়ী করা হয়—এই পথিকৃতের অনেক পরে ইয়োরোপে অনেককে ঠিক এই সব বিশ্বাসের জন্য খৃষ্ট ধর্মের অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে।

অ্যারিস্‌টার্কাসের বৈপ্লবিক চিন্তা সে কালে তখন কারও মনে বিশেষ দাগ কাটে নি, কারণ তাঁর দেশবাসীদের চোখে অস্থির পৃথিবীর কল্পনা ছিল ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাঁর অল্প পরেই ১৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি হিপার্কাস গড়ে তুললেন পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বের এক ছবি, তাতে স্থির পৃথিবী-গোলককে ঘিরে চন্দ্র সূর্য গ্রহরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বিধি সম্পূর্ণ ভুল হলেও এদের স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে তিনি এমন জটিল জ্যামিতির সৃষ্টি করলেন যার সাহায্যে পূর্বতন জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিল পাওয়া গেল, ভবিষ্যদ্‌বাণীও সম্ভব হল, যেমন গ্রহদের বিপরীত গতি সম্বন্ধে ; কোনও গ্রহ (যেমন শুক্র) যখন চলতে চলতে আপাতদৃষ্টিতে ক্রমে মন্থর হয়ে থেমে যায়, তার পর উলটো দিকে চলে তখন দেখা যায় এই বিপরীত বেগ। প্রায় ১৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রিয়ার ক্লডিয়াস টলেমি হিপার্কাসের পদ্ধতি পূর্ণ মাত্রায় গড়ে তুললেন। এই জটিল ব্যবস্থা যেন নানা রকম চাকা ও গোলকের এক জবড়জং যন্ত্র। গ্রহ নক্ষত্রের গতি ব্যাখ্যা করতে দরকার হল চল্লিশটি চক্র। মিল্‌টন তাঁর ‘প্যারাডাইজ় লস্‌ট’ কাব্যে এই ব্যবস্থাকে ঠাট্টা করে দু ছত্র লিখেছেন।

স্পেনের কাস্‌টিল অঞ্চলের অধিপতি দশম আল্‌ফোন্‌সো (ত্রয়োদশ শতাব্দ) নাকি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "পরমেশ্বর যদি সৃষ্টি আরম্ভ করবার আগে আমার পরামর্শ নিতেন আমি তাঁকে এর চেয়ে সহজ কিছু বাতলে দিতাম।" আশ্চর্য এই যে ভুলের উপর গড়া এই টলেমীয় পরিকল্পনাকে বহু শতাব্দ ধরে টলাতে পারে নি কোনও রকম পর্যবেক্ষণী পরীক্ষা।

এই অবসরে আমরা এক বার ভারতের উপর চোখ বুলিয়ে নেব, কিন্তু তার আগে ইয়োরোপের এক কবি সম্বন্ধে দু কথা বলা যেতে পারে। তাঁর নাম লুক্রেশিয়াস, জন্ম খৃষ্টের প্রায় ১০০ বছর আগে, বাস রোম শহরে। 'কবি' শব্দের প্রাচীন অর্থ জ্ঞানী, এই দুই অর্থই প্রযোজ্য এই ব্যক্তিটির প্রতি। মানুষের ইতিহাসে এ যাবৎ যত মনীষী কুসংস্কারের অন্ধ কামরায় আলোর জানলা খুলেছেন, যাঁদের উদার কল্পনা সহজেই অন্ধ বিশ্বাসের সীমা টপকিয়েছে ইনি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কবি হলেও তাঁর চিন্তা ও কল্পনায় ছিল বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতা, তিনি যে কিছু কিছু ভুলও লিখেছেন তাতে তাঁর ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয় না। 'বিশ্ব চরিত্র' নামক গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা নেই, তার কারণ তার বাইরে কিছু কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া, বিশ্বের এত খুঁত যে তা ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। অন্যত্র তিনি লিখছেন, "মানুষ যখন দেখল নৈসর্গিক ঘটনা নিয়ম অনুযায়ী অনুবর্তিত হচ্ছে, ঋতুগুলি চক্রবৎ পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন সে এ সবের কোনও কারণ খুঁজে পেল না। সুতরাং সব সমস্যার সে সমাধান করলে সব কিছু দেবতাদের হাতে তুলে দিয়ে, তাদের খেয়াল খুশিকে সব কিছুর জন্য দায়ী করে।"

ভারতে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ সব শাস্ত্রেই পৃথিবী চ্যাপটা বলে কল্পিত হয়েছে। যদিও খৃষ্টীয় যুগের আরম্ভে অনেক জ্যোতির্বিৎ ও জ্ঞানী বুঝতে পারেন যে তা ভুল তথাপি পৃথিবীর থালা রূপটাই টিঁকে গিয়েছিল। ভারতীয় জ্যোতিষীদের পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সঙ্গে যোগ ছিল। তাঁরা সেখান থেকে কিছু কিছু শিখেছিলেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উন্নতিও করেছিলেন। বগদাদের খলিফারা ভারতীয় জ্যোতিষীদের নিয়ে যেতেন তাঁদের সভায়। প্রাচীন ভারতীয়দের সাতটি 'গ্রহ' ছিল—সূর্য চন্দ্র

বুধ শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি শনি। তাঁরা পৃথিবীকেন্দ্রিক টলেমীয় বিধান অনুযায়ী হিসাবের কাজ করতেন। যদিও ভুললে চলবে না যে ভারতেও এক অ্যারিস্টার্কাসের উদয় হয়েছিল পঞ্চম খৃষ্টাব্দে। এঁর নাম আর্যভট, পৃথিবীর স্বাবর্তন ও সূর্যকেন্দ্রিক প্রদক্ষিণের কথা ইনিও বলেছিলেন, কিন্তু তাতে কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরিবর্তন কিছু ঘটে নি।

প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান সম্ভারের আজ সম্ভবত চিহ্ন থাকত না যদি না আরবীরা অনুবাদ ও চর্চা করে তা বাঁচিয়ে রাখত। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দে তারা উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন জয় করার পর এই জ্ঞান ইয়োরোপে প্রবেশ করে। জেনিথ, নাডির, অ্যাল্ম্যানাক, ইত্যাদি জ্যোতিষীয় শব্দ ঐ দেশ থেকে আমদানি। তার সঙ্গে ইয়োরোপ পায় যাকে আমরা বলি আরব্য সংখ্যা শ্রেণী। আসলে ৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তা ভারতে প্রথম উদ্ভাবিত হয়। তেমনি ভারতের সৃষ্টি দশমিক পদ্ধতি বহু কাল আরবীদের আবিষ্কার বলে ধরা হয়েছে, যদিও এই পদ্ধতির আরব্য নামই হিন্দিসৎ, অর্থাৎ 'ভারতীয় (কলা)'। ব্যবসায়ের কাজে তাদের বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসত, হয় তাদের থেকে নয়তো যে আরবীরা ৭১২ সালে সিন্ধু দেশ জয় করেছিল তাদের থেকে এই বিদ্যা মুসলমান জগতে ছড়িয়ে পড়ে, তার পর সেখান থেকে পাশ্চাত্ত্যে। গণিতে ভারতের তৃতীয় আবিষ্কার হল শূন্য। শূন্য ও অনন্তের (**infinity**) তাৎপর্য সম্বন্ধে মধ্যযুগে ভারতীয় গণিতবেত্তাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। অধ্যাপক ব্যাশাম লিখেছেন যে গুপ্ত রাজাদের সময়ে গণিতে ভারত সব দেশের অগ্রগামী ছিল, কারণ ভারতীয়রা বস্তু বা পরিমাপ বাদ দিয়ে সংখ্যাকে শুধু সংখ্যা বলে ভাবতে পারত। তাঁর মতে নতুন সংখ্যা পদ্ধতির আবিষ্কর্তা অজ্ঞাত ভারতীয়টির স্থান বুদ্ধের পরেই।

এই সব আমদানির ফলে ইয়োরোপে গণিত ও জ্যোতিষের অগ্রগতি অনেক সহজ হয়ে গেল। পূর্বে প্রচলিত রোমক সংখ্যা শ্রেণী লিখতে অনেক জায়গা নেয়, তাদের নিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগও জটিল ব্যাপার। অঙ্কের সংখ্যা ডাইনে বাঁয়ে এক ঘর সরিয়ে তাকে দশ গুণ বাড়ানো কমানো সম্ভব হল, খালি জায়গাগুলি শূন্য বসিয়ে ভরে দেওয়া গেল। নতুন সংখ্যা শ্রেণী ও দশমিক পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা বহু গুণ বাড়িয়ে দিল, যেন তাদের হাত থেকে এক ভারি শিকল খুলে দিয়ে। এই সময়ে আর একটি জিনিসের অত্যন্ত প্রয়োজন

ছিল, তা হল সময় মাপবার নির্ভরযোগ্য উপায় ; ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষে ইয়োরোপে প্রথম ঘড়ি তৈরি হয়।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম নাম নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), তিনি পোল্যান্‌ডবাসী এক অখ্যাত রুটি ব্যবসায়ীর পুত্র, পরে হয়েছিলেন ধর্মযাজক। বহু কাল আগে অ্যারিস্টার্কাস সৌর লোকের যে চেহারাটা কল্পনা করেছিলেন তিনি তার প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন করে—কিন্তু অত্যন্ত দ্বিধামন্দ চালে, যেন নতুন কিছু বলছেন না, কারণ তাঁর স্বভাবটা ছিল খুব সাবধানী। তাঁর প্রধান বইখানি যখন প্রকাশ পেল তখন তিনি পক্ষাঘাতে মরণাপন্ন—বস্তুত ঠিক মৃত্যুর দিন সেই বই তাঁর হাতে আসে। কিন্তু তাঁর সতর্কতায় বিশেষ ফল হয় নি, প্রধানত প্রোটেস্‌টান্‌ট বিপ্লবের জনক মার্টিন লুথারের বিরুদ্ধতার ফলে তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব নিয়ে প্রচণ্ড ধর্মীয় বিতর্ক গড়ে ওঠে। এইখানে একটা কথা বলা দরকার যা অনেকের ভাল জানা নেই ; যদিও এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সব কিছুর মাঝখানে আছেন সূর্য··· রাজসিংহাসনে বসে শাসন করছেন গ্রহ পরিবার যারা ঘুরছে তাঁকে ঘিরে", তবু শেষ কালে কোপার্নিকাস সূর্যকে ঠিক কেন্দ্রে স্থান দেন নি, একটু তফাতে রেখেছিলেন, বরং পৃথিবী যে বিন্দুকে ঘিরে বৃত্ত পথে ঘোরে তাই ছিল তাঁর সৌর জগতের কেন্দ্র। পার্থক্যটা অবশ্য সামান্যই, এবং আজ আমরা এও জানি যে পৃথিবীর পথ ঠিক বৃত্তাকার নয়।

কোপার্নিকাসের বিশ্বে আকাশের যত জ্যোতিষ্ক (অর্থাৎ গ্রহ তারা) তারা সব এক কেন্দ্রকে ঘিরে ঘোরে না। পৃথিবী শুধু চন্দ্রের কক্ষ পথের কেন্দ্র, বিশ্বের নয়। সৌর লোক ও বিশ্বের মাঝখানে আছে সূর্য। স্থির তারারা এত দূরে যে তুলনায় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সামান্য। আকাশকে যে আমরা ঘুরতে দেখি তা ভুল, পৃথিবীর দৈনিক স্বাবর্তনের জন্য ঐ ধারণা হয়। পৃথিবী যে সূর্যকে ঘিরে ঘোরে অন্যান্য গ্রহগুলির মত, তারই ফলে প্রতীয়মান হয় সূর্যের বার্ষিক গতিবিধি (যদিও আসলে সে স্থির) এবং অন্যান্য গ্রহদের অবস্থিতি ও বিপরীত গতি। আমরা জানি সূর্য বিশ্বের কেন্দ্র স্থল তো নয়ই, অতি নগণ্য এক নক্ষত্র সে ; এও জানি যে সে সম্পূর্ণ স্থির নয়। তবু এই ভীরু সাবধানী সন্ন্যাসব্রতীর নির্জন চিন্তা যে কতখানি সত্যকে

ধরতে পেরেছে, তার থেকে যে কত বড় বিপ্লব সাধিত হয়েছে তা ভেবে দেখলে তাঁর অসামান্য প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। এই সূর্যকেন্দ্রিক বিধানের ফলে অনেক দিনের জমানো জঞ্জাল দূর হয়ে অগ্রগতির পথ খুলে গেল।

কিন্তু এই বিপ্লবও সঙ্গে সঙ্গে সফল হয় নি, প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে নি বলে। কোপার্নিকাসের শিষ্যদের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, এক জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। এমন কি ষোড়শ শতাব্দের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টিকো ব্রাহে তাঁর মত বর্জন করেছিলেন, অবশ্য তিনি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর বিধানে অন্যান্য পাঁচ গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকল, এবং সূর্য সদলবলে পৃথিবীকে। কিন্তু দুই নৌকায় পা বেশী দিন রাখা চলে না ; তিনি অনেক উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম যন্ত্র বানিয়েছিলেন, তাদের দ্বারা যা তথ্য সংগৃহীত হল তাতে কোপার্নিকাসেরই সমর্থন বেড়ে চলল। সূর্যকে তার ন্যায়সঙ্গত স্থানে ফিরে পেতে এ বার আর অত দেরি হয় নি।

মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর আবর্তন যারা মানতে চায় নি তারা যে শুধু বাইবেলের নজির দেখিয়েছে তাই নয়, পৃথিবী ঘুরলে মেঘরা পিছনে পড়ে যেত, প্রাণীরা ছিটকে বেরিয়ে যেত শূন্যে এমন কথাও বলেছে। অভিকর্ষ (gravity) তখনও জানা ছিল না।

টিকো ব্রাহে যেমন ছিলেন যন্ত্র বানাতে ওস্তাদ, ইয়োহান কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০) তেমন ছিলেন গণিতে পারদর্শী। প্রথম জনের জন্ম ডেনমার্কে, অভিজাত পরিবারে, মানুষটি ছিলেন একগুঁয়ে ও বদমেজাজী ; দ্বিতীয় জনের জারমেনিতে, সমাজের নীচের স্তরে। টিকো ব্রাহের শেষ বয়সে কেপ্‌লার তাঁর সহকারী হয়ে কাজ করেন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রবাসে—এই দুই বিভিন্ন প্রতিভার সংযোগ জ্যোতিষ শাস্ত্রের পক্ষে ভাগ্যের কথা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে জ্যোতির্বিদ্যার এই দুই দিকপাল গণৎকারী বিদ্যায়ও বিশ্বাসী ছিলেন, গ্রহ-গণিতের সঙ্গে মানুষের ভাগ্য গণনাও চলত। কেপ্‌লারের নাকি ধারণা ছিল পৃথিবী এক অতিকায় জন্তু।

যাই হক, কেপ্‌লার গ্রহদের গতি সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুতর কয়েকটি বিষয় আবিষ্কার করে গিয়েছেন। সেই প্লেটোর কাল থেকে যে বিশ্বাস চলে আসছিল যে বিশ্বের সব গতি আদর্শ বৃত্তের আকার মেনে চলে তাতে তিনি

ঘা দিলেন, টিকো ব্রাহের সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রমাণ করলেন গ্রহ কুলের কক্ষ উপবৃত্ত (ellipse), অতি সামান্য চ্যাপটা করা চাকার মত, সূর্য আছে তার কেন্দ্রে নয়, দুই নাভির (focus) একটিতে। আর একটি আদর্শ ভেঙে গেল যখন তিনি দেখালেন যে গ্রহদের বেগ সর্বদা সমান নয়, গুরুমশায় সূর্যের কাছাকাছি তারা দ্রুত চলে, যত দূরে যায় তত ঝিমিয়ে পড়ে। ঠিক কি হিসাবে এই বেগ বাড়ে কমে কেপ্‌লার তাও বলে দিলেন! তাঁর আবিষ্কৃত তৃতীয় নিয়ম সূর্য থেকে দূরত্বের সঙ্গে গ্রহদের প্রদক্ষিণ কালের সম্পর্কটাও বেঁধে দিল।

ইটালির গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) কেপ্‌লারের প্রায় সমসাময়িক। তাঁকে দূরবীক্ষনের আবিষ্কর্তা বলে সবাই জানে, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ১৬০৯ সালে একটি উত্তল (convex) ও একটি অবতল (concave) লেন্‌স (পেটমোটা ও পেটসরু কাঁচ) এক সীসার নলে বসিয়ে তিনি যে দূরবিন বানিয়েছিলেন তা তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে এক ওলন্দাজ উদ্‌ভাবনের খবর থেকে ধার করা। তাঁর আগে ঐ সালেই ইংলন্‌ডে টমাস হ্যারিয়ট নামক এক ব্যক্তি দূরবিন দিয়ে চাঁদ পর্যবেক্ষণ করে তার মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। সেই সময়ে প্যারিসে চশমার দোকানে দূরবিন বিক্রি হত, এবং তার আগের বছর জারমেনির ফ্রাংকফুর্ট শহরে এক মেলায় একটি দূরবিন বিক্রির জন্য আনা হয়েছিল। যাই হক, তা বলে গ্যালিলিওর কৃতিত্ব অস্বীকার করা চলে না ; ইতিপূর্বে যা ছিল এক আজব জিনিস তাকে তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে পরিণত করেছেন, তার বিবর্ধনী শক্তি বাড়িয়েছেন (৩২ গুণ পর্যন্ত) এবং অন্যান্য উন্নতি সাধন করেছেন, আকাশ রাজ্যের খবর এমন ভাষায় পরিবেশন করেছেন যে সকলে অবাক হয়ে বুঝেছে খুব আশ্চর্য একটা কিছু ঘটছে। দূরবিন যে দুরধিগম বিস্ময়কর বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল তার সম্বন্ধে মিল্‌টন তাঁর পূর্বোক্ত কাব্যে লিখেছেন :

Before [his] eyes in sudden view appear
The secrets of the hoary Deep—a dark
Illimitable ocean, without bound
Without dimension···

অর্থাৎ দৃষ্টির সামনে হঠাৎ উন্মুক্ত হল আদিম অতলের রহস্য—এক অসীম আঁধার মহাসিন্ধু, তার নেই প্রান্ত, নেই পরিমাপ।

ভেনিসের স্যান মার্কো মিনারের চূড়ায় প্রথম দূরবিনটি বসিয়ে গ্যালিলিও রাজ্যসভার সদস্যদের ডেকে ঐ আশ্চর্য বিশ্বের চেহারাটি যখন দেখালেন তখন দেশময় সাড়া পড়ে গেল। তার পর বাড়ির একেবারে মাথায় তাঁর ঘরখানিতে বসে রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকারে দিনের পর দিন তিনি অসীম আকাশের পথে পথে মগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ালেন—প্রথম দেখলেন চাঁদের পাহাড়, তার পর বৃহস্পতির চার উপগ্রহ, শনি গ্রহের দু পাশেও দুটি চাঁদ সন্দেহ করলেন। প্রশ্ন জাগল যে যে গ্রহের চার উপগ্রহ সেই বৃহস্পতি যদি সূর্য প্রদক্ষিণ করতে পারে, তবে একটি চাঁদ নিয়ে পৃথিবী কেন পারবে না? তা ছাড়া শুক্র গ্রহের কলা (phase) বৃদ্ধি ও হ্রাস কি করে ব্যাখ্যা করা যায় যদি না সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে?

বাইবেল-বিরোধী কোপার্নিকাসী তত্ত্ব প্রচার করার অপরাধে ধর্মীয় আদালতে যে গ্যালিলিওর বিচার হয়েছিল তা সবাই জানে। তার কারণ কয়েক বছর আগে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও ১৬৩২ সালে তিনি এক বই প্রকাশ করে ধর্মগুরুদের অনুশাসন অমান্য করেছিলেন। ছাড়া পেলেন প্রায় নাকে খৎ দিয়ে। বোধ হয় তত দিনে বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর নতুন জ্ঞানচক্ষু খুলেছিল, প্রতিজ্ঞা করলেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এমন কথা আর কখনও বলবেন না, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি ভান করেছিলেন যে আসলে ভূকেন্দ্রিক বিশ্বেই তিনি বরাবর বিশ্বাসী, তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে। নিজের বাড়িতে শৌখিন বাস ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর নামমাত্র কারাদণ্ড হল। গ্যালিলিওর স্বভাব ছিল কিছুটা উদ্ধত, লেখনী তীক্ষ্ণ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও যে ভুলচুক ছিল না তা নয়—গির্জার সঙ্গে ঝগড়া অনেকটা তিনি নিজেই পাকিয়ে তুলেছিলেন। যাই হক, বাকি জীবনটা তাঁর কাটল নিজের প্রকৃত ক্ষেত্র বলবিদ্যা (mechanics) ও গতিবিদ্যার (dynamics) গবেষণায়।

গ্যালিলিও সম্বন্ধে অনেক ভুল গল্প আছে। যেমন আদালতে নিজের দোষ স্বীকার করে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি নাকি বিড়বিড় করে বলেছিলেন, "Eppur si muove", অর্থাৎ "তবু বলব পৃথিবী ঘোরে"। এর চেয়েও প্রসিদ্ধ গল্প যে তিনি পিসার হেলানো মিনার থেকে বড় ছোট দুটি

কামানের গোলা ফেলে প্রমাণ করেছিলেন ভারী ও হালকা বস্তুর পড়তে একই সময় লাগে। আসলে পরীক্ষাটি করেছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষীয় এক ব্যক্তি যাঁর বিশ্বাস ছিল ঠিক বিপরীত।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর বছরে নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) জন্ম। বলবিদ্যা সম্বন্ধে গ্যালিলিওর কাজ এবং কেপ্‌লার-আবিষ্কৃত গ্রাহিক গতির নিয়মের ভিত্তিতে নিউটন সার্ব বা বিশ্বব্যাপী মহাকর্ষ (gravitation) কল্পনা করেন ; তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর, আরও ২০ বছর কেটে গেল এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ গড়ে তুলতে। গ্রহদের গতি বোঝা গেল দুই রকম বলের ভিত্তিতে : বহির্মুখী বল (centrifugal force) এবং মহাকর্ষ। সুতোর মাথায় ঢিল বেঁধে যদি তা ঘোরানো হয় তবে তা ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইবে, বেরিয়েও যাবে যদি সুতো ছেঁড়ে। কিন্তু ঢিলকে ধরে রেখেছে সুতো। তেমনি গ্রহগুলিও বহির্মুখী বেগ আর সৌর মহাকর্ষের দোটানায় এক এক জায়গায় বাঁধা পড়েছে। প্রথম শক্তিটি একটু বড় বলে গ্রাহিক কক্ষ পথ বৃত্তের রূপ না নিয়ে উপবৃত্তে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু শুধু সৌর জগতে নয়, নিউটন বললেন এই টানাটানির খেলা চলছে সমগ্র বিশ্বে—তাই এর নাম সার্ব মহাকর্ষ। সূর্য যেমন পৃথিবীকে টানছে তেমনি প্রত্যেক বস্তু তার ভর (mass) আর দূরত্ব অনুযায়ী টানছে পরস্পরকে। পৃথিবীতে যার যত বেশী ভর মাটির টানে তাকে তত ভারী মনে হয়। পৃথিবীর টানে গাছের ফল মাটিতে পড়ে, চাঁদের টানে পৃথিবীর জলে জোয়ার আসে। নিউটন দেখালেন মহাকর্ষীয় বল দূরত্বের বর্গ ফলের ব্যস্ত অনুপাতে (inverse ratio) বাড়ে কমে ; যথা দূরত্ব যদি দ্বিগুণ বাড়ে তবে টান হয়ে পড়বে এক চতুর্থাংশ, যদি তিন গুণ হয় তবে টান ন ভাগের এক ভাগ। মহাকর্ষের মৌলিক ধারণার থেকে গ্রহদের ভর ও গতি সম্বন্ধে অনেক কিছু পরিষ্কার হল, পৃথিবী কেন দুই মাথায় একটুখানি চ্যাপটা তা বোঝা গেল, কামানের গোলা শূন্যে যে পথে চলে তাও অঙ্কের নিয়মে ধরা পড়ল। নিউটনের মৃত্যুর পর তাঁরই প্রবর্তিত সূত্র থেকে সূর্যের আরও দুটি গ্রহের আন্দাজ পাওয়া গেল ; এই অষ্টম ও নবম গ্রহ নেপ্‌চুন ও প্লুটো তখন বাধ্য হয়ে দূরবিনের চোখে ধরা দিল।

মহাকর্ষের ধারণাটা আজ আমাদের কাছে নিশ্বাসের মত সহজ হয়ে গিয়েছে

কিন্তু ভেবে দেখলে অত্যাশ্চর্য এই শক্তি যা কোনও ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়, যা নৈসর্গিক আঁধারের অপরিমেয় দূর দূরান্তরে নিমেষে প্রবাহিত। এই শক্তি দিয়ে সূর্য ৯'৩ কোটি মাইল দূরে পৃথিবীকে ধরে রেখেছে, যদিও পৃথিবীর যা ব্যাস (diameter) তার সমান মোটা এক ইস্পাতের বাহু দিয়েও এই বন্ধন সম্ভব হত না।

এক দিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গাছের থেকে আপেল পড়তে দেখে মহাকর্ষের ধারণাটা বিদ্যুতের মত নিউটনের মাথায় খেলে গিয়েছিল এ কাহিনী আজ সবাই জানে। কিন্তু এখন কথাটা সকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। গল্পটি প্রথম বলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ভল্‌টেআর ইংলন্‌ড বেড়িয়ে এসে তাঁর 'ইংলন্‌ডের চিঠি' গ্রন্থে। নিউটনের এক আত্মীয়ার কাছে তিনি তা শুনেছিলেন। গ্যালিলিও সম্বন্ধে কল্পিত কাহিনীর কথা একটু আগে বলেছি। আর এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস সম্বন্ধে শোনা যায় তিনি সূর্য কিরণ প্রতিফলিত করে আক্রমণকারী রোমক নৌবহর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আর্কিমিডিস ছিলেন বিনয়ী ব্যক্তি, তিনি কোনও দিন এই দাবি করেন নি। তাঁর কয়েক শো বছর পরে এক গপ্‌পীবাজ গ্রীসবাসী এই গল্পের সূচনা করে, তার পরে তা ডালপালা গজিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি এক অগ্নি-বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন যে শুধু আয়না দিয়ে জাহাজ পোড়ানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আগুনের কথায় মনে পড়ল সম্রাট নিরোর গল্প ; রোম যখন পুড়ছিল তখন তিনি নাকি বেহালা বাজিয়েছিলেন ; আসলে সেই সময়ে এই যন্ত্রটির উদ্‌ভাবনই হয় নি। প্রসিদ্ধদের সম্বন্ধে অনেক গল্প এমনি জমে উঠতে চায়। অবশ্য নিউটন ও তাঁর আপেলের গল্প এগুলির মত আজগুবী নাও হতে পারে।

যাই হক, নিউটনের পর থেকে আজ পর্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বিধা সন্দেহ পিছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে এসেছে। তা সম্ভব হয়েছে পদার্থবিদ্যা (বিশেষত পারমাণবিক), রসায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে ; আলো ও অন্যান্য বিদ্যুৎ-চুম্বকী (electro-magnetic) তরঙ্গ যে সব নিয়ম মেনে চলে তার উপলব্ধি অনেকখানি সাহায্য করেছে। এর আগে পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করেছিল সূর্য, এ বার তারও সেই দশা হল, দেখা গেল বিশাল এক নক্ষত্রচক্র বা ছায়াপথের অতি নগণ্য বাসিন্দা সে ; এই ছায়া-

পথও আবার অগণ্য তারকা পুঞ্জের মধ্যে একটি মাত্র, তারা এক একটি এত দূরে যে যেই আলোতে আজ তাদের আমরা দেখছি দূরবিন দিয়ে,সেই আলোর যাত্রা শুরু পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাব হওয়ার অনেক আগে ; দূরত্ব কতখানি তার উপলব্ধি হবে আলোর বেগটি জানলে—সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল। ইতিমধ্যেই কিন্তু আলো ও অন্যান্য বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ সম্বন্ধে যা জানা গেল, নিউটন-কল্পিত স্থির মহাকাশে তাঁরই গণিতের সাহায্যে তার সম্পূর্ণ কূল পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পরে আল্‌বের্ট আইনষ্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) মহাকাশের চেহারা বদলে দিলেন, নিউটনের অন্যান্য ধারণা আরও প্রসারিত করে বলবিদ্যার নতুন রূপ দিলেন, তাঁর গণিত শুদ্ধ করে তার সামঞ্জস্য আনলেন আলোর চরিত্রের সঙ্গে। এই আইনষ্টাইনীয় বিশ্ব আজও টিঁকে আছে, এর মৌলিক পরিবর্তন আর কিছু নাও হতে পারে।

তার মানে এ নয় যে নতুন অবিষ্কারের আর কিছু নেই। মহাকাশ আজ আশ্চর্য চমকপ্রদ আবিষ্কারের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এত কাল শুধু সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যন্ত্র বানিয়ে কাজ চলেছে। কিন্তু তাতে আমাদের ভারী বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) বাধা এড়ানো যায় নি, এখন দূর শূন্যে সশরীরে পাড়ি দিয়ে বা অভিনব যন্ত্র বানিয়ে মানুষের তৃতীয় চোখ খুলছে। আমাদের প্রতিবেশী দুই গ্রহ মঙ্গল ও শুক্র, মঙ্গল গ্রহে প্রাণী আছে কিনা বা কখনও ছিল কিনা তা আমরা এখনও নিঃসন্দেহে জানি না ; শুক্রের ভারী আবহের (atmosphere) নীচে তার প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও সামান্য। কোআজ়ার ও নীল নাক্ষত্র বস্তু অপ্রত্যাশিত নব অবিষ্কার। মহাকাশের দূর দূরান্তরে আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে, সেখানে কত নীহারিকা (galaxy) এত দ্রুত সরে যাচ্ছে আমাদের থেকে যে কোনও দিনই তাদের আমরা জানতে পারব না।···

সুতরাং নিউটনের প্রসিদ্ধ বাক্য দিয়ে আমরা এই অধ্যায় শেষ করতে পারি: "জগতের লোক আমার সম্বন্ধে কি ভাববে জানি না ; কিন্তু আমার নিজের মনে হয় আমি যেন এক বালক যে সমুদ্রের ধারে খেলছে, মাঝে মাঝে সাধারণের তুলনায় বেশী মসৃণ বা বেশী সুন্দর এক নুড়ি কুড়িয়ে মজা পাচ্ছে, যার সামনে বিশাল জ্ঞান-সমুদ্র অনাবিষ্কৃত পড়ে আছে।"

২। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যন্ত্রপাতি

যেমন বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন জ্যোতিষেও আধুনিক যুগে এতখানি অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে নানা রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিলিওর দূরবিনের তুলনায় আজকের যন্ত্রটি অনেক উন্নত। দূরবিন এখন প্রধানত দুই রকমের। যাতে লেন্সের সাহায্যে আলো জড়ো করা হয়, যা গ্যালিলিও বানিয়েছিলেন, তাতে কাঁচের ভিতর দিয়ে যাওয়ার ফলে রশ্মিগুলি বেঁকে যায় বা প্রতিসৃত হয়, আমরা এই যন্ত্রকে বলতে পারি প্রতিসরণী (refracting) দূরবিন। প্রথম দিকের দূরবিন সব এই শ্রেণীর, তাতে এক নলের দুই মাথায় বিবর্ধনী লেন্স বসানো ; প্রথমটি আলো জড়ো করে, আর চোখের কাছে যে দ্বিতীয় লেন্সটি থাকে তা সেই প্রতিবিম্বটিকে বড় করে। কিন্তু আমরা জানি যে সাদা আলো যখন ত্রিপার্শ্ব কাঁচ বা প্রিজমের ভিতর দিয়ে যায় তখন তার সাত রং রামধনুর মত ছড়িয়ে পড়ে বর্ণালীর (spectrum) সৃষ্টি করে ; ঠিক তেমনই দূরবিনের লেন্সের ধারে ধারেও বর্ণ বিভাগ হয়। এই বিভাগের বা বর্ণাপেরণের (chromatic aberration) কারণ এই যে সব রকম রঙের প্রতিসরণ সমান নয়। আলোকে বিদ্যুৎ-চুম্বকী শক্তির তরঙ্গ বলে ভাবা যায়, নীল আলোর তরঙ্গ লালের তুলনায় বেশী তেজী ও ছোট, সেগুলি নমিত হয় বেশী। যাই হক, এর ফলে দৃশ্য বস্তুর তীক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় না, তার চার পাশে এক রঙিন চক্র থেকে যায়।

যদিও লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে এই দোষের কিছুটা প্রতিকার সম্ভব হয়েছিল, নিউটন সমস্যার সমাধান করলেন সম্পূর্ণ এক নতুন কৌশল ব্যবহার করে। এতে আলোর রশ্মি জড়ো করা হয় বাঁকা আয়নার গায়ে প্রতিফলিত করে, এবং যেহেতু এই রশ্মির কাঁচের ভিতরে ঢুকবার দরকার করে না, সেহেতু প্রতিসরণ ও বর্ণবিভাগও হয় না। এই শ্রেণীর যন্ত্রের

নাম প্রতিফলনী (reflecting) দূরবিন। সাধারণত কাঁচের গায়ে অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় কোনও পদার্থের সূক্ষ্ম প্রলেপ লাগিয়ে আয়না তৈরি হয়। এই আয়নার আকৃতি অধিবৃত্তের (parabola) মত যাতে তা নক্ষত্রের প্রেরিত সমান্তরাল (parallel) আলোক রশ্মি জড়ো করতে পারে; মোটর গাড়ির বাতির আয়নাও একই কারণে এই আকৃতিতে গড়া, তবে সেখানে ভিতরের আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রতিসরণী দূরবিনে বিভিন্ন লেন্স এক সঙ্গে এঁটে বর্ণাপেরণ অনেকটা সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু এই যুক্ত লেন্সও আলোকচিত্রে কিছুটা ভুলের সৃষ্টি করে। তবু সাধারণ অনুসন্ধান এবং অন্য উদ্দেশ্যে প্রতিসরণী দূরবিন যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপরন্তু এই ধরনের যন্ত্র দিয়ে আকাশের জ্যোতিষ্কটিকে সোজা দেখা যায়, এবং এই রকম দেখার এক বিশেষ আনন্দ আছে; প্রতিফলনী দূরবিনে জ্যোতিষী অন্য দিকে তাকিয়ে প্রতিবিম্বটি দেখেন। আমেরিকার ইয়ার্কিজ় মানমন্দিরের দূরবিন এখন বৃহত্তম প্রতিসরণী যন্ত্র; এতে ৬৩ ফুট লম্বা নলে দুটি ৪০ ইঞ্চি লেন্স আছে। এর বেশী বড় লেন্স অতিরিক্ত আলো ধরে রাখবে বলে খুব কার্যকর হবে না।

কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট যন্ত্র প্রতিফলনী দূরবিন। আমেরিকায় এই শ্রেণীর বৃহত্তমটি ক্যালিফর্নিয়ার পালোমার গিরিতে অবস্থিত, এর দর্পণের ব্যাস ২০০ ইঞ্চি। এই দূরবিন তৈরির কাজ আরম্ভ হয় ১৯২৮ সালে; প্রথমে কিছু দুর্ঘটনার পরে ১৯৩৪ সালে বিশুদ্ধ পাইরেক্স কাঁচের নিখুঁত এক চাকা ঢালাই হয়; আস্তে আস্তে তা ঠাণ্ডা করতে গেল প্রায় এক বছর; সেটাকে ঘষে মেজে অধিবৃত্তের যথার্থ আকৃতি দিতে লাগল ১১ বছর—খরচ হল তিন টন ঘষার বস্তু, ক্ষয়ে গেল পাঁচ টনেরও বেশী কাঁচ। কিন্তু ভাল দূরবিন মানে শুধু ভাল আরশি বা লেন্স নয়। এই নিখুঁত দর্পণ নিখুঁত কল কবজার সঙ্গে জুড়ে তৈরি হয়েছে এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র।

এ ছাড়া আমেরিকায় আছে ১৫৮, ১২০ ও ১০০ ইঞ্চি দর্পণের দূরবিন, যথাক্রমে কিট পীক পর্বত, লিক ও উইলসন গিরি মানমন্দিরে। কিন্তু আকাশের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করতে হলে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট দূরবিনের প্রয়োজন। পরিকল্পিত বা সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত বড় দূরবিনের মধ্যে

২

আছে অস্‌ট্রেলিয়ায় ১৫০ ইঞ্চি, চিলিতে ১৪৪ ইঞ্চি, সৌদি আরবে ১৫০-২০০ ইঞ্চি এবং ব্রিটেনে ৯৮ ইঞ্চি যন্ত্র; প্রথম দুটি বিশেষ করে দক্ষিণাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য সৃষ্টি। রাশিয়ার দুটি ১০২ ইঞ্চি যন্ত্র ছাড়াও তৈরি হচ্ছে ২৩৬ ইঞ্চি এক দানব যার ক্ষমতা হবে ১৫,৫০০ মাইল দূরের একটি মাত্র মোমবাতি দেখতে পাবার মত। ভারতের বৃহত্তমটি অন্ধ্র প্রদেশে, দর্পণ ৪৮ ইঞ্চি।

উইলসন গিরির ১০০ ইঞ্চি যন্ত্রের পর যখন ২০০ ইঞ্চি দূরবিনটি তৈরি হল তখন চার গুণ বেশী আলো সংগ্রহ করা সম্ভব হল, যার ফলে দৃশ্যগোচর বিশ্বের সীমা অনেক দূর সরে গেল। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ও দূর দূরান্তের নীহারিকা এতে ধরা পড়েছে যা আগে সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। এই যন্ত্রে প্রায় ৭০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের অতি ক্ষীণ নীহারিকা পর্যন্ত দেখা যায়। সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে আলো এক বছরে যতখানি যায় তা হল এক আলোকবর্ষ—অর্থাৎ প্রায় ছ লক্ষ কোটি (৬,০০০,০০০,০০০,০০০) মাইল। যে আলোতে ২০০ ইঞ্চি দূরবিন তার দূরতম নীহারিকাকে দেখছে তা যখন আমাদের দিকে রওনা হয় তারও অন্তত ২০০ কোটি বছর পরে সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি।

তারার দূরত্ব নির্ধারণের বিবিধ উপায় আছে, একটি সহজ কৌশল হল লম্বন (parallax) মাপা। দুই বিভিন্ন স্থান থেকে যদি একই বস্তুর দিকে তাকানো যায় তো পটভূমির তুলনায় বস্তুটি যে পরিমাণ সরে বলে মনে হয় সেটা তার লম্বন; এই আপাত অপসরণ অবশ্য তার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। চোখের সামনে পেনসিলটি ধরে আমরা যদি এক বার ডান চোখ এক বার বাঁ চোখ বন্ধ করে তার দিকে তাকাই তা হলে দেয়ালের তুলনায় সেটাকে পাশের দিকে সরে যেতে দেখব; পেনসিল যত কাছে আনব তত এই সরা বা লম্বনের পরিমাণ বাড়বে। আমাদের এক নিকট তারা ৬১ সিগ্‌নি, বিভিন্ন সময়ে তার লম্বন মেপে পাওয়া গেল ০.৩ সেকেন্ড (৩৬০ ডিগ্রিতে সম্পূর্ণ বৃত্ত, ৬০ মিনিটে এক ডিগ্রি, ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট); এই সামান্য পার্থক্য থেকে তারার দূরত্ব পাওয়া গেল ১১ আলোকবর্ষ।

বেশী দূরে লম্বন এত কমে যায় যে তাতে আর খুব নির্ভুল ফল পাওয়া

যায় না। এই অবস্থায় তারার দূরত্ব অনেক সময়ে নির্ণয় করা যায় তার প্রকৃত উজ্জ্বলতা মেপে। কতগুলি তারার স্বকীয় উজ্জ্বলতা সর্বদা সমান৹ সুতরাং তাদের মধ্যে যেগুলি যত দূরে তাদের দ্যুতি তত কম মনে হয়। এই পদ্ধতিতে বহু লক্ষ আলোকবর্ষ মাপা চলে।

নক্ষত্রের বর্ণালী পরীক্ষা করে দূরত্ব শুধু নয়, অন্যান্য বহু তথ্যের সন্ধান মেলে। মাত্র গত শতাব্দে ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত্ কঁৎ বলেছিলেন, "কতগুলি জিনিস মানুষ কোনও দিন জানতে পারবে না, যথা জ্যোতিষ্কের রাসায়নিক উপাদান।" কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আবিষ্কৃত (১৮৫০) এক নতুন যন্ত্র তাঁর উক্তি মিথ্যা প্রমাণ করলে। আজ যা অসম্ভব মনে হয় দু দিন পরে নতুন কৌশলের সাহায্যে তাই সম্ভব হয়ে পড়ে বিজ্ঞানে এর ভূরি ভূরি নজির আছে, সুতরাং দার্শনিককে বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

সাদা আলো প্রিজ্‌ম দিয়ে ভাঙলে যে রামধনুর সৃষ্টি হয় তাতে রঙগুলি পরস্পরের গায়ে চেপে থাকে, স্পষ্ট সীমা রেখা মেলে না। আলোকে আগে এক সরু লম্বা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে ঐ ছিদ্রের কতগুলি প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় দাঁড়ির মত, বর্ণালীতে রঙ অনুসারে তাদের অবস্থান। মৌলিক পদার্থের (elements) পরমাণুরা উষ্ণ বা উত্তেজিত অবস্থায় বিশেষ রঙের (অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) আলো বিকিরণ করে, এগুলি উজ্জ্বল দাঁড়ির মত দেখা দেয়; একে বলে বিকিরণ বর্ণালী (emission spectrum)। শীতল বা অল্প চঞ্চল অবস্থায় এরা আবার ঠিক এই রঙ-গুলিই শুষে নেয়, ফলে একই জায়গায় পাওয়া যায় কালো দাঁড়ি—একে বলে বিশোষণ বর্ণালী (absorption spectrum)। যথা, সোডিয়াম ধাতু হলদে অঞ্চলে কাছাকাছি দুটি রেখার সৃষ্টি করে। তারাদের ঘিরে যে গ্যাসের আবহ আছে তার তাপ জলন্ত তারার তুলনায় কম, সুতরাং সেখানকার মৌলিক পদার্থগুলি তাদের নির্দিষ্ট রঙ শুষে নিয়ে সৃষ্টি করে কালো রেখা। বস্তুত সব ব্যাপারটার শুরু হয় যখন সূর্যের বর্ণালী পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কালো কালো রেখা। ক্রমে জানা গেল এই রেখাগুলি বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের স্বাক্ষর, তাদের চেনা যায় পার্থিব পদার্থের বর্ণালীর সঙ্গে মিলিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে বর্ণালীর অন্য নাম দিয়েছিলেন

বর্ণলিপি তা যথার্থই হয়েছে।

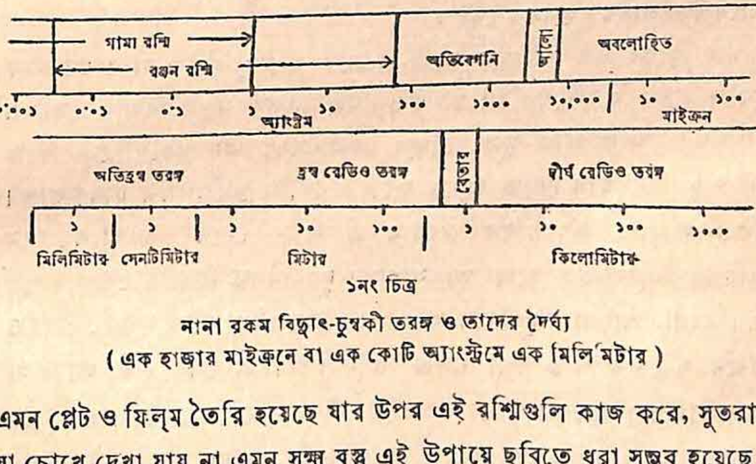
এই উপায়ে দেখা গেল পৃথিবীর বস্তু দিয়েই বাইরের বিশ্বটাও তৈরি, তারও উপাদান হাইড্রোজেন অকসিজেন নাইট্রোজেন সোডিয়াম লোহা ইত্যাদি। এমন কি সূর্যের বর্ণালী থেকে পৃথিবীর এক নতুন পদার্থের খোঁজ মিলল; অপরিচিত দাঁড়ির থেকে এর নাম দেওয়া হল হিলিয়াম বা 'সূর্য বস্তু', ১৪ বছর পরে বায়ুমণ্ডলেও অল্প পরিমাণে ধরা পড়ল এই গ্যাস।

দূর দূরান্তরের নক্ষত্ররা রামধনুর লিপিতে বর্ণালো যন্ত্রের কাছে শুধু যে নিজের নিজের উপাদানের খবর পাঠাল তাই নয়, ঐ সরু ও মোটা দাঁড়িগুলির থেকে ক্রমে আরও অনেক তথ্য প্রকাশ পেল। তাদের উজ্জ্বলতা, ভর, দূরত্ব, গায়ের তাপ, চুম্বকী শক্তি ছাড়াও জানা গেল তারা কতখানি বেগে আপন অক্ষকে ঘিরে আবর্তন করছে, কতখানি বেগে পৃথিবীর দিকে আসছে অথবা দূরে সরে যাচ্ছে, এমন কি তাদের আর পৃথিবীর মধ্যে কতখানি অদৃশ্য গ্যাস ভেসে বেড়াচ্ছে।

এই যে পৃথিবীর তুলনায় নক্ষত্রের বা অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আপেক্ষিক বেগ পরে আমরা দেখব তা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এইখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে যে তারকা আমাদের কাছে সরে আসছে তার বেগ অনুপাতে বিশোষণ বর্ণালীর রেখাগুলিও বর্ণালীতে বেগনির দিকে সরে, যে তারা দূরে সরছে তার রেখা তেমনি সরে বিপরীত মাথায় অর্থাৎ লালের দিকে। একে বলে লাল অপসরণ (**red shift**)।

জ্যোতিষীয় গবেষণায় আলোকচিত্রের ব্যবহার প্রায় বর্ণালী যন্ত্র উদ্ভাবনের সময় থেকে চলে আসছে এবং আজ তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তার কারণ চোখে দেখার তুলনায় ছবি তুলে রাখার অনেক সুবিধা। ছবি চির কালের মত এক দলিল; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ব্যক্তির দেখায় যে পার্থক্য বা অসঙ্গতি থাকতে পারে এতে তা নেই। তা ছাড়া যা চোখে দেখা যায় না তাও ফটোতে ধরা পড়ে—শুধু ক্যামেরার চোখ বেশী ক্ষণ খুলে রাখলেই হল; একটি প্লেট পাঁচ সেকেন্ড খুলে রাখলে হয়তো যা চোখে দেখা যায় তার বেশী কিছু ধরা পড়বে না, কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা সময় দিলে হাজার হাজার অদৃশ্য তারকা নিজের নিজের স্বাক্ষর রাখবে তাতে।

ছবি তুলতে শুধু যে দৃশ্যগোচর আলোই ব্যবহার হয় তা না। আলো এক রকম বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ, কিন্তু বর্ণসপ্তকের দু পাশে আরও নানা রকম বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ আছে। চোখে দেখা আলোর মধ্যে বেগনির ঢেউ সবচেয়ে খাটো, লালের ঢেউ সবচেয়ে লম্বা; ঢেউ যত ছোট তার তেজ (energy) তত বেশী, কারণ তত বেশী উত্তেজিত পরমাণুর থেকে তার উদ্ভব। বেগনির পরে ঢেউ ক্রমশ আরও ছোট হচ্ছে, গামা রশ্মির তরঙ্গ এক মিলিমিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগেরও ছোট; পক্ষান্তরে লালের পরে ক্রমশ ঢেউয়ের মাপ বাড়ছে, বড় রেডিও তরঙ্গ হাজার কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। বেগনির পাশেই আছে যে অদৃশ্য তরঙ্গ তাকে বলে অতিবেগনি (ultra violet); আর লালের পরেই আছে অবলোহিত (infra-red)—রবীন্দ্রনাথ এগুলির নাম দিয়েছেন যথাক্রমে বেগনি-পারের আলো এবং লাল-উজানি রঙের আলো।



১নং চিত্র

নানা রকম বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ ও তাদের দৈর্ঘ্য
(এক হাজার মাইক্রনে বা এক কোটি অ্যাংস্ট্রমে এক মিলিমিটার)

এমন প্লেট ও ফিল্ম তৈরি হয়েছে যার উপর এই রশ্মিগুলি কাজ করে, সুতরাং যা চোখে দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তু এই উপায়ে ছবিতে ধরা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন রঙের আলোয় একই বস্তুর ছবি তুলেও অনেক সময়ে নতুন তথ্য জানা যায়। কিন্তু মুশকিল হয় আমাদের চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলকে নিয়ে; একমাত্র দৃশ্যগোচর আলো ও রেডিও তরঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রকম রশ্মি-গুলিকে তা বড় একটা ঢুকতে দেয় না। সেই জন্য এই রশ্মিদের কাজে লাগাতে হলে প্রায়ই বেলুনে বা রকেটে চড়িয়ে যন্ত্র পাঠাতে হয় আকাশে।

এই যে বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় জানলাটি দিয়ে মহাকাশ থেকে রেডিও

তরঙ্গ আমাদের উপর ক্রমাগত বর্ষিত হচ্ছে তাকেও কাজে লাগানো হয়েছে ; ইতিমধ্যেই আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়েছে, উপরন্তু রেডিও রশ্মির ব্যবহারিক ক্ষেত্র আজ দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। আকাশের নক্ষত্ররা যে সর্বদা আমাদের রেডিওর বাণী পাঠাচ্ছে তাও এক আকস্মিক আবিষ্কার। আমাদের ঘরের বেতার যন্ত্র যে নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ করে তা সকলেই জানে, আমেরিকার বেল টেলিফোন কম্পানি সমুদ্র পারের রেডিও-টেলিফোনে এই আপদ নিয়ে চিন্তিত হল এবং কার্ল জান্‌স্কি নামক এক যুবককে নিযুক্ত করলে এই সমস্যার সমাধানে। ১৯৩২ সালে সে ধরতে পারল যে এক রকম ফিসফিসানি আসছে মহাকাশ থেকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল শব্দের উদ্ভব আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রে ; এই জায়গাটা দূরবিনে দেখা যায় না সামনে বস্তু কণার মেঘ আছে বলে। ক্রমে বিশ্বের আরও অনেক জায়গায় এই রকম রেডিও বার্তার কেন্দ্র পাওয়া গেল যেখানে দৃশ্যগোচর বস্তু কিছু নেই।

গত যুদ্ধের পর এই সব বার্তা ধরবার জন্য পৃথিবীর নানা জায়গায় আঁকশি উঠল আকাশের গায়ে, জন্ম নিল সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞান রেডিও জ্যোতিষ। আজ তার মূল্য চাক্ষুষ জ্যোতিষের কম নয়, দিকে দিকে রেডিও দূরবিন কান পেতে শুনছে তারার সঙ্গীত, দ্যুলোকের দীর্ঘনিশ্বাস। রেডিও তরঙ্গের উৎসগুলির অবস্থান ও শক্তি থেকে আকাশের যে চেহারাটা উন্মোচিত হচ্ছে তা সাধারণ দূরবিনলব্ধ চিত্রটির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যথা, আলোক দূরবিনে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধক, রেডিও দূরবিনে সবচেয়ে শক্তিশালী নক্ষত্র সিগ্‌নাস তারামণ্ডলের এক তারা যা চোখে প্রায় ধরা পড়ে না। রেডিও রশ্মির উৎস সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় নীহারিকাদের মধ্যে, তাদের কারও কারও গুঞ্জন শোনা যায় শ্রেষ্ঠ চাক্ষুষ দূরবিনের যা পরিধি তার অনেক বাইরের থেকে। তা ছাড়া এই যন্ত্র গত কয়েক বছরে আবিষ্কার করেছে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস কোআজ়ার, পাল্‌সার, নানা বস্তুর অণু, ইত্যাদি—এ সবের সঙ্গে পরে আমাদের পরিচয় হবে। আজ ভাবতে অবাক লাগে যে জান্‌স্কির যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রতি প্রথমে তার নিয়োগকর্তা কোনও কানই দেন নি, তাকে অন্য কাজে লাগিয়েছিলেন।

রেডিও দূরবিন সাধারণ দূরবিনের মতই কাজ করে, শুধু দর্পণের ফোকাসে আলো জড়ো না হয়ে এক প্রকাণ্ড অধিবৃত্তাকার বাটির সামনে একত্র হয় অদৃশ্য রেডিও তরঙ্গ, তার পর ইলেকট্রনিক উপায়ে তাকে বাড়ানো হয় এবং শব্দে রূপান্তরিত করা চলে। ১৯৭১ সালে জার্মেনিতে এক অতি শক্তিশালী রেডিও দূরবিন তৈরি হয়েছে, তার বাটির ব্যাস ১০০ মিটার (৩২৮ ফুট), তবু আকৃতির ব্যতিক্রম এক মিলিমিটারের কম। যন্ত্রটি ৪০০০ টন ভারী হলেও এত সূক্ষ্ম যে মাত্র ন মিনিটে বাটিটি দিকচক্র এক পাক ঘুরতে পারে (৩৬০ ডিগ্রি), তার অর্ধেক সময় লাগে মাথার উপর থেকে 'চোখ' নামিয়ে দিগন্তের দিকে তাকাতে (৯০ ডিগ্রি)। কিন্তু ১৯৭২ অকটোবরে ব্রিটেনে এক অভিনব যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তার আটটি আলাদা বাটি, প্রতিটির ব্যাস ১৪ মিটার, সেগুলি একযোগে এক প্রকাণ্ড দূরবিনের কাজ করে, সুতরাং আপাতত এটিই পৃথিবীর রহত্তম। কিছু দিন আগে ভারতেও এক বৃহৎ শক্তিশালী দূরবিন স্থাপিত হয়েছে, তা আছে উটিতে, পৃথিবীর নিরক্ষ রেখার (equator) কাছাকাছি; যন্ত্রটি সম্পূর্ণ এ দেশে পরিকল্পিত ও নির্মিত। এর সাহায্যে বিশেষ করে রেডিও শক্তি বিকিরণী নীহারিকা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গবেষণা হবে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটি নতুন রেডিও উৎস ধরা পড়েছে।

এই গেল রেডিও তরঙ্গের কথা। এ ছাড়া যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের আরও নানা রকম বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ আছে তা আগে বলেছি, এদেরও এখন কাজে লাগানো হচ্ছে, নতুন ধরনের যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। আগে বায়ুমণ্ডল ভেদ করবার এক মাত্র উপায় ছিল বেলুন, এখন কৃত্রিম উপগ্রহ (artificial satellite) আরও ঊর্ধ্বে উঠছে, রকেট মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে; এদের বাহন করে নানা রকম সূক্ষ্ম যন্ত্র পাঠিয়ে আকাশের জ্ঞান ক্রমেই বাড়ছে। রাশিয়া ও আমেরিকা দুই দেশই পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী মানমন্দিরের পরিকল্পনা করছে; বায়ুমণ্ডলের যথাসম্ভব বাইরে থেকে এই রকম কৃত্রিম উপগ্রহ নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাবে পৃথিবীতে। কিন্তু সম্পূর্ণ বায়ুনিঃস্ব চাঁদে গিয়ে যত দিন না মানমন্দির স্থাপন করা যাচ্ছে তত দিন বোধ হয় জ্যোতিষীরা পুরোপুরি খুশী হতে পারবেন না। এবং দেখে শুনে মনে হয় তার হয়তো খুব দেরি নেই।

৩। বিশ্ব, মহাকাশ ও মহাকাল

এই বিচিত্র বিশ্বলোকের সঙ্গে পরিচয় যদি আমাদের আসল উদ্দেশ্য হয় তবে গত দুই অধ্যায়কে তার উপক্রমণিকা বলা চলে। পরিচয়ের শুরু ব্রহ্মাণ্ডের চরিত্র ও উৎপত্তির কথা দিয়ে, পরে ক্রমে আসবে নীহারিকা নক্ষত্র গ্রহ ইত্যাদির পালা।

সৃষ্টি কোথা থেকে এল এই প্রশ্ন মানুষকে চির দিন ভাবিত করেছে, তাই প্রায় সব দেশের পুরাণে এ সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কাহিনী বহু সহস্র বছর ধরে চলে আসছে। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বর্ণনায় প্রায়ই কল্পনা স্তম্ভিত হয়—যেমন, অনির্দিষ্ট মূর্তিহীন বিশৃঙ্খলা (ব্যাবিলন), গহন অতল (মিশর), কুয়াশাবৃত বিস্ফারিত গহ্বর (আইসল্যান্ড), অসীম আকাশ নিশ্চল জল রাশি আর অখণ্ড স্তব্ধতা (মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা)। সবচেয়ে গম্ভীর বোধ হয় ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তের বর্ণনা : আরম্ভে সৎ অসৎ, মৃত্যু অমৃতত্ব, আকাশ অন্তরীক্ষ, রাত্রি দিন কিছুই ছিল না; সর্বব্যাপী তমসার আড়ালে শুধু অনির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা, কেবল তাপজাত অদেহী শূন্যতা—তাদের মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়, বায়ু বিনা আপন শক্তিতে নিশ্বসিত। ক্রমে দেখা দিল ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই আদিম বীজ—এল জননী শক্তি। এত বলে ঋষি আবার বলছেন, কিন্তু কে বলতে পারে কোথা থেকে সৃষ্টির উৎপত্তি।···

বেদে যেমন ইচ্ছার থেকে সৃষ্টি, বেদান্তে তেমনি এই বিশ্বের উদ্দেশ্য বিশ্ব-আত্মার লীলা, এই আত্মারই উপাদানে তৈরি তা; শিল্পীর মন যেমন শিল্প সৃষ্টি করে তেমনি এই বিশ্বের সৃজন। সাংখ্য দর্শনের মতে আদি বস্তু বা প্রকৃতির থেকে বিশ্বের জন্ম। এই জিনিসটা লক্ষ করবার মত যে সব ভারতীয় ধর্মের ভিতরে এই একই বিশ্বাসের ধারা বয়ে চলেছে যে বিশ্ব অতি প্রাচীন, অতি প্রকাণ্ড, তা নিরবধি চক্রবৎ পুনরাবর্তিত,

এবং আমাদের বিশ্বের দূরে দূরে আরও বিশ্ব আছে। হিন্দু ধর্ম মতে ব্রহ্মের এক দিন বা রাত্রি ৪৩২ কোটি বছরে (এক কল্প), এই রকম ৩৬০ দিন রাত্রিতে তাঁর এক বছর; ১০০ বছর তাঁর আয়ু, সব মিলিয়ে এই ৩১,১০৪,০০০ কোটি বছর পরে সৃষ্টি ফিরে যায় শাশ্বত বিশ্ব-আত্মায় (গীতার ভাষায়, অব্যক্তে লীন হয়), তার পর আবার এক নতুন সৃষ্টিকর্তা নতুন করে আরম্ভ করেন।

পক্ষান্তরে পশ্চিম জগৎ এই সে দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করে এসেছে যে বিশ্বের সৃষ্টি যিশুর মাত্র হাজার চারেক বছর আগে; এই ধারণার উৎপত্তি প্রাচীন সেমাইৎ জাতির মধ্যে যাদের থেকে যথাক্রমে ইহুদী ও খৃষ্টীয় পুরাণ গড়ে উঠেছে। অবশ্য আমরা জানি যে খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগে গ্রীসীয় দার্শনিক অ্যানাকৃসিম্যান্ডার বলেছিলেন ব্রহ্মাণ্ড যে প্রাথমিক উপাদানে তৈরি বারে বারে তাতেই সে ফিরে আসে, এবং আবার নতুন করে অভিব্যক্ত হয়।

যদিও আমাদের উদ্দেশ্য বিশ্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অধুনাতন ধারণার পরিচয় দেওয়া, সেই প্রসঙ্গে এই সব প্রাচীন বিশ্বাসের অবতারণা যে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় একটু পরে তা প্রকাশ পাবে।

সৃষ্টির উৎপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে আজ বিজ্ঞান যে ছবিটি আঁকছে তা বুঝতে হলে আগে দুটি নীতির সঙ্গে পরিচয় দরকার: বিশ্বের বিস্তার বা প্রসারণ, এবং আইনষ্টাইন প্রবর্তিত নতুন জ্যামিতি।

১৯২০ দশকে মার্কিন জ্যোতিষী এডউইন হাবৃল মহাকাশের দূর দিগন্তে শক্তিশালী দূরবিন লক্ষ করে এক আশ্চর্য তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি দেখেন নীহারিকাদের বিশোষণ বর্ণালীতে পরিচিত রেখাগুলি লালের দিকে সরে গিয়েছে, যে নীহারিকা যত ক্ষীণ, অর্থাৎ যে যত দূরে তার রেখা সরেছে তত বেশী পরিমাণে। এর থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে তারা স্থির নয়, গতিশীল—প্রতি দণ্ডে দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের এই বিশ্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বর্ণালী রেখার এই লাল অপসরণের কথা আগে উল্লেখ করেছি, এখানে তা আর একটু পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। ধরা যাক কেউ এক জন রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দূর থেকে এক গাড়ি বাঁশি

বাজাতে বাজাতে এল এবং আবার দূরে সরে গেল। গাড়ি যখন কাছে আসছে তখন বাঁশির আওয়াজ ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে, তার কারণ শব্দের জন্য যে বাতাসের তরঙ্গ থেকে চাপে পড়ে সেই তরঙ্গগুলি আরও ছোট ও বেশী তেজী হয়ে উঠছে; গাড়ি যখন দূরে সরে যাচ্ছে তখন টানে পড়ে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যাচ্ছে বেড়ে, শব্দের তীক্ষ্ণতা যাচ্ছে কমে।

তেমনি আলোও তরঙ্গ, যেই উৎসের থেকে তা বিচ্ছুরিত তা যদি কাছে আসে তবে তার ঢেউ ছোট হয়ে যাবে বেগনির দিকে, যদি দূরে যায় তবে লালের দিকে। সুতরাং মনে হয় বিশ্ব দিগন্তের নীহারিকাগুলি আমাদের এই ছায়াপথ নিহারিকার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই লাল অপসরণের আর কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি বলে আজ প্রায় সব জ্যোতিষীরই বিশ্বাস যে বিশ্ব বিস্তারধর্মী।

উপরে যা বলা হল তার থেকে এই ধারণা হতে পারে যে আমাদের পৃথিবী বা ছায়াপথ স্থির হয়ে আছে সৃষ্টির মাঝখানে, আর সব প্রতিবেশী পালিয়ে যাচ্ছে দূরে। রাত্রির আকাশে ছায়াপথের দিকে তাকালে কোনও একটা পাশ বেশী উজ্জ্বল ঠেকে না অন্য পাশের তুলনায়, তার থেকেও মনে হতে পারে যে আমাদেরকেই কেন্দ্র করে সৃষ্টির যত সমারোহ। কিন্তু এমন আত্মম্ভরী ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কোপার্নিকাস কেপ্‌লারের আমল থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে তার কোনও স্থান নেই।

আসল কথাটা হল যে আমাদের যেমন মনে হতে পারে যে এই নীহারিকা স্থির এবং অন্যগুলি পলাতক, তেমনি ঐ সব জগতে যদি বুদ্ধিমান বাসিন্দা থাকে তাদেরও ঐ একই ধারণা হবে। তার কারণ বিশ্বের প্রসারণ সব দিকে সমান। তার চেহারা সর্বত্রই মোটামুটি এক। আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় দূরবিন দিয়ে ৭০০ কোটি আলোকবর্ষের দূরে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এর মাঝামাঝি অবস্থিত কোনও জ্যোতিষী একই যন্ত্র দিয়ে এই দিগন্ত পেরিয়ে আরও অনেক দূর দেখতে পাবে, তেমনি ছায়াপথের দিকে দূরবিন সাজালে তার পরিধি কমে যাবে আমাদের তুলনায়।

বিশ্বের এই বিস্তার যে কি মাত্রায় ঘটছে কতগুলি তথ্য থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। দ্রুতি বাড়ছে দূরত্বের সমান তালে, যে নীহারিকা আছে ১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে তার তুলনায় যার দূরত্ব ২০০ কোটি

আলোকবর্ষ সে ছুটছে দ্বিগুণ বেগে, অর্থাৎ সময় যত যাচ্ছে তত তাদের বেগও বাড়ছে। সুতরাং অতীতের তুলনায় বিশ্ব ক্রমেই বেশী দ্রুত ফেঁপে উঠছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে সীমা পর্যন্ত সোজা দাগ টেনে গেলে প্রতি ১৩০ কোটি বছরে তার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ বাড়ছে অথবা প্রতি দশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে নীহারিকাগুলি সেকেন্ডে ১০০ মাইল দ্রুতি লাভ করছে; ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বের ব্যাস বাড়ছে অন্তত কয়েক লক্ষ মাইল।

এই বিস্তৃতির শেষ কোথায়? বিজ্ঞানীরা বলেন যে আলোর চেয়ে বেশী বেগ বিশ্বে সম্ভব নয়, তা সৃষ্টির এক মৌলিক সীমা। যে নীহারিকা আলোরই সমান দ্রুত, তার আলো কখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে না; সুতরাং তাকে আমরা কোনও দিন দেখতে পাব না। তা হলে পৃথিবীর চোখে এই হল তার নৈসর্গিক দিগন্ত। ১৯৭০ সালে ওহায়োতে দুই মার্কিন জ্যোতির্বিৎ লক্ষ করেন যে এই প্রান্তে রেডিও সংকেতের সংখ্যা ও শক্তি হঠাৎ কমে যাচ্ছে। তেমনি অন্যান্য নীহারিকার দৃষ্টিতে আছে অন্যান্য দিগন্ত।

দূরবিনের জন্য যত বড় লেন্স অথবা দর্পণ আমরা বানাই না কেন, রেডিও দূরবিনের শক্তি যতই বাড়াই না কেন, এই সীমা টপকানো অসম্ভব। কিন্তু যদি ধরে নিই আলোর দ্রুতি দিয়ে বিশ্ব-বিস্তৃতির সীমা বাঁধা, তবে প্রায় সাত দশমাংশ দূরত্ব চাক্ষুষ দূরবিনে আমাদের আওতার মধ্যে আছে, রেডিও দূরবিন নাকি এখন প্রায় নৈসর্গিক দিগন্তের কাছে পৌঁছেছে। এতখানি অংশের ভিত্তিতে বিশ্বের চরিত্র সম্বন্ধে গবেষণা নিশ্চয় সম্ভব, এবং বলা বাহুল্য তার অভাব হয় নি।

এই যে নীহারিকার দল পরস্পরের তুলনায় দূরে সরে গিয়ে মহাকাশের বিস্তৃতির ইঙ্গিত দিচ্ছে, নানা রকম সহজ উপমার সাহায্যে তা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। কেউ কল্পনা করেছেন বোমার বিস্ফোরণ; তার খণ্ডগুলি সব দিকে ছিটকে পড়ছে, কোনওটা বেশী জোরে, কোনওটা অপেক্ষাকৃত কম জোরে—দ্বিতীয়টা পিছনে পড়ে থাকছে প্রথমটার তুলনায়। জেম্স জীন্স আর একটা উপমা দিয়েছেন নদীর স্রোতে খড়ের টুকরো দিয়ে, সেগুলি যখন এক সরু অংশ পার হয়ে প্রশস্ত জলে এসে পড়ছে তখন কোনও একটার উপর যদি এক পিঁপড়ে থাকে তার মনে হবে অন্য সব

টুকরো তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; খড়ে যেমন পিঁপড়ে ছায়াপথ নীহারিকায় তেমনি মানুষ।

কিন্তু এই উপমাগুলির একটিও যথার্থ নয়, বাতাস বা জলের গা কোনওটাকেই ঠিক মহাকাশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তার কারণ মহাকাশের কোনও দিকেই কোনও সীমা নেই। তাই এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উপযুক্ত ও বেশী ব্যবহৃত তুলনা হল সম্পূর্ণ গোল ফানুসের গা; ফানুসকে যখন ফুঁ দিয়ে ফাঁপানো হয় তখন তার গায়ের বিন্দুগুলি পরস্পরের দূরেই সরে যায়, কেউ কারও কাছে আসে না—অথচ এই গায়ের কোনও সীমা নেই কোনও দিকেই। সেখানে এক পিঁপড়ে চির কাল ঘুরে বেড়ালেও কোনও প্রান্তে এসে ঠেকবে না।

কিন্তু ফানুসের পিঠ যদি মহাকাশ হয় তবে তার ভিতরটা কি? মহাকাশের বাইরে তো কিছু কল্পনা করা যায় না। আসলে মহাকাশ কল্পনার অতীত, আধুনিক পদার্থ বিদ্যার আরও অনেক মৌলিক বিষয়ের মত তার সঙ্গে বোঝাপড়া চলে শুধু গণিতের ভাষায়।

এই নতুন গণিত এত কঠিন যে তা খুব বেশী লোকে বুঝতে পারে নি, আমাদের দরকার নেই তার মধ্যে যাওয়ার, শুধু এটুকু জানলেই চলবে যে স্কুল কলেজে সাধারণত যে বিদ্যা শিখি তার থেকে তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইউক্লিড প্রবর্তিত জ্যামিতি খাতার পাতায় দাগ কেটে বোঝানো চলে, নিউটনের সূত্র অনুসারে আলোর কিরণ সরল রেখা ধরে চলে—পৃথিবীর সীমার মধ্যে মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতায় এই সব রীতি নীতি সুন্দর খাটলেও বাহির বিশ্বে একেবারেই অচল। এই তথ্য আবিষ্কার করেন এই নব গণিতের প্রতিষ্ঠাতা আইনস্টাইন। তখন দেখা গেল ইউক্লিডের জ্যামিতি নানা রকম জ্যামিতির মধ্যে একটি শ্রেণী মাত্র।

সৃষ্টির শুরু ও পরিণতি সম্বন্ধে বর্তমানের অধিকাংশ ভাবনা দুটি আইনস্টাইনীয় তত্ত্বের উপর গড়া। প্রথমটির নাম বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Special Theory of Relativity), দ্বিতীয়টি সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity), যথাক্রমে ১৯০৫ এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশিত। মহাকাশ কাল জড়বস্তু শক্তি মহাকর্ষ আলো ইত্যাদি

সম্বন্ধে সনাতন ধারণা এগুলি আমূল বদলে দিল।

আইনষ্টাইনের আজীবন ইচ্ছা ছিল একই মহাসূত্রে এক দিকে মহাকর্ষ ও বিদ্যুৎ-চুম্বকী শক্তির ও অন্য দিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুলোক ও বিশাল বিশ্বলোকের নিয়মগুলি বেঁধে দেবেন। মৃত্যুর অল্প আগে ১৯৪৯ সালের শেষে এই সাধনা শেষ করে তিনি তাঁর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব (Unified Field Theory) প্রকাশ করেন। দেখা গিয়েছে পরমাণবিক কণা ইলেকট্রন* কখনও কখনও তরঙ্গের মত ব্যবহার করে, আবার আলোর তরঙ্গ বস্তু কণার ধর্মও প্রকাশ করে। বস্তু ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য দূর করাও এই নতুন তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল। তত্ত্বটি সব দিকে কতখানি সফল হয়েছে তা এখনও পরীক্ষার বিষয়।

বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বলে যে প্রকৃতির নিয়ম বিশ্বের সর্বত্র এক, এবং কোনও জিনিসের নিজস্ব কোনও মাপ নেই, তাকে বুঝতে হবে অন্য জিনিসের তুলনায়। এই মাপকাঠির আলোচনায় মাত্রার (dimension) প্রশ্ন ওঠে। সরল রেখার একটি মাত্র মাত্রা—দৈর্ঘ্য; এই কাগজটার দুই মাত্রা—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ; এই বইখানা আছে তিন মাত্রা জুড়ে—তৃতীয়টি হল উচ্চতা। এই তিনটিকে বলা চলে দেশ মাত্রা।

এত কাল এই তিন মাত্রাই যথেষ্ট ছিল, এখন দেখা গেল তা নয়, কোনও কিছুর সম্যক মাপ নিতে হলে এক চতুর্থ মাত্রা দরকার—তা হল কাল। এই দেশ কালের (space time) মাপ কাঠিতেই তার সম্পূর্ণ নির্দেশ সম্ভব। আজকের এই বইখানা একশো বছর পরের বইয়ের সঙ্গে মিলবে না। গতি ও দূরত্ব পরস্পর সম্পর্কিত, কিন্তু তাদের নির্ণয় করতে হলে কালও আসবে বিবেচনার মধ্যে।

আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে দেশ মাত্রাও তিনের সীমায় আর আবদ্ধ থাকল না। যদিও তিনের বেশী আমাদের কল্পনাবহির্ভূত, দেখা গেল

---

* প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন পরমাণুর উপাদান, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে তাদের বিভিন্ন সংখ্যা। প্রোটন ও নিউট্রনের অবস্থান পরমাণুর কেন্দ্রে, তাদের ঘিরে ইলেকট্রন দল কক্ষ পথে প্রদক্ষিণ করে সূর্যের চার পাশে গ্রহদের মত। প্রোটন পজিটিভ বা পর বিদ্যুৎধর্মী, ইলেকট্রন নেগেটিভ বা অপর বিদ্যুৎধর্মী, আর নিউট্রন নিরপেক্ষ ও বিদ্যুৎধর্মহীন।

গণিতের যুক্তিতে তাতে কোনও বাধা নেই। বইয়ের পৃষ্ঠাটি বেঁকিয়ে দিলে যেমন তা দুই থেকে তিন মাত্রায় প্রবেশ করবে, তেমনি অনিউক্লিডীয় জ্যামিতিতে তিন মাত্রার দেশ বেঁকে চার মাত্রা পেতে পারে—বস্তুত মাত্রা আরও বাড়িয়ে যেতেও কোনও আপত্তি নেই।

দেশ বা মহাশূন্য সম্বন্ধে এই ধরনের মাত্রাজ্ঞান মানুষের কল্পনাতীত হলেও এরই গাণিতিক সূত্র ধরে মহাকাশের যে চরিত্র বা ধর্ম নির্দিষ্ট হল তাতে জ্যোতির্লোক সম্পর্কে কতগুলি বৈজ্ঞানিক সমস্যা মিটল। ইউক্লিডের জ্যামিতি বা নিউটনের গণিত দ্বারা তা সম্ভব হত না।

দেখা গেল মহাকাশ সোজা নয়, তা বেঁকে যায় জড়বস্তুর প্রভাবে। পূর্বোক্ত ফানুসের উপমার রেশ টেনে এখানে মহাকাশকে তুলনা করা যেতে পারে টান-করা রবারের পাতের সঙ্গে ; তার গায়ে লোহার বল ছেড়ে দিলে যেমন তা ডেবে যাবে, ত্রিমাত্রিক টোল খাবে, তেমনি মহাকাশকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে বৃহৎ জ্যোতিষ্করা ; তাদের ঘিরে ছোট ছোট জ্যোতিষ্ক এখানে ওখানে অল্প অল্প টোল খাওয়াচ্ছে রবারের গায়ে ছোট বলের মত। অথবা মহাকাশ যেন নদীর স্রোত, ইতস্তত ছোট ছোট দ্বীপের চার পাশে তা ভেঙে যাচ্ছে। অবশ্য জল বা রবারের গায়ের মত মহাকাশের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই ; আইনষ্টাইনের ধারণা অনুসারে বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক বা বিন্যাসের তা অন্য এক নাম মাত্র, অর্থাৎ জড়বস্তুর অস্তিত্বজাত ধর্ম ছাড়া তার কোনও ধর্ম নেই।

বস্তু আছে বলে মহাকাশে এক সর্বাঙ্গীণ বক্রতা এসে যাচ্ছে। বিগত শতাব্দের বিশ্ব সরল রেখার নিয়মে বাঁধা ছিল, কিন্তু এই বিশ্বে সব পথই বৃত্তের পথ। মাটির গায়ে যে পোকা হেঁটে চলেছে তার মনে হতে পারে পৃথিবী সমতল ও অনন্ত, কিন্তু ক্রমাগত সোজা চললে সে আবার বৃত্তাকার পথে সেই জায়গায়ই ফিরে আসবে ; বিশ্ব সম্বন্ধেও আমাদের সেই রকম ভুল ধারণা হয়। তা সমতল নয়, তার বস্তুও অনন্ত নয়। আইনষ্টাইনের ন বছর বয়স্ক ছেলে তাঁর খ্যাতির কারণ জানতে চাইলে তিনি নাকি বলেছিলেন, "পোকা যখন বলের উপরে চলে তখন সে জানে না তার পথটা বাঁকা, কপালজোরে আমি সেটা লক্ষ করেছিলাম।"

আইনষ্টাইনীয় তত্ত্বের সত্যতা ক্রমেই প্রমাণিত হয়েছে পরীক্ষায়, দেখা

গিয়েছে নিউটনীয় গণিতের তুলনায় তা বাস্তবের সঙ্গে মেলে বেশী। যথা, আইনষ্টাইনের হিসাবে দেখা গেল সূর্যের পিছনে অবস্থিত কোনও তারার আলো সূর্যের গা ঘেঁষে আমাদের দিকে আসবার সময়ে সামান্য বেঁকে যাবে (০.০০০৪৯ ডিগ্রি), যদিও চিরাগত নিয়মে তার সোজা আসা উচিত ; পরীক্ষায় পাওয়া গেল বক্রতা। বুধ গ্রহের কক্ষ পথের এক সামান্য চ্যুতি জ্যোতিষীরা অনেক কাল ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, নতুন নিয়ম অনুসারে গতি আর অসঙ্গত থাকল না। বেশী ভরযুক্ত তারার মহাকর্ষ তার বিকীর্ণ জ্যোতি সামান্য কমিয়ে দেয় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এই দাবিও সমর্থিত হল পর্যবেক্ষণে।

মহাকর্ষ প্রসঙ্গে এইখানে উল্লেখ্য যে নিউটনের যান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে মহাকর্ষের সনাতন ধারণাটাও আইনষ্টাইন বর্জন করেছেন। তা ঠিক আকর্ষণী শক্তি নয়, বস্তুর প্রতি বস্তুর দূরপাল্লা টান নয়, বরং চুম্বককে ঘিরে যেমন এক ক্ষেত্র তৈরি হয় এও তেমন বস্তুর চার পাশে এক ক্ষেত্র যা অন্য বস্তুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। অবস্থাটা বোঝাতে এক সুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে। ছেলেরা মারবেল খেলছে, মাঠ উঁচু নিচু হওয়াতে সেই অনুসারে মারবেল এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। পাঁচ তলা বাড়ির উপর থেকে যে দেখছে, মাঠের অসমানতা তার চোখে না পড়ায় সে ভাবছে কোনও শক্তি ব্যাহত করছে মারবেলের সরল গতি, কিন্তু নিচে দাঁড়িয়ে যে দেখছে তার চোখে পড়ছে আসল কারণটা। মাঠের অসমানতা হল মহাকর্ষ ক্ষেত্র, উপরের দর্শক নিউটন আর নিচের দর্শক আইনষ্টাইন।

এ পর্যন্ত যে বক্রতা আমরা আলোচনা করেছি, আইনষ্টাইনীয় গণিতের যুক্তিতে তা ছাড়া আরও দুটি সম্ভাবনা আছে। তারার আলোর সম্পূর্ণ পথটি হতে পারে বাঁকা : তখন হয় তা আবদ্ধ, অর্থাৎ আবার নিজের কাছেই ফিরে আসছে, যেমন উপরে বলেছি ; নয়তো উন্মুক্ত, অর্থাৎ কোনও কালে ফিরে আসছে না। অথবা মহাকাশ হতে পারে সোজা, অর্থাৎ আলোর পথে ছোট খাটো বিকৃতি পরস্পরকে নাকচ করে দিচ্ছে। ভাষান্তরে, মহাকাশ হয় (১) পজিটিভ বা পর বক্র, নয় (২) নেগেটিভ বা অপর বক্র, নয়তো (৩) সোজা, অর্থাৎ ইউক্লিডীয় দেশ। প্রথম সম্ভাবনার প্রতিনিধি

গোলকের গাত্র যাতে অতিরিক্ত এক বা একাধিক মাত্রা যোগ করা হয়েছে। অপর বক্রতার তুলনা দুঃসাধ্য; যদি কল্পনা করি ঘোড়ার পিঠে বসাবার জিন যার দুই প্রান্ত উপর দিকে উঠে গিয়েছে অনির্দিষ্ট ভাবে তবে এই সম্ভাবনার কিছুটা রূপায়ণ হয়।

আমাদের এই বিশ্বের মহাকাশ কোন দলে পড়ে তাও পরীক্ষা সাপেক্ষ। এক উপায় অনুসারে বহু দূরের নীহারিকাদের সংখ্যা গুনতে হয়, কিন্তু এই পদ্ধতি এখনও খুব নির্ভুল নয় বলে ভাল ফল পাওয়া যায় নি। আর একটি পন্থা আছে: নীহারিকাদের পারস্পরিক মহাকর্ষের ফলে তাদের দ্রুতি কমে আসতে পারে, যার ফলে বিশ্বের বিস্তৃতির হারও কমবে। এই কমার হার মেপে কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছে যে মহাকাশ পর বক্র।

তার অর্থ এই যে বিশ্ব অনন্ত নয়, যদিও তার সীমা নেই, বলা যেতে পারে তা সান্ত কিন্তু প্রান্তহীন (finite but unbounded)—ফানুসের উপমায় একটু আগে আমরা যা দেখেছি। অর্থাৎ তা অনির্দিষ্ট ভাবে সব দিকে প্রসারিত, কিন্তু তার মধ্যে জড়বস্তুর পরিমাণ অশেষ নয়। যে কোনও নীহারিকার থেকে কোনও জীব যখন বাইরের দিকে তাকাবে তখন তার দৃষ্টি চলবে আলোর এক আবদ্ধ পথ ধরে যা আবার ঘুরে আসবে নিজের দিকে, কালের পাখায় ভর করে বেঁকে যাবে সেই ক্ষণ পর্যন্ত যখন শুরু হয়েছিল বিশ্বের প্রসারণ। কারণ বিশ্ব প্রতি নীহারিকা জনিত বক্রতাকে সমান ও অনির্দিষ্ট ভাবে সব দিকে ঘিরে রেখেছে নিজে অশেষ না হয়েও, ঠিক যেমন পৃথিবীর পৃষ্ঠ অশেষ বড় না হয়েও তার প্রতি বিন্দুকে সমান ও অনির্দিষ্ট ভাবে চতুর্দিকে ঘিরে আছে। মহাকাশের এই পর বক্রতার ফলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখতে পেতাম—সেই আলোতে যার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল কয়েক কোটি বছর আগে—যদি না মহাকাশের বিশালতার তুলনায় আমাদের যন্ত্র এত ক্ষুদ্র হত।

বিশ্ব চরিত্রের আলোচনা শেষ করবার আগে প্রতিবস্তু সম্বন্ধে দু কথা বলা দরকার যা সম্প্রতি বিজ্ঞান জগতে অনেকখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, সাধারণ লোককেও অবাক করে দিয়েছে। বাদের যেমন প্রতিবাদ, তেমনি বস্তুর হল প্রতিবস্তু (anti-matter), অর্থাৎ সব বস্তুরই সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম অন্য বস্তুতে থাকতে পারে। এই নীতির সূচনা হয় ১৯৩২

সালে যখন ইংলন্ডে অ্যান্ডারসন ও ব্ল্যাকেট মহাজাগতিক রশ্মির (cosmic ray) কণার মধ্যে পজিট্রন কণা আবিষ্কার করেন ; পজিট্রনকে বলা যেতে পারে অপর পারমাণবিক কণা ইলেকট্রনের পর বিদ্যুৎধর্মী রূপ। দু বছর পরে ডিরাক প্রমাণ করেন যে প্রকৃতির সব রকম কণা জোড়ায় জোড়ায় থাকতে বাধ্য। এখন জানা আছে যে এই তত্ত্ব শুধু বিদ্যুৎ ধর্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, নিরপেক্ষ কণারও প্রতিবস্তু দোসর আছে, যেমন নিউট্রনের। বস্তু ও প্রতিবস্তুর মিলনে আকস্মিক তেজ নির্গমনের সঙ্গে দুইই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এ যাবৎ শুধু প্রাথমিক কণারই প্রতিকণা জানা ছিল, কিন্তু ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি এক খবরে প্রকাশ পেল যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিওন লেডেরম্যান দুটি বিভিন্ন প্রাথমিক কণার যুক্ত প্রতিবস্তু আবিষ্কার করেছেন। আমরা জানি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি মাত্র প্রোটন, তার পারমাণবিক ভার এক ; হাইড্রোজেনের আর একটি বিরল ও অসাধারণ রূপ বা আইসোটোপ আছে তার নাম ডিউটেরিয়াম বা ভারী হাইড্রোজেন, তার পারমাণবিক ভার দুই, কারণ কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি নিউট্রন ; এই যুক্ত বস্তুটিকে বলা হয় ডিউটেরন, তার অবশ্য পর বিদ্যুৎ ধর্ম। লেডেরম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা পেয়েছেন প্রতি-প্রোটন ও প্রতিনিউট্রনের যুক্ত রূপ প্রতিডিউটেরন, তার অপর বিদ্যুৎ ধর্ম। ১৯৭১ সালে রুশরা দুই প্রোটন ও এক নিউট্রন যুক্ত হিলিয়াম আইসোটোপের (হিলিয়াম-৩) প্রতিবস্তু আবিষ্কারের দাবি করেছে, এখন আরও জটিল প্রতিবস্তুর খোঁজ চলছে বিজ্ঞান জগতে। রুশরা বস্তু-প্রতিবস্তুর সংযোগে শক্তি সংগ্রহের স্বপ্ন দেখছে, এই চুলায় আণবিক শক্তির তুলনায় অনেক বেশী তেজ সৃষ্টি হবে।

পদার্থবিৎরা সন্দেহ করছেন যে প্রতি বস্তুর প্রতিবস্তু আছে ; পারমাণবিক কণা থেকে আরম্ভ করে তারা ও নীহারিকা পর্যন্ত সব মিলিয়ে আছে এক প্রতিজগৎ। আমাদের এই জগতের বস্তুর পরমাণুগুলির কেন্দ্র পরধর্মী, তাকে ঘিরে অপরধর্মী ইলেক্‌ট্রন ; প্রতিজগতের পরমাণুকেন্দ্র অপরধর্মী, তাকে ঘিরে পরধর্মী প্রতিইলেকট্রন বা পজিট্রন। সব বিষয়ে প্রতিজগৎ এই জগতের বিপরীতধর্মী, এমন কি সময় পর্যন্ত সেখানে উলটো দিকে বয়।

আয়নায় ছায়া যেমন বিপরীত, তেমনি প্রতিজগৎ এই জগতের প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃতি সম্পূর্ণ সমতা ও নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী।

সে জগৎ যে কোথায় আছে তা এখনও রহস্যময়, তার থেকে কিছু কিছু কণা এখানে এসে পড়ে বলে আমরা তাদের আবিষ্কার করছি। বস্তুত পৃথিবীতে কতগুলি অদ্ভুত বিকিরণ এসে পড়ছে যা আর সব রকম জানা বিকিরণের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং যার কারণ অজ্ঞাত। বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন তাদের উৎপত্তি বহু দূরে কোথাও বস্তু ও প্রতিবস্তুর তৈরি বিভিন্ন নীহারিকার আত্মঘাতী সংঘর্ষে। আমাদের সৌভাগ্য যে এ জগতে কণার তুলনায় প্রতিকণা অনেক কম, নতুবা তা হত ক্ষণস্থায়ী।

লেডেরম্যান আরও আশ্চর্য কথা বলেছেন। প্রতিজগতে সম্ভবত মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীও আছে—অন্তত তা যে নেই তা প্রমাণ করা অসম্ভব। তারা হয়তো এই মাত্র ডিউটেরন আবিষ্কার করে উত্তেজিত হয়েছে, ভাবছে অন্য জগতে তাদের মত জীবও থাকতে পারে! বস্তুত, কোনটা বস্তু আর কোনটা প্রতিবস্তু, কে সোজা আর কে উলটো তা নির্ভর করে কার মাথায় এই চিন্তা ঘুরছে তার উপর—প্রকৃতির দৃষ্টিতে এই তর্ক নিরর্থক।

এ যাবৎ আমরা বিশ্বের ধর্ম আলোচনা করেছি, কিন্তু তার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। নৈশ আকাশে অতল নক্ষত্র লোকের দিকে তাকালে সাধারণ মানুষের মনে যে দার্শনিক প্রশ্নটি জাগে তা হল এ সবের শুরু কোথায়?

এই বিষয়ে আপাতত তিনটি প্রধান প্রকল্প আছে। সবগুলিই স্বীকার করে যে মহাকাশ প্রসারণশীল।

বিস্ফোরণী বিশ্ব॥ বেলজিয়ামের জ্যোতিষী আবে লমেত্র প্রস্তাব করেছিলেন যে এক মহা আদি-পরমাণুর বিস্ফোরণ দিয়ে বিশ্বের শুরু। আজ বিশ্বে যত বস্তু (একের পরে একুশটি শূন্য বসালে যা হয় তত টন) তখন তা ঠাসা ছিল আজকের সৌর জগতের পরিধিটুকুর মধ্যে। পরে ওআশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ গ্যামো অনুরূপ এক তত্ত্ব গড়ে তোলেন, তাতে প্রসারণ আরম্ভ হয় এক অতিঘন জলন্ত কেন্দ্র থেকে যার উষ্ণতা অকল্পনীয়। সেই

তাপে অণু বা পরমাণু কিছু ছিল না, শুধু ছিল মুক্ত নিউট্রন কণার উন্মাদ নৃত্য। প্রসারণের ফলে তাপ কমতে আরম্ভ করল, নিউট্রনরা জমে দানা বাঁধল, প্রকাশ পেল ইলেক্ট্রন, ক্রমে পরমাণু তৈরি হল। সৃষ্টির এই ঊষায় মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের সব মৌলিক পদার্থ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তার পরে নতুন বস্তু আর কিছু সৃষ্টি হয় নি। বিস্ফোরণী প্রকল্পের পক্ষে যুক্তি এই যে বিস্তৃতির ফলে যে বিশ্ববস্তু ছড়িয়ে পড়ছে আগে নিশ্চয় তা আরও ঘন ছিল, হিসাব করে পিছনের দিকে গেলে আমরা ১০০০-১৭০০ কোটি বছর আগে এমন অবস্থায় পৌঁছাই যেখানে বস্তু আর ঘন হতে পারে না। তা হলে সেই সময়ে সৃষ্টির শুরু এবং বর্তমানে বিশ্বের ব্যাসার্ধও (radius) অত কোটি আলোকবর্ষ।

কিন্তু ছায়াপথের প্রাচীনতম তারাগুলির বয়স হয়তো ১৫০০-২০০০ কোটি বছর হতে পারে, কয়েকটি নীহারিকা আরও বুড়ো মনে হয়। মার্কিন জ্যোতিষী অ্যালান স্যান্ডেজ দূর নীহারিকার লাল অপসরণ, প্রাচীন তারা পুঞ্জের ঔজ্জ্বল্য ও ইউরেনিয়াম আইসোটোপের অবক্ষয় মেপে প্রথমে বিশ্বের বয়স নির্ণয় করেন ৭০০০-১৩০০ কোটি বছর, পরে নীহারিকার দূরত্ব মাপের ভুল সংশোধন করে পান ২০০০ কোটি বর্ষ।

বিস্ফোরণী তত্ত্ব অনুসারে নীহারিকাগুলি কেবলই অনির্দিষ্ট ভাবে দূরে সরে যাবে আমাদের যন্ত্রের পরিধি ছাড়িয়ে। প্রসারণ বোঝাতে ইতিপূর্বে বোমার বিস্ফোরণের কথা বলেছি ; ফাটার পরে খণ্ডগুলি বিভিন্ন বেগে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে, তারা নীহারিকার সঙ্গে তুলনীয়। সুইডেনের পদার্থ-বিৎ অস্কার ক্লাইন প্রস্তাব করেন যে বস্তু ও প্রতিবস্তুর মেঘ অভিকর্ষের টানে সংকুচিত হতে হতে এক সময়ে বর্ধিষ্ণু বিলোপ-প্রক্রিয়াজাত বিকিরণের উলটো চাপে প্রসারণ শুরু হয়, তাতে আদি বস্তু বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়—এই হল বিশ্বের উৎপত্তি।

স্পন্দিত বিশ্ব॥ কোনও কোনও বিজ্ঞানী বলেন পর বক্র বিশ্ব, যা এক মাত্র মহাকর্ষের প্রতি সাড়া দেয়, এক বার বড় এক বার ছোট হয়ে পড়তে পারে। তার মোট ভর এক বিশেষ সীমার অতিরিক্ত বলে যদি আমরা ধরে নিই, তা হলে নীহারিকাদের পারস্পরিক মহাকর্ষে তার প্রসারণের দ্রুতি ক্রমে মন্দ হতে হতে শেষে এক সময়ে একেবারে থেমে যাবে।

তার পরে অকল্পনীয় কাল কেটে যাবে, নীহারিকাদের শেষ তারাটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ারও সম্ভবত অনেক পরে শুরু হবে সংকোচন। আরও বহু যুগ পরে বিশ্ব পৌঁছাবে এক অতিঘন, অতিউষ্ণ অবস্থায়, তার সমস্ত বস্তু আবার পরিণত হবে প্রাথমিক অবপারমাণবিক কণা প্রোটন ও নিউট্রনের গ্যাসে। অতঃপর আবার আরম্ভ হবে প্রসারণ—এই চাকা ঘুরে চলবে অনন্ত কাল ধরে। এই বিশ্বকে তুলনা করা চলে হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসের সঙ্গে যা এক বার বাড়ে এক বার কমে, অথবা ঘড়ির দোলকের সঙ্গে। ভারতীয় পুরাণে বিশ্বের চক্রবৎ পুনরাবৃত্তি, প্রলয় ও সৃষ্টির কথা এইখানে মনে পড়ে।

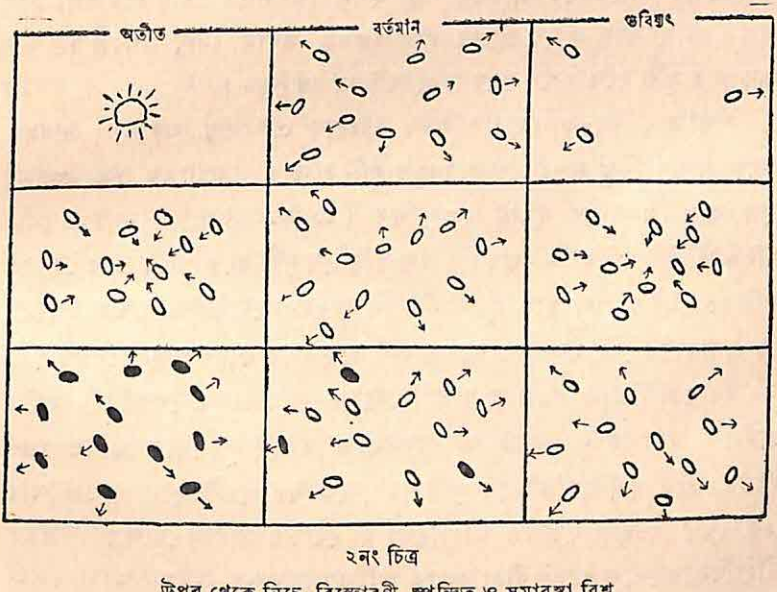
এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেকের যুক্তি এই যে প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুর গতি শুধু ক্ষয়ের দিকে—যেমন পরমাণুর অভ্যন্তরে, তেমন মহাকাশে। সূর্য তারা সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সর্বত্র উষ্ণ হয়ে পড়ছে শীতল, বস্তু পরিণত হচ্ছে তেজে, তা আবার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মনে হয় বিশ্ব এগিয়ে চলেছে এক অন্তিম 'তাপ-মৃত্যু'র দিকে—এই লয়ের পর আবার নতুন করে কি উপায়ে সৃষ্টি আরম্ভ হতে পারে তা এখন পর্যন্ত অনুমান করা কঠিন। ক্ষয়ের পর গড়ন, আঁধারের পর আলো, বিশৃঙ্খলার পরে শৃঙ্খলা, শৈত্যের পরে তাপ, প্রসারণের পরে সংকোচন প্রকৃতির ধর্মবিরুদ্ধ।

বিশ্ব কেবলই ক্ষয়ের দিকে চলেছে এই কথা মেনে নিলে তার একটা নির্দিষ্ট আরম্ভও মানতে হয়, বিস্ফোরণী বিশ্বের সৃষ্টির মতই তা কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট সুচনা মেনে নিলেও এক স্বাভাবিক প্রশ্ন থেকে যায় : সৃষ্টির আগে কি ঘটছিল, তখন কি ঘড়ির কাঁটা বন্ধ ছিল? একদা বিস্ফোরণী বিশ্ব বোঝাতে বোঝাতে জ্যোতিষী গ্যামো এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "সৃষ্টিকর্তা তখন ব্যস্ত ছিলেন যারা এই ধরনের বেয়াড়া প্রশ্ন করে তাদের জন্য নরক বানাতে।" অবশ্য কাল সম্বন্ধে আইনষ্টাইনীয় ধারণা অনুসারে এই প্রশ্ন অর্থহীন। চোখ বিনা যেমন রং নেই, বস্তু বিনা মহাকাশ নেই, তেমনি ঘটনা বিনা কাল নেই। মহাকাশ যদি বস্তুর বিন্যাস মাত্র হয়, কাল ঘটনার বিন্যাস ছাড়া কিছু নয়।

আর বিশ্বের পর বক্রতা সম্বন্ধে যে প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা যদি ভুল হয় তবে বিশ্ব হয় অপর বক্র, নয়তো বক্রই নয়। এই দুই

অবস্থাতেই তা চির কাল বেড়ে চলবে, নীহারিকারা কেবলই পরস্পরের দূরে সরে যাবে পুড়তে পুড়তে। শেষে থাকবে শুধু অন্ধকার ভস্ম-নীহারিকার ধূলি—নিরবধি সর্বত্র বিস্তৃত সমান হালকা প্রলেপে।···

সমাবস্থা বিশ্ব ॥ ১৯৪৮ সালে এই অভিনব প্রকল্প প্রস্তাব করেন ফ্রেড হয়েল, হার্মান বন্‌ডি ও টমাস গোল্‌ড, যথাক্রমে কেম্‌ব্রিজ, লন্‌ডন ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাঁরা বলেন যে বিশ্বের চেহারা মোটামুটি এক শুধু সর্বত্র নয়, সর্ব কালেও। সৃষ্টি কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়, তা অবিরত ঘটছে, এক দিকে যেমন প্রসারণ চলছে তেমনি ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন, যার ফলে মহাকাশের সমানাংশে সর্বদা একই পরিমাণ বস্তু বর্তমান। এঁদের হিসাবে প্রসারণের ক্ষতি পূরণের জন্য প্রতি ৫০ কোটি বছরে প্রতি লিটারের আয়তনে এক পরমাণু হাইড্রোজেন পরিমাণ নতুন বস্তুর সৃজন দরকার। এই বিশ্বে কি পরিমাণ বস্তু আছে তার হিসাব হয়েছে ; একের



২নং চিত্র

উপর থেকে নিচে, বিস্ফোরণী, স্পন্দিত ও সমাবস্থা বিশ্ব

পর উনত্রিশটি শূন্য বসালে যা হয় একের তত ভাগের তিন ভাগ গ্রাম আছে মহাকাশের প্রতি সিসিতে, অর্থাৎ লিটারের এক সহস্রাংশে।

এই প্রকল্প অনুসারে বিস্ফোরণ কোনও দিন ঘটে নি, কোনও কল্পিত কেন্দ্রেও বিশ্ব কখনও ফিরে যাবে না। নতুন বস্তু যা তৈরি হচ্ছে তারই চাপে বিশ্বের অবিরাম বিস্তৃতি, নতুন বস্তু জমে দানা বাঁধছে নীহারিকায়, প্রসারণজনিত ফাঁক ভরে দিচ্ছে। যে মহাকাশে প্রসারণ চলছে তার চরিত্র সাধারণ, অবক্র, ইউক্লিডীয়। তাতে জড়বস্তুর পরিমাণ অনন্ত এবং ক্রমেই তা আরও বাড়ছে। যেহেতু মহাকাশ সমতল এবং অনন্ত, কোনও কোনও নীহারিকা দূরে সরে যাচ্ছে আলোর চেয়ে দ্রুত বেগে, কারও কারও দ্রুতি অনন্তও হতে পারে। তাদের সংখ্যাও অনন্ত এবং মহাকালও অনন্ত, যেমন অনন্ত বিশ্বের বয়স।

এই তত্ত্বের জটিলতাবর্জিত দৃঢ় উক্তিগুলি অনেকে পছন্দ করেন। তা ছাড়া এতে মানতে হয় না যে হাজার দু হাজার কোটি বছর আগে বিশ্ব এক অতিঘন অবস্থায় ছিল যা তার পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে। আরও বলা যেতে পারে যে অতিঘন বস্তু কখন কি ভাবে তৈরি হয়েছিল, তার আগে কি ঘটছিল, এ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব নেই, উপরন্তু বস্তু যদি এক বার সৃষ্টি হতে পারে তবে ক্রমাগতই বা নয় কেন ?

পক্ষান্তরে অনেক জ্যোতির্বিদের বিচারে এই তত্ত্ব অদ্ভুত। প্রথমত এতে সম্পূর্ণ কিছু না-র থেকে কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানের এক গুরুতর সূত্র বলে যে বিশ্বে মোট বস্তু-শক্তির (mass-energy) নড়চড় নেই, যদিও স্থানীয় পরিবর্তন সম্ভব। বস্তু-শক্তি যে সৃষ্টি হতে পারে তার কোনও নজিরও নেই। তা ছাড়া দূরের নীহারিকা লক্ষ করে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে প্রসারণের বেগ মন্দ হয়ে পড়ছে, এই তত্ত্বে তার কোনও স্থান নেই।

সমাবস্থা বিশ্বকে প্রথম আঘাত দিয়েছেন কেম্‌ব্রিজের জ্যোতিষী মার্টিন রাইল। ইনি ৩০০ কোটি আলোকবর্ষ ও তারও দূর থেকে রেডিও গুঞ্জন সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবীর থেকে যত বেশী দূরে যাওয়া যায় তত বেশী সংখ্যক রেডিও নীহারিকা বা রেডিও তারকা মেলে। কাছের নীহারিকার থেকে দূরের নীহারিকার অধিকতর তরুণ অবস্থা আমরা লক্ষ করছি, কারণ তাদের যে রেডিও তরঙ্গ আজ আমরা ধরছি তা আরও আগে রওনা হয়েছে। তার মানে বিশ্বের অল্প বয়সে তারা বেশী ঘন হয়ে ছিল। বিশ্ব যদি সমাবস্থাধর্মী হত তা হলে রেডিও নীহারিকার ঘনতা যেমন

আজ (অর্থাৎ কাছাকাছি পরিধির মধ্যে) ৩০০ কোটি বছর আগেও তাই হত। রাইলের যুক্তি অনুসারে এতে বিস্ফোরণী প্রকল্পের সমর্থন মেলে।

ক্রমে অন্যান্য সূত্র থেকেও সমাবস্থা বিশ্বের বিরুদ্ধে যুক্তি বা নজির প্রকাশ পেল। কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে বার্তা প্রেরণের কাজে আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের দুই জন পদার্থবিৎ কিছু দিন আগে আকাশের সব দিক থেকে অতিরিক্ত রেডিও গুঞ্জন শুনতে পান যা শুধু তারা আর নীহারিকা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রায় এই সময়েই প্রিন্‌সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিৎ রবার্ট ডিক বিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন; তিনি বললেন যে বিস্ফোরণ দিয়ে যদি ব্রহ্মাণ্ডের শুরু হয়ে থাকে তবে তার চিহ্ন এখনও কিছু অবশিষ্ট থাকা উচিত। কয়েক শো কোটি বছর আগে বিগত বিস্ফোরণের পর বিশ্বের অবস্থা ছিল অতি উত্তপ্ত, তাতে ছিল প্রচুর পরিমাণ আলো ও অন্যান্য বিকিরণ, ক্রমে প্রসারণী গতির ফলে বিকিরণ দুর্বল হয় ও তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে। এই আদি বিকিরণ সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছায়াপথেও অবশ্য প্রবেশ করে। রবার্ট ডিকের হিসাবে দেখা গেল যে আদি বিস্ফোরণের অবশিষ্ট চিহ্ন হবে বিশ্ববিকীর্ণ রেডিও তরঙ্গ, ঠিক যেমন বেল টেলিফোন গবেষণাগারে পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষালব্ধ তথ্য ও যুক্তিলব্ধ তত্ত্ব এই দুইয়ের যোগাযোগ হতে দেরি হল না, তখন পরস্পরের অভাব মিটল।

মার্কিন বিজ্ঞানী মার্টেন শ্‌মিড্‌ ও অ্যালান স্যান্‌ভেজ বিস্ফোরণী ও স্পন্দিত বিশ্বের আরও সমর্থন পেয়েছেন নব আবিষ্কার কোআজ়ার জ্যোতিষ্কের বর্ণালী, দূরত্ব ও দ্রুতি বিশ্লেষণ করে। এঁদের হিসাবে প্রতি ৮২০০ কোটি বছরে বিশ্বের এক স্পন্দন (প্রসারণ ও সংকোচন)। আরও সম্প্রতি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি সি ডবলিউ ডেভিস বিশ্ব-বিস্তৃত বিকিরণের পরিমাণে এক ও অদ্বিতীয় বিস্ফোরণের তুলনায় বরং স্পন্দিত বিশ্বের সমর্থন পেয়েছেন বেশী। তাঁর প্রকল্প অনুসারে প্রতি প্রসারণ-সংকোচন চক্রের পর নতুন অতিঘন 'অগ্নিপিণ্ড' থেকে আবার চাকা ঘুরবে কাল-সাগরের বিপরীত দিকে—অর্থাৎ বর্তমান চক্রকে যদি বলি সম্মুখমুখী, তবে পরবর্তী চক্র হবে পশ্চাৎমুখী।

হয়েল বিরুদ্ধ নজির অনুসারে তাঁর তত্ত্বের অনেক সংস্কার করেছেন,

যদিও এখনও তাঁর বিশ্বাস বিশ্ব নিয়ত সৃষ্টিরত। তাঁর ভারতীয় শিষ্য জয়ন্ত নারলিকর একদা প্রস্তাব করেছিলেন যে সমাবস্থা বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত এক 'বুদবুদে' হয়তো আমাদের বাস ; এই ধরনের 'বুদবুদ' অনেকটা প্রসারণী-সংকোচনী বিশ্বের মত কাজ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে নতুন সৃষ্টি কিছু ঘটে না।

হয়েল দলে হালকা, কিন্তু তাঁর আছে অসামান্য উদ্‌ভাবনী শক্তি ও গণিত-প্রতিভা। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি তাঁর তত্ত্বের সংস্কার করে চলেছেন। সুতরাং আজও এই বিতর্কের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নি।

৪। নীহারিকা জগৎ

অকল্পনীয়, অপরিমেয় ও অর্ধদার্শনিক বিষয়ের বিবেচনা শেষ করে এখন থেকে আমাদের আলোচ্য হবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের জগৎটা—যাতে সব কিছু সহজে বোধগম্য, যদিও বিস্ময়ের সীমা নেই।

পৃথিবীর থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে যদি আমরা সরে যেতে পারি তবে এক আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের চোখে পড়বে। তারাহীন অন্ধকার আকাশটার গায়ে প্রকাণ্ড এক ক্ষীণপ্রভ চক্রাকার মেঘ, তার অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল কেন্দ্রের থেকে কয়েকটি নীলাভ বাহু গোল হয়ে এগিয়ে গিয়েছে ঝাপসা কিনারার দিকে। এই আমাদের ছায়াপথ নীহারিকা, তাতে প্রায় ১০,০০০ কোটি তারার সমাবেশ, তার মধ্যে পৃথিবী তো দূরের কথা, সূর্য যে কোথায় তাও আমরা খুঁজে পাব না। তার পর আমরা যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে মহাকাশের সাগরে আরও দূরে পাড়ি দিতে পারি তবে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ পরে পরে এমনি আরও অসংখ্য নীহারিকার দ্বীপ আমাদের চোখে পড়বে। পৃথিবীর থেকে এদের কোনওটা আমরা দূরবিনে দেখি পাশ থেকে, কোনওটা থালার মত সম্পূর্ণ আড়াআড়ি, অন্যগুলি অল্প বিস্তর তেরছা।

নীহারিকার আবিষ্কার ও সঠিক উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। এই নবপ্রতিভাত বিশাল বিশ্বের পটভূমিতে সৃষ্টির রহস্য ও বিস্ময় বহু গুণ বিস্ফারিত হল, কারণ এর তুলনায় কোপার্নিকাস, কেপ্‌লার এমন কি গ্যালিলিও, নিউটনের বিশ্বও অতি ক্ষুদ্র ; আমাদের পৃথিবী, যা মানুষের কল্পনায় বহু কাল সৃষ্টির কেন্দ্রে স্থান পেয়েছিল, হয়ে পড়ল আরও তুচ্ছ। মানুষের মধ্যে যারা ভাবুক তাদের ভাবনায় বিস্তৃত হল নিরাসক্তির ক্ষেত্র।

নীহারিকা যে প্রধানত অগুনতি তারার পুঞ্জ তা না জানলেও অনেক দিন ধরেই আকাশদর্শীরা তাদের লক্ষ করেছে। ৯৬৪ সালে আল সুফি

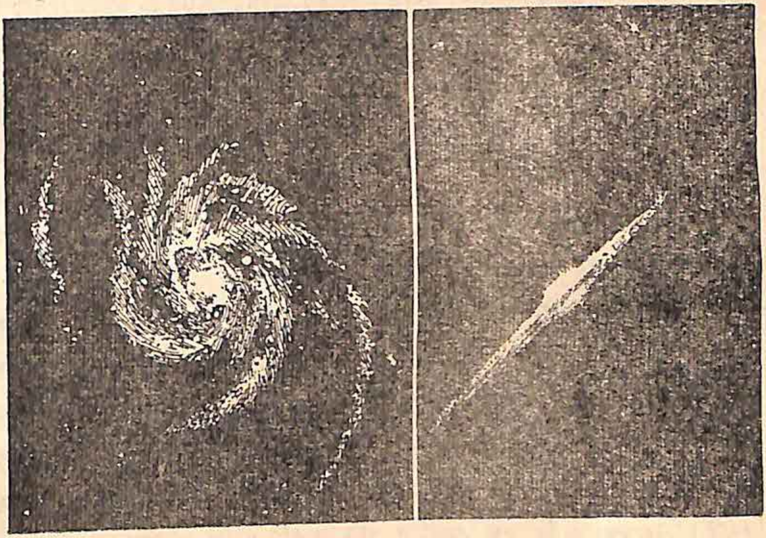
নামক এক পারসীক আজ যার নাম অ্যানড্রমিডা সেই নীহারিকাকে স্থির তারা রূপে বর্ণনা করেছিলেন। অ্যানড্রমিডা খালি চোখে দেখা যায় চাঁদহীন পরিষ্কার অন্ধকার আকাশে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে অল্প একটুখানি প্রভার মত। খালি চোখে আর দুটি মাত্র নীহারিকা ধরা দেয়, এরা আছে আরও কাছে, ম্যাজেলান নামক এক প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ও আবিষ্কারকের নামে এদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে ম্যাজেলানীয় মেঘ। পঞ্চদশ শতাব্দে পর্তুগালীয় নাবিকরা প্রথম এদের লক্ষ করে।

প্রাথমিক দূরবিনের সাহায্যে আরও অনেক নীহারিকা চোখে পড়ল, সবই অস্পষ্ট মেঘের মত। এদের তখন বলা হত নেবুলা, শব্দটি ল্যাটিন, অর্থ কুয়াশা বা মেঘ যার কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। নীহারিকা প্রধানত তারার সমষ্টি হলেও আজ আমরা এও জানি যে তাতে অল্প বিস্তর গ্যাস ও ধূলিও থাকে। আবার অন্যান্য শ্রেণীর জ্যোতিষ্কে অনেকখানি গ্যাসের মধ্যে মাত্র একটি বা কয়েকটি তারার অবস্থানও দেখা যায়। তারার আলোয় গ্যাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যদিও মাঝে মাঝে অন্ধকার এলাকাও চোখে পড়ে যেখানে আলো শুষে নিচ্ছে গ্যাসের কোনও উপাদান (যেমন বর্ণালীতে ধরা পড়ে)। সুতরাং নেবুলা নামটা বর্তমানে খুব চলতি না হলেও তার কিছুটা সার্থকতা আছে।

যাই হক, প্রথম দিকে আকাশদর্শীরা সব রকম নেবুলাকেই আপদ বলে গণ্য করতেন—তারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতাব্দে শার্ল মেসিয়ে নামক এক ব্যক্তি প্যারিসের এক মিনার থেকে নিয়মিত ধূমকেতু আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি ১০৩ দুষ্ট নেবুলা ও তারকা পুঞ্জের এক তালিকা বানিয়েছিলেন তাদের এড়াবার উদ্দেশ্যে; আজ অনেক নীহারিকার বৈজ্ঞানিক আখ্যায় এঁর পদবির প্রথম অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়, যথা অ্যানড্রমিডার অন্য নাম M ৩১। অন্যরাও গ্যাসীয় মেঘ ও নীহারিকার পার্থক্য ধরতে পারেন নি; এই সময়ে এই দুইয়ের বর্ণনায় 'দ্বীপ বিশ্ব' (island universe) আখ্যাটি ব্যবহার হয়, যদিও আসলে তা শুধু নীহারিকার প্রতি প্রযোজ্য।

এদের পাকানো আকার প্রথম ধরা পড়ে আজ যাকে আমরা ঘূর্ণি নীহারিকা (Whirlpool galaxy) বলি সেটির মধ্যে, যখন লর্ড রস তাঁর

৭২ ইঞ্চি দূরবিনের সাহায্যে তার একটি ছবি আঁকেন। ১৮৫০ সালে চৌদ্দটি নীহারিকার এই সর্পিল বা কুণ্ডলিত আকৃতি জানা ছিল। জি ডবলিউ রিচি ক্যালিফর্নিয়ার উইল্‌সন গিরিতে এক প্রতিফলনী দূরবিন তৈরি করেন, তার দ্বারা ১৯০৮ সালে তিনি কাছাকাছি নীহারিকার মধ্যে পৃথক তারা দেখতে পান, যদিও খুবই অস্পষ্ট ভাবে।



৩নং চিত্র

চক্র নীহারিকার মুখোমুখি ও আড়াআড়ি রূপ, বাঁয়ে '.মেসিয়ে ১০১', ডাইনে 'বেরেনিসের চুল'। দৃষ্টিকোণ অনুসারে দূর থেকে আমাদের ছায়াপথ নীহারিকা এদেরই মত দেখাবে।

১৯৬১-১৮ সালের মধ্যে হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যক্ষ হার্লো শাপ্‌লি ছায়াপথের আয়তন মাপেন এবং প্রমাণ করেন যে তার তারাগুলি একই সমষ্টির অন্তর্গত। দেখা গেল ম্যাজেলানীয় মেঘদুটিও তারার সমষ্টি। এর পরে নীহারিকা বলতে আজ আমরা যা বুঝি সেই ধারণার পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি দল গড়ে উঠল। এই তর্কের মীমাংসা হল ১৯২৫ সালে যখন এডউইন হাব্‌ল উইল্‌সন গিরির ১০০ ইঞ্চি দূরবিনের সাহায্যে কয়েকটি তথাকথিত নেবুলার অন্তর্গত তারার পৃথক রূপ স্পষ্ট প্রকাশ করলেন; প্রমাণ হল এরা নীহারিকা।

হাবৃল এবং তাঁর সহকর্মীরা তখন দৃষ্টির পরিধি বাড়িয়ে নব নব নীহারিকা আবিষ্কার করে চললেন। তাঁদের হিসাবে দেখা গেল ছায়াপথে যত তারা তার বাইরে আছে তারও বেশী নীহারিকা। অন্যান্য গবেষক এই সব তথ্য সমর্থন ও পরিবর্ধন করলেন।

নীহারিকার মধ্যে কোনওটা বড় কোনওটা ছোট, গড়ে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে ১০০ কোটিরও বেশী তারা, গ্রহের সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশী। আমাদের দৃষ্টি শক্তি যত বাড়ছে তত নীহারিকার সংখ্যাও বাড়ছে। এখন সবচেয়ে যা ক্ষীণ তা ছিল প্রায় ৭০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আজ তারা আরও কত দূরে সরে গিয়েছে! তাদের তেজ সম্পূর্ণ মরে গিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে।

নীহারিকার আয়তন ও চরিত্র বুঝতে এ পর্যন্ত নিকটতম যে ক'টির নাম করেছি তাদের সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা দরকার।

প্রথমেই অবশ্য আমাদের ছায়াপথ, অনুমান করা হয় এর সৃষ্টি অন্তত ১০০০ কোটি বছর আগে। আগে বলেছি এতে তারার সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ কোটি; আমরা যদি সেকেন্ডে একটি করে তারা গুনি তবে সব গুনে শেষ করে উঠতে লাগবে ২৫০০ বছর, যদি পৃথিবীর সব লোককে সমান ভাগে ভাগ করে দিই তো প্রত্যেকের ভাগে পড়বে প্রায় ত্রিশটি। এদের প্রতি দুই কোটির মাত্র একটি খালি চোখে ধরা পড়ে। এরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে সৃষ্টি করেছে অনেকটা গরুর গাড়ির চাকা বা উত্তল লেন্সের আকৃতি, অর্থাৎ ছায়াপথের মাঝখানটা উঁচু ধারের তুলনায়। এই কেন্দ্র স্থল বা নাভিতে তারার ঘনতা বেশী, বাইরে হাইড্রোজেন বেশী। সব চাকাটার যা ব্যাস নাভির উচ্চতা তার দশ বা ১৫ ভাগের এক ভাগ। আর চাকার ব্যাস কত? বিদ্যুৎ গতিতে তার এক মাথা থেকে আর এক মাথায় পাড়ি দিতে আলো নেয় প্রায় এক লক্ষ বছর!

নাভির থেকে প্রান্ত পর্যন্ত যতটা দূর তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করলে পাওয়া যাবে সূর্য ও তার গ্রহ পরিবারকে। সমগ্রের অনুপাতে এই সূর্য লোক যে কত ক্ষুদ্র তা বোঝা যাবে দুটি কাল্পনিক আকাশ যাত্রার তুলনা করলে। কোনও রকেট যদি যায় ঘণ্টায় লক্ষ মাইল,

তবে সূর্য থেকে দূরতম গ্রহ প্লুটোয় পৌঁছাতে লাগবে চার বছর দু মাস, আর ছায়াপথের সবটা অতিক্রম করতে নেবে ৬৭০০ লক্ষ বছর। তা ছাড়া সূর্য অতি সাধারণ বিশেষত্ববর্জিত তারা। ছায়াপথও যে নীহারিকার সবচেয়ে মামুলি দলে পড়ে তাও আমরা একটু পরে দেখব। সুতরাং কোনও দিক দিয়েই আমাদের বিশেষ গর্বের কারণ নেই।

মহাকাশের অন্যান্য নাহারিকার মত ছায়াপথও যে শুধ অন্যদের তুলনায় দূরে সরে যাচ্ছে তাই নয়, নিজের নাভিকে ঘিরে চাকার মতই ঘুরছে। চাকার সব অংশ সমান জোরে ঘোরে না, ধারের দিকে গতি কিছুটা ঢিলে; সেকেন্ডে ১৫০ মাইল বেগে এক পাক ঘুরে আসতে সূর্যের লাগে ২০ কোটি বছর, অর্থাৎ তার যা বয়স তাতে এ যাবৎ চাকার গায়ে সে মাত্র ২০ বার ঘুরপাক খেয়েছে।

তারাদের যেমন অনেক সময়ে ছোট বড় দলে পাওয়া যায়, নীহারিকারাও তেমনি প্রায়ই পারস্পরিক মহাকর্ষে কাছাকাছি বাঁধা থাকে। এই নৈসর্গিক সভার কোনও কোনওটায় কয়েক শো এমন কি কয়েক হাজার সভ্য, এইখানেও আমরা আছি নগণ্য শ্রেণীতে—ছায়াপথের স্থানীয় দলে (৩০ লক্ষ আলোকবর্ষের মধ্যে) আছে মাত্র গোটা কুড়ি নীহারিকা। এক অ্যানড্রমিডা ছাড়া তারা সবই আরও ছোট। ১৯৭১ সালে কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর বয়স্ক ছাত্র রবার্ট ল্যান্ডো ছায়াপথের ত্রিশ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে আরও দুটি নেবুলা আবিষ্কার করেন, এর আগে ইটালীয় জ্যোতিষী মাফেই তাঁর অবলোহিত ফিল্মে ঐ জায়গায় অস্পষ্ট দাগ দেখেছিলেন, সুতরাং এদের নাম হয়েছে মাফেই ১ ও ২।

কাছাকাছি থাকার ফলে দলীয় নীহারিকাদের মধ্যে কখনও কখনও ধাক্কাধাক্কি হয়, তাতে অবশ্য তারাদের গায়ে গায়ে ঠেকে না কারণ তাদের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক, মধ্যস্থলে গ্যাসীয় মেঘ ও ধূলি ঘষা খেয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তার থেকে লাল রশ্মি, উত্তাপ ও রেডিও তরঙ্গ সৃষ্টি হওয়া উচিত। বস্তুত কতগুলি ধাক্কা-খাওয়া নীহারিকার থেকে রেডিও তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়, কিন্তু রেডিও তরঙ্গ বিতরণী নীহারিকার সংখ্যা এত বেশী যে শুধু ঘর্ষণের চাপে পড়ে নয়, নিশ্চয় অন্য কারণেও তারা রেডিও বাণী প্রচার করে।

নীহারিকালোকে আরও অনেক রকম 'অদ্ভুত বস্তু' দেখা গিয়েছে। কোথাও কি এক অজ্ঞাত শক্তি নীহারিকাকে টেনে তার বিন্যাস নষ্ট করে দিয়েছে অথবা ছিঁড়ে দু টুকরো করেছে। কোনও কোনোটা মনে হয় যুগল নীহারিকা, তাদের মাঝখানে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দীর্ঘ তারাস্রোতের সেতু; ঘূর্ণি নীহারিকা এই দলে পড়ে। আরও এক জাতকে দেখে মনে হয় তারা যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে এবং দূরপারানী চুম্বকী আকর্ষণে পরস্পরের থেকে তারার বা বস্তুর পুচ্ছ বার করে নিচ্ছে। কয়েকটি জুড়ি নীহারিকা মনে হয় পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, মহাকাশে একই স্থান জুড়ে বসে আছে। আবার কারও বিস্ফোরণ বিশাল এক অগ্নিশিখা শূন্যে নিক্ষেপ করেছে, তার দৈর্ঘ্য সমগ্র এক নীহারিকার সমান। 'অদ্ভুত' নীহারিকাগুলি সাধারণত যে পরিমাণ রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে তার শক্তি সাধারণ কুণ্ডলিত নাহারিকা-জাত তরঙ্গের তুলনায় বহু লক্ষ গুণ বেশী।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিস্ফোরণী নীহারিকা, এদের প্রায় ত্রিশটির ছবি তোলা হয়েছে। বাগানে জল দেওয়ার কল যখন পাক খেতে খেতে দুই মুখ থেকে জল ছেটায় তখন যেমন দেখায় প্রায় সেই রকম চেহারা। হিসাবে দেখা যায় কোনও কোনও কুণ্ডল দশ লক্ষ বছরে এত বস্তু শূন্যে নিক্ষেপ করে যা দিয়ে আর একটি ছোট নীহারিকা গড়া চলে। কিন্তু এই সময়টা নীহারিকার আয়ুর ক্ষুদ্র অংশ, সুতরাং বস্তুর পরিপূরণ কি করে হয় তা এখনও এক রহস্য। ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে হাইড্রোজেন মেঘের স্রোত ছুটতে দেখা যায়, কিন্তু এই উপায়ে বিস্ফোরণী নীহারিকা-গুলির সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় কিনা সন্দেহ। বিস্ফোরণের কারণই বা কি? হয়েল একদা বলেছিলেন কোনও এক তারার বিস্ফোরণ (অতিনোভা [supernova]) অন্য এক তারাকে ফাটায়, তা আবার আর একটিকে, এমনি করে বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ে নীহারিকায়। পরে তিনি বলেন হয়তো নীহারিকার গর্ভে অজ্ঞাত উপায়ে সমপরিমাণ বস্তু ও প্রতিবস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের সংযোগে বস্তু নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, প্রতিবস্তু থেকে যাচ্ছে। কখনও কখনও এই গর্ভ থেকে প্রচুর অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ অজ্ঞাত প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়।

ছায়াপথের যা ব্যাস তার থেকে মাত্র ততটা দূরে আছে ম্যাজেলানীয় মেঘ ; হয়তো তা একদা তারই থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অথবা তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।

এখানে নামকরণ সম্বন্ধে দু কথা বলা যেতে পারে। আমাদের এই নীহারিকাকে আমরা এক পাশ থেকে দেখছি বলে তারার ঘনতার ফলে নৈশ আকাশের গায়ে তা এক সাদা স্রোতের মত দেখায়, সেই কারণে এর ইংরেজি নাম দুগ্ধপথ এবং বাংলায় আর এক নাম আকাশগঙ্গা। পাশ্চাত্ত্য পুরাণে বলে এই পথে মৃতের আত্মারা স্বর্গে যেত। আবর্তের মধ্যে পাকখাওয়া জলের মত দেখতে বলে ঘূর্ণি নীহারিকার ঐ আখ্যা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে অধিকাংশ জ্যোতিষ্কের (নীহারিকা, তারামণ্ডল, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, ইত্যাদি) নাম নেওয়া হয়েছে গ্রীসীয় বা রোমক কাহিনীর থেকে, যদিও নানা জন্তুর নামও পাওয়া যায়। গ্রীসীয় পুরাণে অ্যানড্রমিডা ছিল রাজা সিফিউস ও রাণী ক্যাসিওপিয়ার সুন্দরী কন্যা, এই তিন নামেই আছে তারামণ্ডল (অ্যানড্রমিডা তারামণ্ডলে অ্যানড্রমিডা নীহারিকার স্থান); হেমন্ত ও শীতের আকাশে এই পরিবারটিকে একত্র পাওয়া যায়, অদূরে থাকে তরুণ বীর পার্সিউস, যে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছিল এক দানবের হাত থেকে।

ছায়াপথের তুল্য যাদের কলেবর এমন নীহারিকাদের দলে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী অ্যানড্রমিডার নাভিকে বেশ শক্ত করে জড়িয়ে আছে নৈসর্গিক ধূলি বিকীর্ণ সাতটি বাহু। আকাশের গায়ে এই সপ্তভুজ চক্রকে দেখায় তেরছা এক থালার মত। আর আয়তন ? তার ছবি সমগ্র ইয়োরোপের সমান বড় করলে তবে তার মধ্যে সূর্যের মত কোনও তারাকে চোখে দেখা যাবে। এই বিশাল চাকা মহাকাশে ঘুরছে, দুই কোটি বছরে এক বার। কুণ্ডলিত নীহারিকাদের এই ঘূর্ণি বেগ তাদের ঐ বাহুগুলির চেহারা থেকেই প্রতীয়মান, সেগুলি যে দিকে টানা নীহারিকা যে তার উলটো দিকে ঘুরছে তাতেও সন্দেহ থাকে না।

এ পর্যন্ত যা বলা হল তার থেকে মনে হতে পারে যে সব নীহারিকারই বুঝি চাকার মত চেহারা, কিন্তু তা নয়, যদিও এই

আকৃতিই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। হাব্‌ল প্রমুখ জ্যোতিষীদের গবেষণার ফলে লক্ষ লক্ষ 'দ্বীপ বিশ্ব' উদ্‌ঘাটিত হল, তাদের অধিকাংশ আয়তনে ছায়াপথের চেয়ে ছোট, কয়েকটি বড়। চেহারা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা চলে : কুণ্ডলিত, উপবৃত্তিক এবং অবিন্যস্ত। ছায়াপথ ও অ্যান্‌ড্রমিডার বর্ণনায় কুণ্ডলিত নীহারিকার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, নাভিকে ঘিরে সর্পিল বাহুগুলি নিয়ে আকাশের গায়ে তাদের দেখায় বিশাল অগ্নি-আবর্তের মত। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীকরণে এদের চিহ্ন S (spiral থেকে), হাব্‌ল আবার তিনটি ছোট বিভাগও সৃষ্টি করলেন—Sa, Sb, Sc ; প্রথম শ্রেণীর নাভি বড় এবং বাহুগুলি সবচেয়ে আঁট করে জড়ানো, তৃতীয় শ্রেণীর বাহুগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট নাভিকে ঘিরে সবচেয়ে ঢিলে করে জড়ানো। ছায়াপথ ও অ্যান্‌ড্রমিডা দুইই পড়ে মাঝামাঝি Sb দলে—ছায়াপথকে অবশ্য আমরা বাইরের থেকে দেখতে পাই না, অ্যান্‌ড্রমিডাকে দেখে তার চেহারা অনুমান করি। আর ঘূর্ণি নীহারিকার স্থান Sc বিভাগে।

কুণ্ডলিত নীহারিকার আরও একটি বিশেষ রূপ লক্ষিত হল। যার নাভিটি ঠিক গোলাকার না হয়ে দু পাশে কিছুটা টানা। এই অংশটা অনেকটা দণ্ডের মত দেখতে বলে এদের নাম দণ্ডিত কুণ্ডল—বৈজ্ঞানিক চিহ্ন SB (barred spiral থেকে)। এদের মধ্যেও আগের মত a, b, c বিভাগ আছে। কি করে যে দণ্ডিত কুণ্ডলগুলি ঘুরপাক খায় এবং সংযুক্ত থাকে তা এখনও কেউ জানে না।

উপবৃত্তিক নীহারিকার আকৃতি অবশ্য উপবৃত্তের মত, তবে এদের মধ্যে প্রায় গোল থেকে অনেকখানি চ্যাপটা পর্যন্ত সব রকম রূপই মেলে। এদের চিহ্ন E (ellipse থেকে), E_0 প্রায় গোলকরূপী এবং E_7 সবচেয়ে চ্যাপটা মাঝামাঝি E_1 থেকে E_6 পর্যন্ত বিভাগ। অ্যান্‌ড্রমিডার দুটি সঙ্গী উপনীহারিকা আছে। তারা উপবৃত্তিক শ্রেণীর। সম্প্রতি আকাশের মাঝেই নেবুলাদ্বয়ের দিকে একটি কুণ্ডলিত ও একটি উপবৃত্তিক নীহারিকা আবিষ্কার হয়েছে (ব্যাস যথাক্রমে এক লক্ষ এবং দশ হাজার আলোকবর্ষ), এদের একের প্রান্ত যেন অন্যটির উপর চেপেছে।

অবিন্যস্ত নীহারিকাদের বিশেষ কোনও আকৃতি নেই, নেবুলা শব্দের

আক্ষরিক অর্থ ও সনাতন ধারণার সঙ্গে এরাই সবচেয়ে বেশী মেলে। হাব্‌ল প্রবর্তিত শ্রেণীতে এদের বৈজ্ঞানিক চিহ্ন Irr (irregular থেকে)। ম্যাজেলানীয় মেঘদ্বয় এই শ্রেণীর। আমাদের এক কোটি আলোকবর্ষ দূরে ঘূর্ণি নীহারিকারও এক অবিন্যস্ত সঙ্গী আছে।

এই তিন শ্রেণীর নীহারিকা পরীক্ষা করে দৈহিক উপাদানে কিছু কিছু পার্থক্য ধরা পড়ল যার ফলে তাদের সৃষ্টি ও ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অবিন্যস্ত নীহারিকায় প্রধানত দেখা যায় প্রকাণ্ড, উত্তপ্ত, নীল বা নীলাভ সাদা রঙের উজ্জ্বল তারা এবং তাদের মধ্যে মধ্যে অপর্যাপ্ত বিক্ষুব্ধ গ্যাস (হাইড্রোজেন) ও ধূলি বা বস্তু কণা। এই তারাগুলি বয়সে তরুণ, এদের বলা হয় এক-বংশীয় (Population I)। কুণ্ডলিত নীহারিকার বাহুতে মেলে এক-বংশীয় তারা, তার মধ্যে কতগুলি সবে সৃষ্টি হচ্ছে ; ঠাসা নাভি এবং নীহারিকাকে ঘিরে যে মণ্ডলটি থাকে তাতে প্রধানত মেলে বয়স্ক দুই-বংশীয় (Population II) তারা। এই তারাগুলি নানা রকম শ্রেণীতে পড়ে, যেমন লাল দানব, বামন, অস্থিরদ্যুতি ইত্যাদি। উপবৃত্তিক নীহারিকা অবিন্যস্ত শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত : তাতে নতুন তারার সৃষ্টি একেবারেই নেই, ধূলি ও গ্যাসও তারা গড়তে সব খরচ হয়ে গিয়েছে ; সাধারণত তারা বড় নীহারিকা, উপাদানে আছে শুধু দুই-বংশীয় তারা (প্রকাণ্ড লাল দানব, সাদা বামন এবং অস্থিরদ্যুতি— এদের সঙ্গে আমরা পরে পরিচয় করব)।

এই সাধারণ নিয়মগুলির ব্যতিক্রম অবশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়, যেমন কোনও কোনও অবিন্যস্ত নীহারিকার গ্যাস অল্প, বুড়ো লাল তারাও আছে কিছু কিছু। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অবিন্যস্ত শ্রেণীর থেকে ক্রমে কুণ্ডলিত ও উপবৃত্তিক নীহারিকা গড়ে ওঠে। তবে হয়তো অবিন্যস্তদের মধ্যে শুধু বড়গুলিরই এই রকম বিবর্তন ঘটে।

হাব্‌লের সহকর্মী ওআল্‌টার বাড নীহারিকার ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন, তার থেকে এ বিষয়ে আজ মোটামুটি এক ধারণা গড়ে উঠেছে, যদিও এখনও তা কিছুটা আনুমানিক। প্রথমে অবিন্যস্ত অবস্থা, প্রকাণ্ড বিক্ষুব্ধ হাইড্রোজেন মেঘগুলি মহাকর্ষের প্রভাবে সংকুচিত হতে হতে ক্রমে তারায় দানা বাঁধতে আরম্ভ করল। তার পর অপেক্ষাকৃত বড় অবিন্যস্ত

নীহারিকাগুলি ধীরে ধীরে কুণ্ডলিত আকার নিতে পারে। আমাদের নিকটতম অবিন্যস্ত ম্যাজেলানীয় মেঘ দুটির মধ্যে নাভির ইঙ্গিত মেলে, বড়টিতে কিছুটা কুণ্ডলিত বাহুর গঠনও দেখা যায়। এটি ক্রমে সম্পূর্ণ কুণ্ডলিত নীহারিকা হয়ে দাঁড়াতে পারে। রেডিও জ্যোতিষীরা লক্ষ করেছেন যে ছায়াপথের নাভির থেকে প্রকাণ্ড হাইড্রোজেন মেঘ ধারের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু ঘূর্ণি বেগ, মহাকর্ষ ও অন্যান্য বলের ঠিক কি রকম যোগাযোগে গ্যাসীয় মেঘের থেকে পাকানো বাহু বার হতে পারে, এবং পরে টিঁকে থাকতে পারে, জ্যোতিষীদের কাছে এখনও তা খুব পরিষ্কার নয়।

বেশ কয়েক বছর আগে জেম্‌স জীন্‌স এ সম্বন্ধে এক সহজ ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, যদিও তাতে হয়তো সব কিছুর ব্যাখ্যা হয় না। এই ধারণা অনুসারে এক প্রকাণ্ড গ্যাসীয় গোলকের সংকোচনের ফলে তার ঘূর্ণি বেগ বাড়ল, তার ফলে আবার গোলক ক্রমশ চ্যাপটা হয়ে পড়ল; তখন তার কটি দেশ বা নিরক্ষ রেখা অঞ্চল থেকে বস্তু ছুটে বার হয়ে চাকার পাকি ও প্রান্ত সৃষ্টি করে থাকতে পারে—আদি গোলকের চিহ্ন হিসাবে পড়ে রইল ক্ষুদ্রতর চ্যাপটা নাভিটি; ইতিমধ্যে গ্যাস জমে আলাদা আলাদা ছোট গোলক বা তারা সৃষ্টি হয়েছে। তার আগে ঠিক সেই রকমই মহাকাশে সমবিস্তৃত গ্যাস মাঝে মাঝে দানা বেঁধে সৃষ্টি হয়েছিল নীহারিকা। এই প্রক্রিয়াটিকে জীন্‌স তুলনা করেছেন কেতলি থেকে নির্গত বাষ্পে ইতস্তত বারি বিন্দুর আবির্ভাবের সঙ্গে।

নীহারিকার কুণ্ডলিত আকৃতি যে ভাবেই গড়ে উঠে থাকুক, এক সময়ে নাভির গ্যাস প্রায় শেষ হয়ে যাবে এবং বাইরের দিকে আর ততটা ছড়াবে না। তখন ক্রমে বাহুগুলির গ্যাসীয় অংশ আরও আঁট হয়ে ভিতরের দিকে জড়াবে, অবশেষে মুক্ত গ্যাস নাভিতে ফিরে আসবে, যে সব তারা তৈরি হয়ে গিয়েছে তারা পড়ে থাকবে নিজ নিজ কক্ষে। এই পরিণতির ফলে নীহারিকা তার কুণ্ডলিত রূপ ত্যাগ করে হয়ে দাঁড়াবে অতি চাপা উপবৃত্ত। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি নীহারিকাও দেখা যায়, এরা So দলীয়, তাদের চক্র রূপ স্পষ্ট, কিন্তু তার মধ্যে সর্পিল বাহু নেই, ধূলি এবং গ্যাসের চিহ্ন সামান্য, অথবা একেবারেই অনুপস্থিত।

উপবৃত্তিক নীহারিকায় তারা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে মনে হয়, তারা

মধ্যবর্তী গ্যাসও প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষয়িত। উপবৃত্ত যে নানা আকৃতির হয় তা আগে বলা হয়েছে, চাপা রূপ ক্রমশ গোল হয়ে উঠতে পারে—যে সব কুণ্ডলের ঘূর্ণি বেগ বেশী হয়তো তাদের থেকে হয় চাপা উপবৃত্ত আর মন্থরদের থেকে গোল।

প্রথম দিকে নীহারিকার ভর এবং আপনগড়া মহাকর্ষীয় শক্তি যদি যথেষ্ট থাকে তবে সে হালকা নীহারিকার তুলনায় বেশী দ্রুত বিবর্তিত হতে পারে, ঠিক যেমন বড় তারা দ্রুত বিবর্তিত হয় ছোটর তুলনায়। তা হলে যখন সে উপবৃত্ত অবস্থায় আসবে তখনও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে তার নক্ষত্র দল। গ্যাসীয় মেঘের আয়তন, ঘনতা ও ঘূর্ণি বেগের উপর নির্ভর করে তার বিবর্তন; বৃহৎ ঘন মেঘ দ্রুত ব্যবহার করবে তার গ্যাস, দানা বাঁধবে তারায়, বুড়িয়ে যাবে উপবৃত্তে; হালকা ছড়ানো মেঘে বিন্যাসের কাজ চলবে আরও ধীরে।

বস্তুত, পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ উপবৃত্তিক ব্যবস্থা ভারী এবং অধিকাংশ অবিন্যস্ত ব্যবস্থা হালকা। তাই যদি হয় তবে এমন অনুমান করতে কোনও বাধা নেই যে সবচেয়ে ভারী সবচেয়ে সুবিন্যস্ত উপবৃত্তিক থেকে আরম্ভ করে অল্পতম ভর ও শৃঙ্খলা যুক্ত অবিন্যস্ত নীহারিকা সবই একই কাল ধরে বিবর্তিত হচ্ছে—কেউ এগিয়ে গিয়েছে কেউ পিছনে পড়ে আছে মাত্র। হয়তো সবচেয়ে দীর্ঘায়ু ও অবিন্যস্ত নীহারিকার এখনও অধিকাংশ অন্ধকার, তাতে এখনও ভাল করে তারার দীপ জ্বালা হয় নি, এখানে ওখানে দু চারটি সদ্যোজাত নক্ষত্রকে ঘিরে কালো পাতলা গ্যাস বয়ে চলেছে।

বিবর্তনের কোন অবস্থায় কতখানি সময় কাটে তারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। হাব্‌ল বিভিন্ন শ্রেণীর নীহারিকার সংখ্যা গণনা করেছিলেন, তাতে দেখা যায় কুণ্ডলিত শতকরা ৮০ ভাগ, উপবৃত্তিক প্রায় ১৭ ভাগ, এবং অবিন্যস্ত তিন ভাগেরও কম। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫, ২০ ও পাঁচ ভাগ। তার থেকে এই দাঁড়ায় যে এক একটি নীহারিকা গড়ে তাদের আয়ুর ২০ ভাগের এক ভাগ কাটায় অবিন্যস্ত অবস্থায়, তিন চতুর্থাংশ কুণ্ডলিত, ও বাকি এক পঞ্চমাংশ উপবৃত্ত অবস্থায়।

এত কথার পর মনে হতে পারে যে আমাদের বিশ্ব বুঝি প্রধানত নীহারিকা দিয়ে তৈরি, কিন্তু সেই ধারণা ভুল। নীহারিকার ভিতরে যে গ্যাস আছে (শতকরা ৬-৮ ভাগ) সেই প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাসই বিশ্বের বড় উপাদান। তারার ফাঁকে ফাঁকে বিকীর্ণ এই গ্যাসের পরিমাপ এখনও হয় নি, তবে এমন অনুমান করা হয়েছে যে তার তুলনায় নীহারিকার তারাবস্তু শতকরা মাত্র এক ভাগ হতে পারে। এই হিসাবে দুই সহস্র কোটি বছর আগে শুরুতে বিশ্ব যেমন ছিল আজও প্রায় তাই আছে।

আর সমগ্র মহাকাশে নীহারিকার অংশ কতটা? ১৯৬৫ সালে রুশ জ্যোতিষী ভিটালি গিন্‌সবার্গ ও লিওনিড ওজের্নয় বলেন যে মহাকাশের ৯৯ শতাংশ অধিকার করে আছে অতি উত্তপ্ত দেশ (প্রায় এক লক্ষ ডিগ্রি), বাকি মাত্র এক শতাংশে আছে নীহারিকা!

৫। কোআজ়ার ও পাল্‌সার

বর্তমানে আকাশ লোকের সবচেয়ে বড় রহস্য যে এক শ্রেণীর নব-আবিষ্কৃত জ্যোতিষ্ক এই বার তাদের আলোচনা দরকার। এদের বলা হয় 'উপনাক্ষত্র রেডিও প্রভব' (quasi-stellar radio source), অথবা ইংরেজি নামের আদি অক্ষরগুলি দিয়ে সংক্ষেপে কোআজ়ার (quasar)। নামের থেকেই প্রতীয়মান যে এরা ঠিক তারা নয়, যদিও তারার মত দেখতে। নীহারিকার সঙ্গেও এদের সম্পূর্ণ মিল নেই।

এই রহস্যের সূত্রপাত হয় একদা যখন দেখা গেল কয়েকটি জ্যোতিষ্ক এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে তেজ বিকিরণ করছে যা তারা বা নীহারিকার পক্ষে অসম্ভব। প্রথমে এদের ধরা গেল শুধু রেডিও গুঞ্জন শুনে, চোখে দেখা গেল না সবচেয়ে বড় দূরবিন দিয়েও। ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলীয় রেডিও জ্যোতিষীরা একটি প্রভবকে সূক্ষ্ম ভাবে নির্ধারিত করার পর পালোমার গিরির ২০০ ইঞ্চি দূরবিন দিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পরের বছর তা দৃষ্টিগোচর হয়। এই বস্তুটির নাম আজ ৩C ২৭৩, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে দেখা গেল তাকে আমরা অনেক দিন ধরে আমাদেরই ছায়াপথ নীহারিকায় কন্যা তারামণ্ডলের অধিবাসী এক তারা বলে জানি।

আসলে অবশ্য এটা তার ছদ্মবাস, সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে প্রমাণ হল ৩C ২৭৩ পৃথিবীর থেকে ২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে, অর্থাৎ ছায়াপথের অনেক বাইরে তার স্থান। দূরত্ব অবশ্য পাওয়া গেল তার দ্রুতি থেকে, তার আবার মাপ মিলল বর্ণালীতে লাল অপসরণ দেখে।

এই বিশাল দূরত্ব সত্ত্বেও দেখা গেল উজ্জ্বলতায় আকাশের আর সব জ্যোতিষ্ক তার কাছে হার মানে, ১৩ মানের (magnitude) এক তারকার সমান তার দ্যুতি। অত দূরে কোনও নীহারিকাকে দেখতে দরকার হয় প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ, কিন্তু এই বস্তুটি সহজেই ধরা চলে যে কোনও ভাল ঘরোয়া

দূরবিন দিয়ে। এত শক্তি এত তেজ কোথা থেকে আসে? এই বৃহৎ প্রশ্নটি নিয়ে আজ জগতের সেরা জ্যোতিষী ও পদার্থবিৎরা মাথা ঘামাচ্ছেন, এখন পর্যন্ত কোনও কূল কিনারা পাওয়া যায় নি, যদিও প্রশ্নের নানা অভিনব জবাব কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোচনার আগে কোআজ়ারদের সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দরকার।

এরা যে ঠিক তারা নয় তা আগে বলেছি; তারা এত বড় হয় না, এত অকৃপণ ভাবে শক্তি ক্ষয়ও করতে পারে না। ৩C ২৭৩-র যে ছবি তোলা হয়েছে তাতে দেখা যায় তা তারার সমষ্টি নয়, সুতরাং নীহারিকাও হতে পারে না। তার ব্যাস ছায়াপথের এক সহস্রাংশেরও কম। দেখতে অনেকটা প্রকাণ্ড এক বিস্ময়বোধক চিহ্নের মত, অথবা মনে হয় এক অতিকায় বিন্দুর থেকে একটি লেজ ছুটে বেরিয়েছে।

৩C ২৭৩ আখ্যাটির অর্থ হল যে রেডিও প্রভবের তৃতীয় কেম্‌ব্রিজ তালিকায় তা ২৭৩ নং বস্তু। রেডিও প্রভব সহস্র সহস্র জানা আছে, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কোআজ়ার শ্রেণীতে পড়ে। তবে তাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে; ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে নব্বইটি জানা ছিল, এক বছরের মধ্যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় দু শো'র বেশী।

জয়ন্ত নারলিকর (যিনি ফ্রেড হয়েলের কাছে শিক্ষানবিশি করেছেন) এক জায়গায় বলেছেন দশ কোটি তারার মধ্যে যতখানি পারমাণবিক শক্তি আছে একটি মাত্র কোআজ়ার তার জীবদ্দশায় ততখানি শক্তি ক্ষয় করে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে একের পর ত্রিশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি হয় ততগুলি হাইড্রোজেন বোমার সংযুক্ত তেজও একটি কোআজ়ার প্রতি সেকেন্ডে যতখানি তেজ বিকিরণ করে তার সমান নয়। আর একটি সূত্রে জানা যায় যে ১০,০০০ কোটি তারকা-সম্বলিত ছায়াপথের মত ৫০-১০০ নীহারিকার জ্যোতি একটি কোআজ়ারের তুল্য, অথবা বলা চলে সবচেয়ে উজ্জ্বল কোআজ়ারের প্রভা দশ লক্ষ কোটি সূর্যের সমান! তদুপরি অবশ্য আছে অপর্যাপ্ত রঞ্জন রশ্মি, অতিবেগনি রশ্মি ও রেডিও তরঙ্গের উদ্‌গিরণ। অথচ ৩C ২৭৩ প্রভবটি ছায়াপথের যে হাজার ভাগেরও ছোট তা এই মাত্র বলেছি। অন্যান্যদের মধ্যে ন্যূনতম ব্যাস পাওয়া গিয়েছে এক আলোক-বর্ষেরও কম, এবং কেন্দ্রের উজ্জ্বল 'আঁটি'র মাপ হয়তো কয়েক আলোকদিবস

মাত্র। সুতরাং কোআজ়ার তারাও নয়, নীহারিকাও নয়—একের তুলনায় বেশী বড়, অন্যের তুলনায় বেশী ছোট।

আরও একটি রহস্য এই যে কোআজ়ারদের এই ঔজ্জ্বল্য স্থির নয়, তা মাসে শতকরা দশ ভাগ পর্যন্ত বাড়ে কমে। অথচ হিসাবে দেখা যায় এত দ্রুত স্পন্দনের জন্য জ্যোতিষ্কটির ব্যাস হওয়া উচিত এক আলোকবর্ষেরও কম। কিন্তু রহস্যের শেষ এইখানেই নয়; ৩C ২৭৩ এ যাবৎ যে নক্ষত্রটি বলে জানা ছিল তার পুরনো ছবি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তা প্রতি ১৩ বছরে এক বার করে ক্ষীণ হয়েছে, আবার জ্বলে উঠেছে। এই স্ফুরণেরও কোনও কারণ পাওয়া যায় নি।

মাত্র ২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের ৩C ২৭৩ নিকটতম কোআজ়ারদের দলে পড়ে। এখন প্রতিযোগিতায় তার স্থান অনেক পিছনে। ১৯৬৬ সালে অস্ট্রেলীয় জ্যোতিষীরা এক কোআজ়ার আবিষ্কার করেন (১১১৬+১২ নং) যার দূরত্ব ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ, দ্রুতি আলোর ৮০ শতাংশেরও বেশী। পরের বছর জন বোল্‌টন যেটি পান (PKS ০২৩৭-২৩ নং) তার বেগ আলোর ৮২·৪ শতাংশ, অর্থাৎ সেকেন্ডে ১৫৩,৫০০ মাইল! এর বর্ণালীতে ভারী পদার্থ টাইটেনিয়ামের স্বাক্ষর মিলেছে, যদিও সাধারণত কোআজ়ারে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি লঘু উপাদানই পাওয়া যায়। বোল্‌টনও কাজ করেছেন অস্ট্রেলিয়ায়, কোআজ়ার ক্ষেত্রে ঐ দেশের দান অসামান্য, এবং তা সম্ভব হয়েছে পার্ক্‌স মানমন্দিরের ২১০ ফুট রেডিও দূরবিনটির সাহায্যে; ১৯৬৬ সালের মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়ায় নাকি দেড় শতাধিক কোআজ়ার আবিষ্কার হয়। ১৯৭০ সালে আরও আশ্চর্য খবর এসেছে আমেরিকা থেকে: অ্যারিজ়োনার এক গবেষণাগারে জ্যোতিষীরা একটি কোআজ়ার পেয়েছেন (৪C ০৫·৩৪), তার লাল অপসরণ এত বেশী যে মনে হয় বেগ প্রায় আলোরই কাছাকাছি। তা যদি হয় তো আমরা নৈসর্গিক দিগন্তের অর্থাৎ আবিষ্কারের সীমার কাছে পৌঁছে গিয়েছি। সুতরাং দেখা গেল উজ্জ্বলতা, রেডিও তেজ, দ্রুতি ও দূরত্ব এই সব গুণেই কোআজ়ার মহাকাশের আর সব জ্যোতিষ্ককে হার মানায়—এবং হয়তো প্রাচীনতায়ও। অবশ্য দ্রুতি, দূরত্ব ও প্রাচীনতা পরস্পর সম্পর্কিত।

১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত এক কোআজ়ার (CTA ১০২) খবরের

কাগজে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল যখন রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই কার্ডাসভ দাবি করলেন যে ঐখানে আছে এক প্রাণী কুলের বাস যারা সভ্যতা ও প্রগতির অতি উঁচু স্তরে পৌঁছেছে। তিনি বলেন তারা মহাকাশে অন্যান্য প্রাণী সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বাণী পাঠাচ্ছে, তাই আমরা দেখছি অতখানি তেজের দপদপানি। মার্টেন শ্‌মিড ও অন্যান্য পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা বললেন যে দশ লক্ষ কোটি সূর্যের তেজ বাতির মত কমানো বাড়ানো কোনও অতিসভ্য জাতির পক্ষেই সম্ভব না। তা যাই হক, মহাকাশ পেরিয়ে বিভিন্ন প্রাণী জগতের মধ্যে যোগ স্থাপন ও আলাপ সালাপের ধারণাটা এ যুগে আর একেবারে আজগুবী নয়; তা নিয়ে যে অনেক জ্যোতিষী মাথা ঘামাচ্ছেন তা আমরা দেখব এ বইয়ের শেষের দিকে।

শ্‌মিড বলেন যে পরীক্ষাগোচর বিশ্বে কোআজ়ার প্রাচীনতম বস্তু হলেও বোধ হয় তাদের আয়ু স্বল্প। হয়তো মাত্র দশ লক্ষ বছর কাল নিজেদের প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলে তারা শেষ হয়ে গিয়েছে, হয়তো তা এই প্রসারণী বিশ্বের জন্মের অল্প পরের ঘটনা যখন বিশ্বের আয়তন ছিল বর্তমানের এক তৃতীয়াংশ। তখন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে সেই আলোর যা দিয়ে আজ তাদের আমরা দেখছি—ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সূর্য ও তার গ্রহ পরিবার, যুগ যুগ পরে পৃথিবীতে ক্রমে দেখা দিয়েছে হীনতম জীবাণুর থেকে মানুষ! তার বহু আগেই অবশ্য আয়ু ফুরিয়েছে কোআজ়ারের।

বিশাল আয়তন বা প্রকাণ্ড সংখ্যা জ্যোতিষীদের কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু তাদের পর্যন্ত অবাক করেছে এই নতুন জ্যোতিষ্কের দল। শুধু অবাক নয়, মুগ্ধও করেছে। প্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ রবার্ট ওপেনহাইমার তাদের বর্ণনা করেছেন "অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিসম্পন্ন চমকপ্রদ ঘটনা" রূপে, তাঁর ভাষায় তাদের "সৌন্দর্য অবিশ্বাস্য"।

কিন্তু শুধু সৌন্দর্য আর সমৃদ্ধি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কখনও খুশী থাকেন না, তাঁরা বুঝতে চান, জানতে চান হেতু। কোআজ়ারদের ব্যাখ্যা করতে অনেক তত্ত্ব প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই খুব সন্তুষ্ট না। প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে তারা আসলে দুই ধাক্কা-খাওয়া নীহারিকা, কিন্তু এই ধারণা বেশী দিন টেঁকে নি, কারণ ঘর্ষণের ফলে তেজ যা বার হবে তা প্রকৃত

পরিমাণের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। আর কয়েকটি অনুমান : গ্যাসীয় মেঘ থেকে তারা বা নীহারিকা সৃষ্টির পথে মেঘের যে সংকোচন ঘটে তারই থেকে উৎসারিত হয় এই তেজ ; অথবা কোআজ়ার নেগেটিভ বা অপর ভর যুক্ত নীহারিকা ; অথবা তারা আঁট করে বাঁধা অতিকায় তারার সমষ্টি যার মধ্যে কোনও উত্তেজনা জনিত তরঙ্গ চলনের ফলে অতিনোভার মত বিস্ফোরণ ঘটেছে (অতিনোভা তারার এক বিস্ফোরণী দশা যার সঙ্গে পরের অধ্যায়ে আমরা পরিচয় করব) ; অথবা তারা বিশাল দানব তারা, অতিশয় দ্রুত চুপসে যাচ্ছে—ফোলা ফানুসকে হঠাৎ ফুটো করে দিলে যেমন হয়। একে বলে অন্তর্মুখী ধাবন বা বিপরীত বিস্ফোরণ।

অতিঘন, ক্ষুদ্র ও উত্তপ্ত এক কেন্দ্রকে ঘিরে কয়েক আলোকবর্ষ পুরু আয়নিত গ্যাস বা প্লাজ়মার স্তর রূপেও কোআজ়ারকে অনুমান করা হয়েছে (পরমাণু বা পরমাণুর সমষ্টি যখন পর বা অপর বিদ্যুৎধর্মী হয় তখন তাকে বলে আয়ন) ; কেন্দ্রে জ্বলছে প্রকাণ্ড এক অবপারমাণবিক চুল্লী, যেমন জ্বলে সূর্য ও অন্যান্য তারায়, সেখানেই নাকি এই অকল্পনীয় তেজের উৎপত্তি ; চুলায় তৈরি হচ্ছে অবপারমাণবিক কণা বা পরমাণুর খণ্ড, তারা স্পন্দিত প্লাজ়মার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রেডিও তরঙ্গ সৃষ্টি করছে, তা উৎসারিত হচ্ছে মহাকাশে। এই প্রকল্প গণিতের ভিত্তিতে গড়া, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও যথেষ্ট নয়।

তেমনি উপরোক্ত অন্যান্য তত্ত্বেরও আছে কোনও না কোনও বাধা। অতিনোভা তত্ত্বটি প্রস্তাব করেছিলেন ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফ্রে বার্বিজ, তাঁর ধারণা অনুসারে যেমন ইউরেনিয়াম ধাতুর পরিমাণ এক বিশেষ মাত্রা পেরিয়ে গেলে পরমাণুগুলি ভেঙে ভেঙে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, তেমনি কোনও নীহারিকা যখন তার বিবর্তনের পথে এক বিশেষ অবস্থায় পৌঁছায় তখন একের পর এক অতিনোভা বিস্ফোরণ চলে—সৃষ্টি হয় কোআজ়ার। কিন্তু এর জন্য দরকার নাভিতে শক্ত করে ঠাসা অনেকগুলি তারা যারা সহজে অতিনোভায় পরিণত হতে পারে। মুশকিল হল অতিনোভা বেশ বিরল বস্তু, ছায়াপথে হয়তো ১০০ বছরে একটারও কম তা ঘটে, সুতরাং ঐ কল্পিত অবস্থার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ।

অন্তর্মুখী ধাবন বা আকস্মিক মহাকর্ষীয় সংকোচন অভিনব ও দুঃসাহসিক

ধারণা; তার উদ্‌ভাবনা করেন কেম্‌ব্রিজের ফ্রেড হয়েল্ ও ক্যাল্‌টেক প্রতিষ্ঠানের উইলিয়াম ফাউলার। তাঁদের মত অনুসারে কোনও এক তারা যদি অত্যন্ত ভারী হয়ে পড়ে (ধরা যাক সূর্যের দশ লক্ষ থেকে দশ কোটি গুণ ভারী), তবে তার অভিকর্ষও সেই অনুপাতে বাড়ার ফলে এই অতিকায় তারা সংকুচিত হতে থাকবে; অবশেষে এক বিশেষ আয়তনে পৌঁছে অভিকর্ষের টানে সে নিজেরই উপর চুপসে যাবে, সৃষ্টি হবে এক প্রলয়ংকর নৈসর্গিক অন্তর্ধাবন।

কিন্তু এইখানেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। সবচেয়ে ভারী তারাদের ভর সূর্যের মাত্র ৬৫ গুণ। তা ছাড়া, হিসাবে দেখা যায় কোনও নক্ষত্র যখন আমাদের পরিচিত তারাদের তুলনায় বেশী বড় হয়ে পড়ে তখন তা ভেঙে যায়। উপরন্তু আপত্তির কারণ আছে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে; এই তত্ত্ব অনুসারে মহাকর্ষীয় সংকোচন যদি ঘটে তবে তা চলতে চলতে তারাটি এক সময়ে এত ঘন হয়ে পড়বে যে তার টান পেরিয়ে আলোর তরঙ্গ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না, সুতরাং অপরিমেয় আলো ও রেডিও শক্তির পরিবর্তে আমরা মহাকাশে দেখব এক অন্ধকার গহ্বর। পৃথিবীর থেকে ছাড়া পেতে ঘণ্টায় মাত্র ২৫,০০০ মাইল বেগ দরকার হয়, রকেটের দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে; পৃথিবীকে কতখানি চাপলে সেকেন্‌ডে ১৮৬,০০০ মাইল দ্রুত আলো পর্যন্ত ছাড়া পাবে না তারও হিসাব হয়েছে, দেখা যায় তাতে তার ব্যাস হয়ে পড়বে এক ইঞ্চিরও কম। সুতরাং মহাকর্ষীয় সংকোচনে তারা কি পরিমাণ ঘন হবে তা আমরা অনুমান করতে পারি।

হয়েল হার মানেন নি। তিনি বলেন আইনষ্টাইনের তত্ত্ব নিখুঁত গোলকের বেলায় খাটে, আসলে তারাটি সম্পূর্ণ সমধর্মী হবে না, সে সব দিকে সমান ভাবে চুপসাবে না, সুতরাং তেজ বেরিয়ে পড়বে।

কোআজ়ার কি তা সঠিক না জানলেও বিজ্ঞান ও দর্শনের পক্ষে তাদের গুরুত্ব যে অবিসংবাদিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ কেউ মনে করেন দূরতম কোআজ়ারদের এলাকায় মহাকাশের ধর্মই হয়তো আলাদা, সম্পূর্ণ নতুন পদার্থবিদ্যার দরকার হতে পারে তাদের বুঝতে। নিউটনের গণিত মহাকাশে অচল হয়ে পড়েছিল, আইনষ্টাইনের নতুন গণিত তার

মীমাংসা করলে ; এখন মনে হচ্ছে তারও নতুন বিচার দরকার হতে পারে। সমস্যা শুধু তাদের প্রভূত তেজ নিয়েই নয়, এ যাবৎ আবিষ্কৃত কোআজ়ারগুলি নীহারিকার মত সব দিকে সমান ভাবে ছড়ানো নয়। এক বিশেষ সমক্ষেত্রের (**plane**) কাছাকাছি তাদের অবস্থান।

সবচেয়ে বড় সমস্যা অবশ্য কোআজ়ারদের অতিরিক্ত লাল অপসরণ নিয়ে, যার থেকে তাদের গভীর দূরত্ব হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু দূর মহাকাশ ভিন্নধর্মী হলে এই অপসরণের অন্য কোনও তাৎপর্য থাকতে পারে, আর কোনও কারণে তা বাড়তে পারে। ১৯৬৫ সালে হয়েল ও বার্বিজ বলেছিলেন লাল অপসরণ সর্বদা দূরত্বজনিত নাও হতে পারে, তাঁরা বললেন হয়তো ছায়াপথ বা কাছাকাছি কোনও উৎস কোআজ়ারদের শূন্যে উৎক্ষেপ করেছে, তারই তীব্র বেগ থেকে আলো লাল হচ্ছে। এখন আরও অনেকে বিকল্প ব্যাখ্যা খুঁজতে ব্যস্ত এবং কোআজ়াররা ছায়াপথের ভিতরেই আছে এমন সম্ভাবনারও উল্লেখ হয়েছে ; তা হলে তাদের তেজ, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যা থাকবে না। কখনও বা একই কোআজ়ারের চার পাঁচটি বিভিন্ন অপসরণ দেখা যায়, যেমন PHL ৯৩৮ নম্বরের। এর থেকেও মনে হয় লাল অপসরণের তাৎপর্য বিশ্বব্যাপী এক নাও হতে পারে। ইংরেজ জ্যোতিষী অ্যাক্‌সেল ফার্সফ দূর নীহারিকাদের আলোচনায় বলে-ছিলেন তাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে যে লাল বা অল্পতেজী হয়ে পড়ছে তা তাদের পলায়নের টানে নয়, আলো তেজ হারাচ্ছে সুদীর্ঘ শূন্যপথ অতিক্রম করতে করতে। আলোকে বস্তুকণা (ফোটন) রূপেও ভাবা যায়, নক্ষত্র নীহারিকার ফাঁকে ফাঁকে যে হালকা বস্তুর কুয়াশা আছে ফার্সফ বললেন চলার পথে তাদের গায়ে ঘষে ঘষে আলো কণার তেজ কমে যাচ্ছে।

অ্যালান স্যান্ডেজের পরবর্তী আবিষ্কার উপকোআজ়ার বা শান্ত কোআজ়ার বা নীল নাক্ষত্র বস্তুও (blue stellar object) এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিজের ভাষায় এগুলি "অতি দূর, অতি উজ্জ্বল নীহারিকা এবং বিশ্ব দিগন্তের অর্ধেকের বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।" কোআজ়ারের মত তারা প্রভূত অতিবেগনি রশ্মি বিকিরণ করলেও বড় পার্থক্য এই যে তারা

রেডিও শক্তি ছড়ায় না, তা ছাড়া সংখ্যায় তারা কোআজ়ারের ৫০০ গুণ বেশী, স্যান্ডেজের অনুমান সব সুদ্ধ আছে অন্তত এক লক্ষ। এদের কতগুলি কোআজ়ারের মত বিশ্বের সীমা দেশে থাকলেও কতগুলি আছে ছায়াপথের খুবই কাছে। যেমন কোআজ়ার, তেমন নীল নাক্ষত্র বস্তুও দেখতে তারার মত, সাধারণ নীহারিকার ১০০ গুণ পর্যন্ত উজ্জ্বল, এবং দ্রুত অপসৃয়মান। এক নম্বর বস্তুটির দ্রুতি সেকেন্ডে ১২৫,০০০ মাইল।

স্যান্ডেজ বললেন নীল নাক্ষত্র বস্তু কোআজ়ারের পরবর্তী দশা, প্রায় দশ লক্ষ বছর অস্তিত্বের পর বৃদ্ধ কোআজ়ারগুলি তাদের রেডিও স্বর হারিয়ে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হয়তো এরাই পরে হয় নীহারিকা। নীহারিকাদের মধ্যে কোনও কোনওটা যে রেডিও শক্তি বিকিরণ করে তা আগে বলেছি, তাদের দেখে মনে হয় খুব বড় রকমের একটা বিক্ষোভ ঘটছে তাদের মধ্যে ; রেডিও নীহারিকাও হয়তো সাধারণ নীহারিকার বিবর্তনের পথে সংক্ষিপ্ত দশা হতে পারে।

বিশ্বের বিবর্তনে নীল নাক্ষত্র বস্তুগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। সমাবস্থা ও বিস্ফোরণী বিশ্বের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার নিষ্পত্তির পথে এক বড় সহায় হল মহাকাশে দূর জ্যোতিষ্কের ঘনতা, সুতরাং এ বিষয়ে এই বস্তুগুলি ও কোআজ়ারের থেকে হয়তো চরম প্রমাণ পাওয়া যাবে। সমাবস্থা বিশ্বে সর্বত্র এদের ঘনতা হবে সমান, বিস্ফোরণী বিশ্বে তা নয়। এ পর্যন্ত ইঙ্গিত দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকে। যে বিশ্ব অনন্ত নয় ও এক একটি বিস্ফোরণের ফলে প্রসারণ ও সংকোচনের মধ্যে দোলায়মান স্যান্ডেজ বলেন তাঁর নবলব্ধ তথ্যের সঙ্গে তার কোনও অসঙ্গতি নেই।

মহাকাশের নতুনতম আবিষ্কার পাল্‌সার (pulsar), ১৯৬৭ সালে কেম্‌ব্রিজে ইংরেজ জ্যোতিষীরা রেডিও দূরবিনে প্রথম এদের সাড়া পান। সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ যেমন কিছু ক্ষণ পর পর অন্ধকারে আলোর স্রোত পাঠায় তেমনি এরাও থেমে থেমে মহাকাশে পাঠাচ্ছে রেডিও সংকেত। এই খবরে সারা জগৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, হয়তো এ বার পৃথিবীর বাইরে মানুষেরই মত বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ পাওয়া গেল যারা রেডিওর ভাষায় পাঠাচ্ছে তাদের বাণী ; বিজ্ঞানীরাও অনেকে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিলেন না, পাল্‌সার আবিষ্কর্তারা

যে এই কল্পিত প্রাণীর নাম দিলেন 'সবুজ রঙের বামন জাতি' তা সর্বাংশে কৌতুকজনিত নয়।

বছর শেষ হতে না হতে পৃথিবীর নানা মানমন্দিরে গোটা পঁচিশ পাল্‌সার ধরা পড়ল এবং অবিলম্বে বোঝা গেল যে সম্ভাবনাটা ক্ষীণ, কারণ এই সংকেত পাঠাবার মত শক্তির কৃত্রিম সৃষ্টি প্রায় কল্পনাতীত। পাল্‌সারদের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হয়, এখন যা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত তার স্রষ্টা টমাস গোল্ড; এই প্রকল্প অনুসারে তারা এক শ্রেণীর নক্ষত্র যার নাম নিউট্রন তারা, জন্ম অতিনোভা বিস্ফোরণ থেকে। গোল্ড এও বললেন যে মহাজাগতিক রশ্মির উদ্ভব হয়তো পাল্‌সার থেকেই; এই রশ্মি মহাকাশ থেকে আমাদের উপর ঝরছে, কিন্তু তার উৎস কোথায় তা এক রহস্য। এই বিকিরণে প্রধানত আছে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ নিঃসঙ্গ এক প্রোটন, যদিও আরও ভারী পদার্থের নিউক্লিয়াসও পাওয়া যায়। নিউট্রন তারা ও পাল্‌সারের সঙ্গে বিশদ পরিচয় হবে পরবর্তী অধ্যায়ের শেষে। ১৯৭২ সালের শেষাশেষি সব সুদ্ধ ষাটটি পাল্‌সার আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি ধরা পড়েছে ভারতে, উটির রেডিও দূরবিনে।

৬। নক্ষত্র জগৎ

রাত্রির আকাশে অসংখ্য তারার দিকে তাকিয়ে কে চিনতে পারে তাদের প্রকৃত রূপ? সেখানে তারা আর গ্রহের একই চেহারা—সেই কারণে প্রাচীন কালে গ্রহদের ভুল করা হয়েছিল তারা বলে—কিন্তু দূরবিনে লক্ষ করলে মুহূর্তে ধরা পড়ে তাদের পার্থক্য। তখন গ্রহগুলির দেহ বহু গুণ বর্ধিত হয়ে সরে আসে কাছে, তারারা যেমন ছিল তেমনি থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যদি ধরে নিই যে আমাদের আবরণী বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং নিকটবর্তী আকাশ সম্পূর্ণ বস্তুহীন তা হলেও প্রকাণ্ড ২০০ ইঞ্চি দূরবিন দিয়ে কাছের তারাদের ব্যাস বাড়বে মাত্র ০·০০০৪ ইঞ্চি পর্যন্ত। তবু এই দূর জ্যোতিষ্কগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজ সামান্য নয়, সব মিলিয়ে প্রতিবেশী সূর্য সম্বন্ধে যা জানা আছে তার চেয়ে তা বেশীই হবে।

আমরা জানি এই শান্ত শীতল আলোকবিন্দুগুলি শান্তও নয় শীতলও নয়। মহাকাশের গ্যাসকে মহাকর্ষীয় টান তাল পাকিয়ে তৈরি করেছে জ্বলন্ত পারমাণবিক চুল্লী, এই বিরাট অগ্নিপিণ্ডে পরমাণুর ভাঙা গড়া থেকে যে পরিমাণ তাপ ও তেজ সৃষ্টি হচ্ছে তা আমরা পৃথিবীতে কল্পনাও করতে পারি না। বেশী উত্তপ্ত তারাগুলির গায়ের মাত্র এক ডাকটিকিট পরিমাণ অংশ থেকে যে তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে তা দিয়ে নাকি অতলান্তিক মহাসাগরের সব জাহাজগুলিতে চালানো চলে।

তেজের মাত্রা ভেদ এবং দূরত্ব অনুসারে অবশ্য কেউ বেশী কেউ কম উজ্জ্বল মনে হয়, কিন্তু তা ছাড়া ঐ ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য আমরা দেখতে পাই না। অথচ এই দূরবিন ও বর্ণালী যন্ত্রের যুগে আজ তাদের মধ্যে অনেক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। খালি চোখে বড় জোর হাজার সাতেক তারা দেখা যায়, তার সবই অবশ্য ছায়াপথ নীহারিকায়; যন্ত্রের সাহায্যে দশ লক্ষেরও বেশী তারার অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য

নির্ণীত হয়েছে। এরা কেউ ছোট কেউ বড়, কেউ কাছে, কেউ দূরে, কারও তেজ অন্যের বহু গুণ বেশী, কেউ একলা চলেছে শূন্য পথে, কারও বা দুই তিন কি তারও বেশী সঙ্গী, কেউ সদ্যোজাত, কেউ মুমূর্ষু। স্বভাব অনুযায়ী তাদের আবার নানা রকম নামও দেওয়া হয়েছে, যেমন লাল দানব (red giant), শ্বেত বামন (white dwarf) অথবা অস্থিরদ্যুতি (variable)।

আয়তন অনুসারে রঙের পরিবর্তনও প্রায়ই দেখা যায়—লাল, নীল, সাদা ইত্যাদি। কোনও বস্তুকে গরম করতে থাকলে যেমন তা আগে লাল হয়ে পরে নীল হয়, সেই রকম লাল তারাও অবশ্য নীলের চেয়ে বেশী শীতল। লাল দানব অতিকায়, নীল তারা ক্ষুদ্রতর, তার পর আরও ছোট হলে তারা আবার লাল হয়ে ওঠে—তখন তাকে বলা হয় বামন; এই দানব আর বামনের আকৃতির পার্থক্য গাড়ির চাকা আর এক কণা বালির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ক্ষুদ্রতম লাল বামন সৌর লোকের প্রকাণ্ড গ্রহ বৃহস্পতি বা শনির সমান, অর্থাৎ সূর্যের হাজার ভাগের এক ভাগ, অথবা পৃথিবীর হাজার গুণ। কিন্তু শ্বেত বামন এরও ছোট, প্রায় বুধ গ্রহের সমান, তাপ ১০,০০০ ডিগ্রি বা তারও বেশী, তবু তারা অতি ক্ষীণ কারণ তাদের গা এত ছোট যে বিকীর্ণ জ্যোতির মোট পরিমাণ অতি সামান্য। ১৯৬৬ সালে জানা যায় ২০০ ইঞ্চি দূরবিনে দুটি খুদে তারা (গাঢ় নীল ও গাঢ় লাল) ধরা পড়েছে। এই তারা সম্ভবত চাঁদের চেয়েও ছোট, যদিও ভর বা বস্তু হয়তো সূর্যের সমান, সুতরাং প্রতি সিসি-র (লিটারের এক সহস্রাংশ) ভার হাজার টনের কাছাকাছি। আরও ছোট ও ঘন নিউট্রন তারার কথা হবে পরে।

দূরত্বের কথা বিবেচনা করলে দেখি যেখানে আমাদের নিকটতম তারা সূর্যের আলো এসে পৌঁছাতে লাগে মাত্র আট মিনিট, সেখানে ঠিক পরবর্তী প্রতিবেশীর আলোক দূত সময় নেয় ৪.৩ বছর; এর নাম আল্‌ফা সেন্‌টরাই। (প্রক্‌সিমা সেন্‌টরাই নামে এর এক অস্পষ্ট সঙ্গী আছে, সে আমাদের আরও একটু কাছে হতে পারে।) মাইল হিসাবে পৃথিবীর থেকে সূর্য আর আল্‌ফা সেন্‌টরাইর দূরত্ব যথাক্রমে ৯·৩ কোটি ও ২৬ লক্ষ কোটি। আমাদের নিকটতম তারাগুলি নিকটতম গ্রহের তুলনায় দশ লক্ষ গুণ দূরে। আর দূরতম তারাগুলি অবশ্য আছে দূরতম নীহারিকায় যা হয়তো কোনও দিনই পরীক্ষায় ধরা দেবে না।

আকাশে অসংখ্য তারা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে, তা দেখলে তারাদের এই পারস্পরিক দূরত্ব কল্পনা করা যায় না, অনুমান হয় না যে নক্ষত্র লোক অধিকাংশে শূন্য। উপমা হল খাঁচায় বন্ধ অন্ধ মৌমাছি; তারার প্রতীক মৌমাছির সংখ্যা চার, আর তাদের ক্ষেত্র খাঁচার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সবই ১০০০ মাইল। এর থেকে বোঝা যাবে আকাশের ঐ 'ভিড় করা' তারাদের মধ্যে কেন ঠোকাঠুকি হয় না। তবু মাত্র বছর ত্রিশেক আগে জেম্‌স জীন্‌স এবং অধিকাংশ জ্যোতিষীর ধারণা ছিল যে এই রকম দুঃসম্ভব ঘটনার থেকেই পৃথিবীর মত গ্রহদের উৎপত্তি; সম্ভাব্যতা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েও তাঁর হিসাবে লাখে একটির বেশী তারা গ্রহযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু পরে গ্রহদের আলোচনায় আমরা দেখব যে এই ধারণা আজ সম্পূর্ণ বর্জিত, এ দিক দিয়েও সূর্য লোকের অধিবাসী আমরা কোনও অসাধারণত্ব দাবি করতে পারি না।

আকাশের সব অংশে বিশেষ বিশেষ তারামণ্ডলের বা নক্ষত্র রাশির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, কখনও বা তাদের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে। কিন্তু এক দলের তারারা যে সর্বদা কাছাকাছি আছে তা নয়, অনেক সময়ে একই দিকে আছে বলে মনে হয় কাছাকাছি, আসলে একটি হয়তো আর একটির অনেক পিছনে। এই মণ্ডলীয় নামগুলির সার্থকতা এই যে তাতে আকাশ পর্যবেক্ষণ ও তারার তালিকা সৃষ্টির সুবিধা হয়, যদিও দলীয় চেহারা চির কাল এক রকম থাকে না; তার কারণ তারারা স্থির নয়।

তারাদের গতি নানা রকম—কোনোটা আপাত কোনোটা প্রকৃত। তারা যে রাত্রির আকাশে পুব থেকে পশ্চিমে যায় তা আসলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বা ঘূর্ণি বেগের ফল, ঠিক যেমন সূর্য চলে দিনের আকাশে। এই মিছিলের মধ্যে শুধু ধ্রুবতারা সম্পূর্ণ স্থির, কারণ সে আছে উত্তর মেরুর ঠিক মাথায়, উত্তর দক্ষিণ অক্ষ ঘিরে পৃথিবীর আবর্তনে তার আপাত অবস্থানের কোনও পরিবর্তন নেই। দুঃখের বিষয় দক্ষিণ গোলার্ধে (hemisphere) এমন কোনও ধ্রুবতারা নেই যার সাহায্যে সেই অঞ্চলে রাত্রি কালের নাবিক তার দিক নির্ণয় করতে পারে।

সূর্যের চার দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণের ফলেও নক্ষত্র লোকে আর এক রকম আপাত গতি দেখা যায়। বৈশাখের আকাশ আর কার্তিকের আকাশ ঠিক এক নয়, তার কারণ পৃথিবী তার কক্ষ পথের উলটো দিকে ১৮৬০ মাইল সরে এসেছে। মহাকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এই দূরত্ব অতি নগণ্য, তাই এর ফলে তারাদের আপেক্ষিক অবস্থানের যে সামান্য পরিবর্তন ঘটে তা বহু কাল (১৮৩৮ সাল পর্যন্ত) ধরা পড়ে নি।

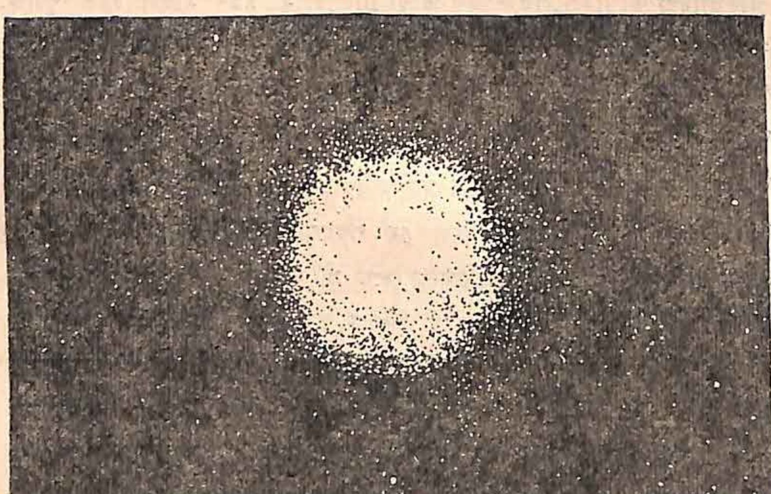
এই ধরনের স্থানান্তর মাপজোকের ব্যাপারে গুরুতর হলেও আসলে তা ছদ্ম গতি। প্রকৃত গতির মধ্যে গ্রহদের মত স্বাবর্তন ও প্রদক্ষিণ দুইই দেখা যায়। স্বাবর্তন বা ঘুর্ণি ধরা পড়েছে তারার প্রান্ত দেশের বর্ণালী পরীক্ষা করে, দেখা গিয়েছে তা স্থির নয়; লাল অপসরণ নির্দেশ দেয় যেমন এক প্রান্ত সরে যাচ্ছে তেমন এগিয়ে আসছে বিপরীত প্রান্ত; প্লাইয়াদিজ় তারামণ্ডলের উজ্জ্বল তারা প্লাইয়োনি ১৯০ মাইল দ্রুত ঘুরছে, ফলে তার কটি দেশ ঘিরে হাইড্রোজেন নিক্ষিপ্ত হচ্ছে শূন্যে—তারার প্রখর অতিবেগনি রশ্মিতে এই গ্যাসীয় বলয়কে জ্বলতে দেখা যায়। ছোট তারা আরও ধীরে ঘোরে, নিরক্ষ রেখার দ্রুতি হয়তো মাত্র এক দুই মাইল; অনেকের ধারণা তাদের আছে গ্রহ পরিবার, তারা প্রয়োগ করছে বিপরীত মহাকর্ষীয় টান। আর তারারা যে পরস্পরকে ঘিরে ঘুরতে পারে তা একটু পরে যুগ্ম তারার আলোচনায় দেখা যাবে।

এ ছাড়া সম্পূর্ণ নীহারিকার চক্র গতির সঙ্গে নাভিকে ঘিরে বাইরের তারাগুলি যে ঘোরে তা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু সূর্যের সমান্তরাল এই গতি ছাড়াও নীহারিকার কোটি কোটি তারা নিজস্ব আঁকাবাঁকা তেরছা কক্ষ পথে চাকার দুই পাশে ছুটোছুটি করে, সেকেন্ডে ৫০-২০০ মাইল বেগে; এই বেগ এমন কিছু বেশী নয়, কিন্তু গতি পাশের দিকে বলে আমাদের চোখে তা বেশী ঠেকে।

সূর্য ও পৃথিবীর দৃষ্টিতে এই গতিই আকাশে তারাদের আপেক্ষিক স্থান পরিবর্তন ঘটায়, কালে কালে তারামণ্ডলের চেহারা বদলায়, যেমন দেখা যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলে (Great Bear)। এই দলে যে সাতটি তারা আছে তার মাঝের পাঁচটি জোট পাকিয়ে একই দিকে চলে সমান দ্রুত, কিন্তু দুই মাথার দুটি তারা মনে হয় পৃথিবীর আরও কাছে, তাদের গতি

আরও দ্রুত, তার দিকও আলাদা ; সুতরাং সপ্তর্ষিমণ্ডলের এই পরিচিত চেহারা বরাবর এই রকম থাকে নি, ভবিষ্যতেও থাকবে না, আর মাত্র লক্ষ বছরেই তা অনেকটা বদলে যাবে। তা হলে, স্থির তারারা আসলে অস্থির, পৃথিবীর দৃষ্টিতে তাদের দ্রুতি অাত ধীর বলে স্থির মনে হয়।

এই ধরনের নক্ষত্র রাশি সর্বদা কাছাকাছি তারার সংহত গোষ্ঠী না হলেও তেমন দলও দেখা যায়। আমাদের নীহারিকাকে ঘিরে তারা ও তারা পুঞ্জের এক গোলাকার মণ্ডল আছে, তার অনেক তারাই লাল ও প্রাচীন, বয়স হয়তো ৫০০ কোটি বছর। এই পুঞ্জগুলিকে প্রায় ছোট খাটো নীহারিকা বলা চলে, প্রত্যেকের মধ্যে আঁট করে ঠাসা বহু সহস্র উজ্জ্বল তারা। চেহারা অনুযায়ী এদের নাম দেওয়া হয়েছে গোল পুঞ্জ (globular cluster)।



৪নং চিত্র

উজ্জ্বলতম তারা পুঞ্জ ওমেগা

১৯৬৫ সালের এক খবরে জানা যায় যে স্কটল্যান্ডের জ্যোতিষারা আকাশের সিগ্‌নাস অংশে ৩০০০ তারার এক পুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন যার ব্যাস ১০০ আলোকবর্ষ। এত বড় পুঞ্জ নাকি ইতিপূর্বে কেবল পাওয়া গিয়েছে আরও দূরে প্রবীণ তারাদের মধ্যে, যার থেকে ধরে নেওয়া

হয়েছিল যে এই ধরনের সমষ্টি তৈরি হয়েছে শুধু অতি প্রাচীন কালে। এই নব-আবিষ্কৃত পুঞ্জের বিশেষত্ব এই যে এর তারাগুলি নতুন ও তরুণ। এর ফলে তারার জন্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার অদল বদল হতে পারে।

আরও এক রকম তারকা পুঞ্জ দেখা যায় ছায়াপথের বাহুগুলির ভিতরে বা ফাঁকে ফাঁকে, এগুলি অনেক ছোট—মাত্র কয়েক শো তারার সমষ্টি; তাও এত ঢিলে যে নীহারিকা চক্রের একটি দুটি পাকেই তারা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে। এদের বলা চলে কুণ্ডলী পুঞ্জ (galactic cluster)। কোনও কোনওটার বয়স মাত্র দশ লক্ষ বছর, কারও আবার ৫০০ কোটি বছর। অনেকগুলিকেই খালি চোখে ধরা যায়।

সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বস্তুত নিঃসঙ্গ তারাই প্রকৃতির ব্যতিক্রম, চারটির মধ্যে তিনটিরই নিকট সঙ্গী আছে আকাশ পথে। যারা একলা নয় তাদের তিন ভাগের এক ভাগ একটি করে জুড়ি পেয়েছে, এদের বলা হয় যুগ্ম তারা (binary অথবা double star); বাকি দুই ভাগের আছে দুই বা তারও বেশী সঙ্গী। উপরোক্ত পুঞ্জগুলি যদি হয় তারার সমাজ তো এই ক্ষুদ্রতর সমষ্টিগুলি পরিবার। সেই অনুপাতে ঘনিষ্ঠতাও বেশী, কেউ কেউ প্রায় গায়ে গায়ে ঠেকে আছে। একটু আগে বলেছি এরা পরস্পরকে ঘিরে ঘোরে, আসলে বলা উচিত অন্তবর্তী এক বিন্দুকে ঘিরে ঘোরে; বিন্দুর স্থানটি নির্ধারিত হয় মহাকর্ষের নিয়মে, অর্থাৎ কার কতখানি ভর বা বস্তু তা দিয়ে। সুতরাং এদের আমরা মহাকর্ষের টানে বাঁধা নাচের সঙ্গী বলেও কল্পনা করতে পারি।

এই সঙ্গীদের চেহারায় কিন্তু প্রায়ই অনেকখানি তারতম্য। ক্ষুদ্র লাল তারা হয়তো নাচছে অতিদানবের (supergiant) সঙ্গে, অথবা সূর্যের মত সাধারণ এক হলদে তারা পাক খাচ্ছে এক শ্বেত বামনের সঙ্গে—প্রায় সব রকম বিভিন্ন দলের মধ্যেই যোগাযোগ হয়ে যেতে পারে। তবু এক পরিবারের তারাদের একই গ্যাসীয় মেঘ থেকে জন্ম এই রকমই জ্যোতিষীদের ধারণা। যার যতখানি বস্তু তার সেই অনুসারে বিবর্তন ঘটেছে, কখনও হয়তো কোনও ভারী তারা বুড়ো হতে হতে কিছু বস্তু ত্যাগ করে হয়ে পড়েছে শ্বেত বামন। আবার ঠিক এই ভাবেই নিঃসঙ্গ ভারী তারা নিজেরই ভারে এক বার কি কয়েক বার দ্বিভক্ত

হয়ে সঙ্গী সৃষ্টি করতে পারে।

বেশী কাছাকাছি বলে একই পরিবারের তারারা বহু কাল একটি তারা বলেই গণ্য হয়েছিল। কোনও কোনও যুগ্ম তারা এত ঘনিষ্ঠ যে এরা দুই ঘণ্টারও কমে পরস্পরের বহু লক্ষ মাইল ব্যাপী নিরক্ষ রেখা পরিক্রম করে, কারও কারও মধ্যে তারা-বস্তুর আদান প্রদান হয় প্রকাণ্ড গ্যাস তরঙ্গের মাথায় মাথায়। সঙ্গী তারাদের পৃথকীকরণের কাজে দূরবিন ছাড়াও বর্ণালী যন্ত্র অনেকখানি সাহায্য করেছে। কোনও কোনও সঙ্গীকে দেখাই যায় না, বৃহত্তর তারার গতির উপর তাদের মহাকর্ষীয় প্রভাব লক্ষ করে অনুমান করা হয়েছে মাত্র। কে জানে, এই ক্ষুদ্র অদৃশ্য জ্যোতিষ্কদের কোনও কোনওটা হয়তো তারাই নয়, গ্রহ!

যাই হোক, ক্রমে দেখা গেল অধিকাংশ তারাই নিঃসঙ্গ নয়, দেখা গেল লুব্ধক দ্বয়ী, আল্‌ফা সেন্‌টরাই ত্রয়ী, ক্যাস্‌টর ছয় সঙ্গীযুক্ত। এই ছয়টির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা দুটি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে একই মহাকর্ষীয় আবর্তের অংশীদার বলে, ১৮০৩ সালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল এদের অনুশীলন করেন। আর যে তারাদের শুধু গতি লক্ষ করে সঙ্গী কল্পিত হয়েছে তাদের মধ্যে লুব্ধক প্রথম। এই তারাটি আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল, কিন্তু তার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রকৃসিমা এবং আল্‌ফা সেন্‌টরাইর পরেই সে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, দূরত্ব মোটে ৮·৭ আলোকবর্ষ। প্রায় ১০০ বছর আগে জারমেনির জ্যোতিষী বেসেল লক্ষ করেন যে লুব্ধক যেন ক্ষুদ্র এক বৃত্ত পরিক্রম করছে, কিন্তু যাকে ঘিরে এই ঘটনা সেই ক্ষুদ্র সঙ্গী ধরা পড়ে প্রায় ২০ বছর পরে আমেরিকায়; ক্লার্ক নামে এক দূরবিন প্রস্তুতকারক তাঁর ছেলের সঙ্গে ১৮ ইঞ্চির এক দূরবিন পরীক্ষা করছিলেন, ছেলে লুব্ধককে তাক করে হঠাৎ এই শ্বেত বামনটিকে দেখতে পায়। পৃথিবীর চেয়ে তা মাত্র তিন চার গুণ বড়, কিন্তু ১০,০০০ গুণ ভারী; লুব্ধকের ভর তার মাত্র আড়াই গুণ বেশী, সুতরাং তার গতিবিধির উপর এই বামনের প্রভাব কম নয়। এই মহাকর্ষীয় প্রভাবই বেসেল নজর করেছিলেন, যদিও ১০,০০০ গুণ উজ্জ্বল লুব্ধকের প্রভায় তার ক্ষুদ্র সঙ্গীকে খুঁজে পান নি।

সূর্যের ১৬ আলোকবর্ষের মধ্যে আছে পঞ্চাশটি তারা। আটাশটি নিঃসঙ্গ, আটটি দ্বয়ী, আর দুটি ত্রয়ী। এ ছাড়া আছে পাঁচ অদৃশ্য সঙ্গী—

তারা হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারকা নয়তো গ্রহ—বৃহৎ সঙ্গীদের কক্ষ পথে এরা যে বিভ্রম ঘটায় শুধু তার থেকে এদের ধরা গিয়েছে।

যুগ্ম বা বহুসঙ্গী তারার (multiple star) যৌথ উজ্জ্বলতায় তারতম্য হতে পারে এক অন্যকে আড়াল করলে। অবশ্য এ ভাবে দীপ্তির ব্যাঘাত ঘটাতে হলে তাদের বেশ কাছাকাছি থাকা দরকার, এবং সে রকম যুগ্ম তারার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উজ্জ্বলতা সবচেয়ে বাড়বে যখন দুই সঙ্গীই সম্পূর্ণ দৃশ্যমান, অর্থাৎ পাশাপাশি; সামনে পিছনে হলে দ্যুতি কমবে। প্রায়ই দেখা যায় ছোট কিন্তু উজ্জ্বলতর তারার বড় কিন্তু নিষ্প্রভ সঙ্গী, তখন ছোট পিছনে গেলে যৌথ দীপ্তি সবচেয়ে কমে যায়, বড় পিছনে গেলে তা আর একটু বাড়ে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনেক আরব্য শব্দ আছে তা আগে বলেছি, আরবীরা এক তারার নাম দিয়েছিল অ্যাল্‌গল, অর্থাৎ শয়তান বা রাক্ষস, তার কারণ প্রতি দুই দিন ২১ ঘণ্টায় তার দ্যুতি কমে যায় এক তৃতীয়াংশে। আজ আমরা জানি সে যুগ্ম তারা, জুড়ি এসে আড়াল করে তাকে।

এই আড়াল করাকে গ্রহণ বলা যেতে পারে, সুতরাং যে সব জুড়ি তারার দীপ্তি এই কারণে বাড়ে কমে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে গ্রহণী অস্থিরদ্যুতি (eclipsing variable)। কিন্তু আভ্যন্তর কারণেও ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয় কোনও কোনও তারার, এরা হল প্রকৃত অস্থিরদ্যুতি (intrinsic variable)। ভিতরে অবপারমাণবিক প্রক্রিয়ার জোয়ার ভাঁটা বাইরে প্রতিফলিত হয় প্রভার নিয়মিত স্পন্দনে। কারও কারও দেহের আয়তনও বাড়ে কমে। এই অস্থিরদ্যুতি তারাদের আর এক নাম সিফাইড (সিফিউস থেকে বিশেষণ)। এদের স্পন্দন কাল অপরিবর্তনীয়, উপরন্তু তার সঙ্গে উজ্জ্বলতারও এক সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে; যার দ্যুতি ৩০ দিনে বাড়ে কমে সে সূর্যের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ উজ্জ্বল, যার কাল আর দীর্ঘ তার উজ্জ্বলতা আরও বেশী।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন তারার দূরত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হয়েছে, কি করে এই দূরত্ব মাপা হয় তাও জানা দরকার। সবচেয়ে সহজ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে লম্বনের পরিমাপ, অর্থাৎ আরও পিছনের তারার তুলনায় লক্ষ্য

বস্তুটি সারা বছরে আকাশের গায়ে কতখানি সরে যাচ্ছে তা মাপা। এই পদ্ধতির অসুবিধা হল খুব বেশী দূরে তা কাজে লাগে না, সীমা বড় জোড় ৪০০ আলোকবর্ষ ; ৩০ আলোকবর্ষ দূরেই এর সূক্ষ্মতা শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়, এবং ঐ পরিধির মধ্যে তারার সংখ্যা মোটে ১৭০।

সৌভাগ্যবশত সিফাইড তারার আবিষ্কারের পরে আর একটি উপায় পাওয়া গেল যাতে দূরত্বের বাধা নেই। পৃথিবীর থেকে আমরা তারার যে উজ্জ্বলতা দেখছি তা নির্ধারণ করে দূরত্ব এবং স্বকীয় বা নিহিত দ্যুতি (intrinsic brightness)। লুব্ধকের পরেই আকাশের উজ্জ্বলতম তারা দক্ষিণ গোলার্ধের অগস্ত্য (Canopus), কিন্তু এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৮·৭ ও ৩০০ আলোকবর্ষ, বলা বাহুল্য এর মধ্যে আরও অনেক তারা আছে। মোম বাতি আর বৈদ্যুতিক বাতিকে কাছে দূরে এমন ভাবে সাজানো যায় যে মনে হবে মোম বাতি বেশী উজ্জ্বল, সুতরাং দূরত্ব মাপতে সমস্যা হল স্বকীয় দ্যুতি জানা। কিন্তু সিফাইডদের বেলায় তাদের স্পন্দন কাল থেকে যে স্বকীয় দ্যুতি জানা সম্ভব তা একটু আগেই বলেছি ; এই দ্যুতির তুলনা করে দূরত্ব হিসাব করা গেল শতকরা ৯০ ভাগ কাছাকাছি। ৩০০০ আলোকবর্ষ দূরে নিকটতম সিফাইড ধ্রুবতারা আর ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অ্যানড্রমিডা নীহারিকার সিফাইডদের দূরত্ব সমান সূক্ষ্ম ভাবে মাপা সম্ভব এই পদ্ধতি অনুসারে। সিফাইডদের থেকে তাদের পুঞ্জ বা নীহারিকার দূরত্বও আন্দাজ করা যায়।

সিফাইড ছাড়া অন্যান্য তারা যথা নীল ও লাল দানবদের বর্ণালীর শ্রেণী বিচার করেও স্বকীয় দ্যুতি জানা সম্ভব, তার থেকে আগের মত দূরত্ব হিসাব করা চলে। নীহারিকার দূরত্ব নির্ধারণে তার দ্রুতি অর্থাৎ লাল অপসরণের ব্যবহার আগে দেখেছি, তারার দূরত্ব মাপতে বা তার যথার্থতা পরীক্ষা করতেও এই পদ্ধতি কাজে লাগে।

এইখানে আর একটা কথা বলা দরকার। আপাত ও নিহিত দ্যুতি যদিও এক নয়, তবু অনেক শ্রেণীর তারার মধ্যে দূরত্বের সঙ্গে উজ্জ্বলতার এক সহজ সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে 'যত উজ্জ্বল তত কাছে, যত ক্ষীণ তত দূরে' এই নিয়ম খাটে। খুব দূর তারাদের দূরত্বের তারতম্যে পৃথিবীর চোখে বিশেষ কিছু প্রভেদ

ঘটে না, তাদের আপেক্ষিক উজ্জ্বলতা সমানই থাকে; অপেক্ষাকৃত নিকট তারাদের বেলায় তা নয়।

উজ্জ্বলতার নানা মান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রথম মানের তারা, ষষ্ঠ মানের তারা পর্যন্ত খুব পরিষ্কার রাতে খালি চোখে যায়। প্রথম মান ষষ্ঠ মানের ১০০ গুণ উজ্জ্বল। আমাদের সূর্যের মান পাঁচ, নিকটতম প্রতিবেশী তারারা তার এক লক্ষ গুণ পর্যন্ত উজ্জ্বল। প্রথম মানের তারার পাশে সূর্যকে দেখাবে যেন সার্চলাইটের পাশে জোনাকি!

উজ্জ্বলতার মত তাপও সহজেই মাপা যায়, কিন্তু তারার ভর বা বস্তু পরিমাণ নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অথচ তা খুবই জরুরি কারণ তার উপরে তারার সব গুরুতর ধর্মগুলি, এমন কি তার জীবনেতিহাস নির্ভর করে। ভর জানলে তার জ্বলার ধরন দেখে জ্যোতিষীরা তার বয়স অনুমান করতে পারেন, আরও কত কাল জ্বলার পর তার স্বভাবের কি কি পরিবর্তন ঘটবে তাও হিসাব করা চলে। ভর সহজে মাপা যায় এক মাত্র যুগ্ম তারাদের মধ্যে—তাদের প্রদক্ষিণ কাল ও পারস্পরিক দূরত্ব থেকে, নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রগুলি প্রয়োগ করে। কিন্তু দলে দুইয়ের বেশী তারা থাকলে তাদের গতি এত জটিল হয়ে পড়ে যে আধুনিক গণিতের সাহায্যেও ভর নির্ণয় করা কঠিন। সৌভাগ্যবশত যুগল তারার সংখ্যা কম নয়, সুতরাং তাদের থেকে ভর সম্বন্ধে এবং তার থেকে আবার অন্যান্য বিষয়ে অনেক কিছু জানা গিয়েছে। যথা, গ্রেট ডগ তারামণ্ডলে UW নামক এক যুগ্ম তারা আছে যে সব সুদ্ধ সূর্যের ৩৬ গুণ ভারী ও ১০,০০০ গুণ উজ্জ্বল, তার থেকে জানা গেল এই দুইয়ের আয়ু আর মাত্র তিন লক্ষ বছর—মহাকালের এই ক্ষুদ্র মুহূর্তটুকু জ্বলেই তারা শেষ হয়ে যাবে। ৬০ সূর্যের বেশী ভারী তারা কদাচ দেখা যায়, ৯০ সূর্যের বেশী কখনও নয়।

ছায়াপথের তারাদের স্বভাব অনুযায়ী তাদের দুই দলে ভাগ করা হয়েছে—সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণের দল অবশ্য ভারী, তাদের ব্যবহার ও জ্বলন হিসাবসঙ্গত। যেগুলির বস্তু বেশী সেগুলিতে অতিরিক্ত চাপে কেন্দ্র স্থলে পারমাণবিক হাইড্রোজেন বেশী ঘন করে ঠাসা, ফলে এই ইন্ধন বেশী দ্রুত জ্বলে এবং বেশী তেজ উৎপন্ন করে—তারা হয় উজ্জ্বল, নীল

ও উত্তপ্ত। এর বিপরীত দিকে হালকা তারা হবে লাল ও শীতল, আরও তেজে জ্বলবার মত বড় নয় তারা ; আর দুইয়ের মাঝখানে আছে নাতিউষ্ণ হলদে তারা। রং ও তাপের এই সম্পর্ক ও অনুক্রম অনেক দিন ধরে জানা ছিল এবং বর্ণালী অনুসারে সাতটি ভাগও সৃষ্টি হয়েছে—O, B, A, F, G, K, M। O তারা তপ্ত ও নীল, বাইরের তাপ ৫০,০০০-২৫,০০০ ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড, তাদের অধিকাংশ তেজ বিকীর্ণ হয় অদৃশ্য অতিবেগনি রশ্মি রূপে। M তারা হালকা ও নিষ্প্রভ, লাল ও শীতল ; তাও ৩৩০০-১৬০০ ডিগ্রি, অধিকাংশ তেজ নির্গত অদৃশ্য অবলোহিত তাপ রশ্মি রূপে। সূর্য G তারা, ওজন মাঝামাঝি, রং হলুদ, তাপ ৫৫০০-৪৯০০ ডিগ্রি, তার অধিকাংশ তেজ দৃশ্যগোচর আলো। সাধারণদের এই শ্রেণী বিভাগকে বলা হয় প্রধান অনুক্রম (main sequence)।

এক দিকে ভর ও অন্য দিকে তাপ ও রঙের এই সুন্দর সম্পর্ক, তাতে বিজ্ঞানীরা খুশী হলেও কতকগুলি বেয়াড়া তারা থেকে গেল প্রধান অনুক্রমের বাইরে। এই অসাধারণ বা অস্বভাবী তারাদের অধিকাংশের উজ্জ্বলতা রঙের তুলনায় অতিরিক্ত বেশী। এক দিকে কতগুলি নীল অতিদানব, যথা কালপুরুষ (Orion) তারামণ্ডলের রাইগ্‌ল ; ৮০০ আলোকবর্ষ দূরে থেকেও উজ্জ্বলতম তারাদের মধ্যে এর স্থান সপ্তম, কারণ সূর্যের ৪০,০০০ গুণ তেজ সে বিকিরণ করছে। বর্ণালীর অন্য দিকে আছে এই তারামণ্ডলেরই লাল অতিদানব বেট্‌ল্‌গুজ়, উজ্জ্বলতায় নবম। এদের মাঝামাঝি আছে অতিরিক্ত উজ্জ্বল সাদা, হলুদ ও কমলা রঙের দানব ও অতিদানব, এবং তা ছাড়া এক দল স্পন্দিত এবং বিস্ফোরণী তারা—হলুদ ও কমলা রঙের দীপ্ত সিফাইড, অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল কম্পিত RR লাইরি তারা এবং দশ লক্ষ সূর্যের সমপ্রভ নীলাভ বিস্ফোরণী তারা অতিনোভা।

অতিউজ্জ্বল দলছাড়া তারার প্রকৃতি যে কেমন অদ্ভুত হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বেট্‌ল্‌গুজ়। সে জাতিতে M, গায়ের তাপ সূর্যের অর্ধেক, সেখান থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে লালাভ আলো। সাধারণ M তারাদের ব্যাস তার এক দশমাংশ, তারা সূর্যের ১০০০ গুণ নিষ্প্রভ। কিন্তু বেট্‌ল্‌গুজ়ের ব্যাস ৫০০ সূর্যের সমান (সূর্যের জায়গায় বসালে সে

মঙ্গল গ্রহকে পর্যন্ত গ্রাস করবে), দীপ্তি ১৭,০০০ সূর্যের সমান। অর্থাৎ সাধারণ লাল তারার তুলনায় অসাধারণ দানব ও অতিদানবদের জ্যোতি অনেক বেশী, দেহ অনেক বড়।

কিন্তু বেয়াড়া তারাদের মধ্যে সবই অতিউজ্জ্বল নয়, অতিরিক্ত ক্ষীণও কিছু কিছু আছে। এক রকম ফেটেপড়া তারাকে বলা হয় নোভা (nova); এরা মাঝে মাঝে বেশী উজ্জ্বল হয়ে গ্যাস ও ধূলি শূন্যে নিক্ষেপ করে, কিন্তু অন্য সময়ে রঙের তুলনায় এদের প্রভা কম। এদেরও নিচে আছে অতিক্ষীণ শ্বেত বামন। ক্ষুদ্রতা অনুসারে এদের রং হওয়া উচিত লাল, কিন্তু অধিকাংশই সাদা বা হলুদ। ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হলেও এদের প্রত্যেকের মধ্যে বস্তু আছে প্রায় সূর্যের সমান, কিন্তু সেই বস্তু হয়তো মাত্র বুধ গ্রহের সমান আয়তনের মধ্যে ঠাসা; ফলে প্রতি ঘন ইঞ্চির ওজন এক থেকে ২০ টন কি তারও বেশী! এই সাংঘাতিক চাপে পড়েও শ্বেত বামনদের বস্তু পরমাণুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া ও পারমাণবিক রূপান্তরের ফলে যে ফেটে পড়ছে না তার কারণ বোধ হয় যে সব বস্তুই অবপারমাণবিক ভস্মে পরিণত হয়ে গিয়েছে, পরমাণুর মধ্যে আর কোনও প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। এই আন্তরিক তেজের অভাবে অভিকর্ষীয় চাপ আটকাতে না পেরে তারা সংকুচিত। এবং তার ফলে তাদের গা বেশী গরম, কারণ তাপ নির্গমনের জায়গা কম।

শ্বেত বামনরা মনে হয় মুমূর্ষু তারা, এমনি দলছাড়া অন্যান্য তারাদের স্থৈর্যের অভাব ও দেহস্ফীতি দেখে মনে হয় অসাধারণ তারাদের বার্ধক্য ধরেছে। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে সমগ্র তারা লোকে অসাধারণদের সংখ্যা অতি অল্প। যুগ্ম তারাদের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে অধিকাংশ শ্রেণীর দলছাড়া তারা সূর্যের এক থেকে ৩০ গুণ ভারী। বড় বলেই তারা স্বল্পায়ু। সূর্যের সমান যাদের বস্তু অথবা যারা আরও ছোট অসাধারণদের দলে ঢুকবার সময় তাদের এখনও আসে নি। এবং ভারী রুগ্ন তারাদের চেয়ে তারা দলে অনেক বেশী ভারী। রাইগ্‌ল তারা অসুস্থ, সূর্যের ৩০ গুণ ওজন, ৪০,০০০ গুণ প্রভা—আর আয়ু সম্ভবত লক্ষের এক অংশ মাত্র; কিন্তু প্রতি অবিবেগনি রাইগ্‌লের পরিবর্তে আছে দু লক্ষ হলুদ সূর্য এবং কয়েক লক্ষ আরও ছোট ক্ষীণ, লাল M তারা।

ছায়াপথের এক অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ করলে তারা সমাজের শ্রেণী ভেদ সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। সূর্যের থেকে ১৬ আলোকবর্ষ পরিধির মধ্যে আছে পঞ্চাশটি তারা, তাদের চারটি ভস্মীভূত শ্বেত বামন, দুটি অতি-উজ্জ্বল তেজস্ক্রয়ী A তারা, একটি উজ্জ্বল হলুদ-সাদা F তারা, দুটি সূর্যপ্রায় মৃদু-উজ্জ্বল G তারা, সাতটি ক্ষুদ্র কমলা রঙের K তারা, এবং বাকি ৩৪ অতি সাধারণ খুদে M তারা।

সুতরাং এই নীহারিকায় সূর্যের পদমর্যাদা একেবারে তুচ্ছ করবার মত নয়, তবে একটা বিষয়ে প্রতিবেশী অধিকাংশ তারাদের কাছে সে হার মানে। তারার বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক ধারণা অনুসারে এরা সূর্যের দশ থেকে ২০০ গুণ বেশী কাল জ্বলবে—সূর্যের বাতি নিভে যাওয়ার কয়েক কোটি বছর পরেও বেঁচে থাকবে এরা।

এই বিবর্তন সম্বন্ধে গাণিতিক তত্ত্ব ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের মধ্যে আশ্চর্য মিল পাওয়া গিয়েছে, এবং দেখা গেল তারার ঠিকুজি লেখা আছে তার বস্তু পরিমাণের মধ্যে। তারার জীবনে এই দেহ ভারের গুরুত্ব প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ইংরেজ জ্যোতিষী সার আর্থার এডিংটন ১৯২০ দশকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এক বিশেষ পরিমাণ বস্তু নিয়ে এক তারা যেই সৃষ্টি হয়ে গেল তখন থেকেই তার বাকি জাবন নির্ধারিত দুই বিরুদ্ধ শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা ; এক দিকে অভিকর্ষীয় ভারের ফলে সংকোচন, অন্য দিকে আইনষ্টাইনীয় সূত্র $E=mc^2$ অনুযায়ী তার মধ্যে যে তেজ আছে তার নিঃসরণ। অন্যান্য তাত্ত্বিকরা এডিংটনের ধারণা আরও ভাল করে গড়ে তোলেন, যথা আমেরিকার হান্‌স বেটি, জারমেনির কার্ল ফন হ্বাইৎসেকার, ও সুব্রমনিয়ন চন্দ্রশেখর (এঁর জন্ম ভারতে, বাস আমেরিকায়)।

পরীক্ষা ও তথ্যের ক্ষেত্রে পালোমার প্রতিষ্ঠানের ওআল্‌টার বাড ও অ্যালান স্যান্‌ডেজের নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে দুই রকম তারকা পুঞ্জের নাম করা হয়েছে—নীহারিকার বহির্মণ্ডলে গোল পুঞ্জ ও তার কুণ্ডলিত বাহু অঞ্চলে আর এক শ্রেণীর ঢিলে সমষ্টি। বাড আবিষ্কার করলেন যে মণ্ডলের তারাগুলির অধিকাংশ লালাভ, স্ফীত অতি-উজ্জ্বল আর্কট্যুরাস প্রমুখ লাল

দানবদের আলোই প্রধান সেখানে। ইনি এও দেখালেন যে এরা যে অঞ্চলে আছে সেখানে ধূলি ও গ্যাস নেই যার থেকে নতুন তারা সৃষ্টি হতে পারে। এই দুইয়ের যোগ করে তিনি স্থির করলেন যে মণ্ডলে আছে বয়স্ক তারার সমাজ, সেখানে ভারী দ্রুতজ্বলন্ত নীল তারার সাধারণ অংশটা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বেঁচে আছে প্রধানত ছোট সাধারণ হলুদ ও লাল তারা, তাদের মধ্যে যে কয়েকটি অসাধারণ লাল দানব দেখা যায় তারাই সবচেয়ে ভারী ; এগুলি অসাধারণ কারণ এদের পালা এসেছে রোগ ও মৃত্যুর কবলে পড়বার। এরা যখন মুমূর্ষু শ্বেত বামনদের দলে ঢুকবে, তখন এদের চেয়ে একটু হালকা তারাগুলি হয়ে পড়বে লাল দানব, এবং এই বিবর্তন চলবে বহু কোটি বছর ধরে যত দিন না সবচেয়ে হালকা সবচেয়ে দীর্ঘায়ু তারাটির জীবন প্রদীপ নিভে যাবে, পরিপূর্ণ আঁধার বিরাজ করবে বহির্মণ্ডলে।

পক্ষান্তরে, নীহারিকার কুণ্ডলিত বাহুতে তারা-গড়া বস্তুর অভাব নেই. গ্যাস ও ধূলির স্রোত বয়ে চলে সেখানে। বাড লক্ষ করলেন নীহারিকার অন্যান্য অংশের তুলনায় বাহুর তারাগুলি সাধারণত অনেক বেশী নীল ও উজ্জ্বল, অর্থাৎ অনেক বেশী ভারী ও দ্রুতজ্বলন্ত। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন এইগুলি নতুন তারা এবং নীহারিকার এই চ্যাপটা অংশে আছে অপেক্ষাকৃত নতুন তারার মিশ্র সম্প্রদায়, সেখানে সর্বদা ছোট বড় সব রকম তারা জন্ম নিচ্ছে আদিম গ্যাস ও ধূলির থেকে, সুতরাং তাদের মধ্যে মিলবে সব শ্রেণীর ও বয়সের তারা—নবীন নীল ভারী তারা, নবীন থেকে মধ্যবয়স্ক মাঝারি ওজনের তারা এবং নবীন থেকে প্রাচীন হালকা তারা।

স্যান্ডেজ ও অন্যান্য কর্মীরা বাইরের ও ভিতরের, অর্থাৎ মণ্ডল ও ও কুণ্ডলের তারকা পুঞ্জ পর্যবেক্ষণ করে এই সব ধারণার সমর্থন পেয়েছেন। সবচেয়ে নতুন কুণ্ডলী পুঞ্জে সবচেয়ে হালকা তারাগুলির জন্ম এখনও শেষ হয় নি, এখনও আদিম গ্যাসের সংকোচন চলেছে দেহ গড়তে, আলো এখনও ক্ষীণ কিন্তু তারই পাশাপাশি হয়তো সবচেয়ে গুরুভার তারাগুলি হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত উজ্জ্বল, স্থবির—চলে যাচ্ছে প্রধান অনুক্রমের বাইরে।

তারার জীবন ইতিহাসে বস্তু পরিমাণের এই আশ্চর্য প্রভাব সমর্থন পেয়েছে আধুনিক গণিতে। এডিংটন ও তৎপরবর্তী তাত্ত্বিকদের সূত্র ধরে ফ্রেড হয়েল, মার্টিন শোআর্জ়চাইল্ড ও অন্যান্যরা বিভিন্ন ভর অনুযায়ী তারাদের জীবন কাহিনী হিসাব করেছেন ; পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সঙ্গে তার এত সুন্দর মিল যে এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

একই সঙ্গে একই হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে জন্ম নিয়েও কেন এক তারা তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায় আর এক তারার আয়ু ক্ষয় হয় মৃদু মন্দ তালে, কি কি আভ্যন্তর কারণে তাদের ভিন্ন স্বভাব, ভিন্ন রং আয়তন ও আয়ু? এক কথায়, তারার জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর ভিতরের রহস্যটা কি?

কাহিনীর শুরু যখন মহাকাশে গ্যাস ও ধূলির এক মেঘ নিজের দেহে কোথাও বেশী ঘন হয়ে পড়ে এবং সেই কেন্দ্রে অভিকর্ষীয় চাপে সংকোচন আরম্ভ হয়। ক্রমে মেঘ ঘুরতে ঘুরতে থালার মত চ্যাপটা হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রে দানা বাঁধে। এই ভাবে একটির বেশী ঘন কেন্দ্র থেকে সৃষ্টি হতে পারে যুগ্ম বা যৌথ তারা, অথবা এক বা একাধিক তারা এবং তৎসংযুক্ত গ্রহ। এরা গঠিত হয় আদি গ্যাস মেঘের আয়তন, ঘনতা ও গতি অনুসারে। ছায়াপথের ভিতরে আমাদের কাছাকাছি অন্ধকার প্রাকৃতারা দেখা যায় বলে জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন যেখানে সংকোচন চলছে তারার জন্মের উদ্যোগে।

এই সংকোচনের সময়ে অভিকর্ষীয় শক্তির অর্থাৎ অন্তর্গামী পরমাণুর সংঘর্ষের ফলে কেন্দ্র স্থলে তাপ বাড়ে এবং ক্রমে সেখানে হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে মিশে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়। বাইরের বাড়ন্ত স্তরগুলির চাপে সংকোচন বেড়ে চলে, কেন্দ্রের পরমাণু আরও ঘন হয়ে ঠেসে যায়, হিলিয়াম সৃজন হয় দ্রুত। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর তেজ সৃষ্টি হয়—কি পরিমাণে তা আমরা অনুমান করতে পারি হাইড্রোজেন বোমা থেকে, কারণ তার মধ্যেও হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সৃষ্টি হচ্ছে।

এই কেন্দ্রীয় শক্তি বাইরের দিকে চাপ দেয় এবং তারার সংকোচনকে

বাধা দিতে দিতে ক্রমে তা থামিয়ে দেয় ; এই সমতার ফলে আসে তারা—জীবনের সুস্থির, পরিণত অবস্থা। তারা যদি ভারী হয় তার সংকোচন চলে দ্রুত, সংকোচনের প্রতিক্রিয়ায় নাভির চাপ ও তাপ বেড়ে প্রচুর পরিমাণ পারমাণবিক মিশ্রণ-শক্তি নিঃসৃত হয়। পক্ষান্তরে হালকা বা অল্পবস্তু তারার সংকোচন চলে ধীরে, তার আভ্যন্তর পরমাণুদের মধ্যে অত ভীড় নেই, অভিকর্ষীয় চাপ ঠেকাতে খুব ব্যস্ত ভাবে হিলিয়াম সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

সুতরাং তারা যে বিশেষ পরিমাণ বস্তু নিয়ে জন্মেছে সেই অনুসারে তার অভিকর্ষ ও পারমাণবিক মিশ্রণের মধ্যে এক জায়গায় সমতা আসে, এবং এই অবস্থায় সাধারণের দলে অর্থাৎ প্রধান অনুক্রম শ্রেণীতে তার জীবনের অধিকাংশ কাটে যখন আয়তন তাপ ঔজ্জ্বল্য সবই থাকে নিয়মানুগ। কিন্তু অবশেষে সময় আসে দলছাড়া হওয়ার যখন আদি হাইড্রোজেনের এক দশমাংশ খরচ করে সে অতিরিক্ত উজ্জ্বল হতে শুরু করে। উষ্ণ, নীল, ভারী, অপচয়ী তারার জীবনে এই দিনটি আসে মাত্র কয়েক লক্ষ বছর পরে ; আর শীতল, লাল, লঘু, ধীরজ্বলন্ত তারাদের জীবনে এই সন্ধি ক্ষণ আসতে লাগে ১০,০০০ কোটি বছরেরও বেশী। এই দুইয়ের মাঝামাঝি যে সব নাতিশীতোষ্ণ হলুদ তারা, যাদের আয়তন সূর্যের মতন, যারা শক্তি সৃষ্টি করে খুব বেশীও না কমও না, তাদের সাধারণ সুস্থির জীবন চলে কয়েক শো কোটি বছর। সূর্য সাধারণের দল ছাড়বে সম্ভবত আর ৫০০ কোটি বছরে।

তারার জীবনে এই সন্ধি ক্ষণ আসে কেন্দ্রে হিলিয়াম জমার ফলে। এ অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় বস্তু বা পারমাণবিক ছাইকে ঘিরে হাইড্রোজেন পরমাণুর মিশ্রণ চলতে থাকে। ছাই নিজের ভারে সংকুচিত হতে থাকে, কিন্তু তা বাধা দেওয়ার জন্য হাইড্রোজেনের মত ভিতর থেকে শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। সংকোচনের ফলে পরমাণুর কেন্দ্র চেপে যায়, ঠেলায় পড়ে ইলেক্ট্রন হয় কক্ষচ্যুত এবং নির্গত হয় অভিকর্ষীয় শক্তি। এই শক্তি কেন্দ্রের তাপ বাড়ায় এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ মিশ্রণকে দ্রুত করে।

ভিতর থেকে ক্রমশ বেশী তেজ নির্গমনের ফলে তারার বহিরাংশ ভীষণ ভাবে ফুটতে থাকে এবং তার আয়তন বাড়তে থাকে—এই স্ফীত তারা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। কিন্তু বাইরের স্তরগুলি কেন্দ্রীয় চুলার থেকে দূরে

সরে যায় বলে তাদের তাপ ধীরে ধীরে কমে। তখন এই ফুলে-ওঠা তারা হয়ে পড়ে লাল ও শীতল। যদি তার মধ্যে সূর্যের অনেক গুণ বেশী বস্তু থাকে তবে সে বেট্‌ল্‌গুজ়ের মত লাল অতিদানবে পরিণত হয়, সূর্যের সমান বা তার থেকে একটুখানি ভারী হলে সে হয় অল্পস্ফীত লাল বা কমলা রঙের দানব। আর সূর্যের চেয়ে অনেক হালকা হলে সে যা হবে তার দৃষ্টান্ত এখনও নেই কারণ ছায়াপথের জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত কোনও লঘু তারা যথেষ্ট হাইড্রোজেন খরচ করে ফুলতে আরম্ভ করে নি ; তবে আগের সাধারণ অবস্থার তুলনায় তাকে হতে হবে আরও লালাভ ও উজ্জ্বল।

অতি উজ্জ্বল অসাধারণ অবস্থায় তারা হাইড্রোজেন ক্ষয় করে অতি দ্রুত আর সেই অনুপাতে হিলিয়াম জমে ভিতরে, এই বাড়ন্ত ভস্ম স্তূপ কেন্দ্রের উপর অভিকর্ষীয় চাপ বাড়ায়, আরও বেশী তাপ দরকার হয় তা আটকাতে। এই তাপে আবার মিশ্রণ ও ভস্ম সৃষ্টি দুইই চলে আরও দ্রুত। এইখানে লাল দানব আবার নীল হতে আরম্ভ করে। সূর্যের সমান কোনও তারার অবস্থা হয় এই যে কেন্দ্রে ৪০ শতাংশ হাইড্রোজেন খরচ হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্র সংকুচিত হয়ে প্রায় ১১০০ লক্ষ ডিগ্রি তাপ তৈরি করে, এইখানে হিলিয়ামের অব্যয় ভস্ম দশা চুকে গিয়ে তা হয়ে ওঠে শক্তিস্‌হজনী ইন্ধন। তার তিন পরমাণুর বিস্ফোরণী মিশ্রণে তৈরি হতে পারে কারবন, চার পরমাণুর থেকে অক্‌সিজেন, পাঁচের থেকে নিয়ন। তারার কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় থেকে হয়ে পড়ে সক্রিয়—তারার জীবনে এই আর একটি অস্থির সন্ধি ক্ষণ। এখানে তার কেন্দ্রে কোনও এক রকম বিস্ফোরণ ঘটে, কিন্তু তার ফলে তারার যে কি অবস্থা বিকার হয় তার হিসাব অত্যন্ত দুরূহ, এখনও তা ভাল করে জানা নেই।

তারা যদি যথেষ্ট বড় হয় তবে হয়তো ক্রমশ এক সময়ে ৮০ কোটি ডিগ্রি তাপে নিয়ন ভস্ম থেকে আরও ভারী পদার্থ ম্যাগ্‌নিসিয়াম তৈরি হবে। প্রায় ১৫০ কোটি ডিগ্রিতে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন গন্ধক ফস্‌ফরাস ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সৃজন শুরু হবে, এবং ২৫০ কোটি ডিগ্রিতে এদের থেকে হতে থাকবে আরও ভারী বস্তু টাইটেনিয়াম ক্রোমিয়াম ম্যাংগানিজ় লোহা কোবাল্‌ট নিকেল তামা ও দস্তা। এই ভাবে কল্পনা করা যায় অতি গুরুভার এক তারা যার স্তরে স্তরে তাপ অনুসারে একই সঙ্গে

বিভিন্ন প্রক্রিয়া চলছে, উপরের স্তর ভস্ম দিয়ে দিচ্ছে অধিকতর উত্তপ্ত নিচের স্তরকে। এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে বিস্ফোরণী বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে জর্জ গ্যামো প্রবর্তিত প্রকল্প অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সব মৌলিক পদার্থগুলি বিস্ফোরণের আধঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়েছিল, অনেকে বলেছেন বিস্ফোরণ এত দ্রুত ঘটেছে যে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম ছাড়া আর কিছু তৈরি হওয়ার সময় হয় নি। এখন দেখা যাচ্ছে যে আরও ভারী মৌলিক পদার্থগুলির জন্ম হয়েছে অনেক পরে, তারার গর্ভে।

তত্ত্ব ও তথ্য দুইই বলে যে কেন্দ্রীয় বিস্ফোরণের পর লাল দানব দ্রুত চলে শ্বেত বামনত্বের দিকে। সূর্যের সমান তারারা সহজেই এই অবস্থা পায়। খরচ করবার মত শক্তি যা বাকি ছিল তা শেষ হয়ে গেলে নিজের অভিকর্ষীয় চাপে তারা সংকুচিত হয়ে এমন অবস্থায় আসে যখন তার পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি অধিকতর সংকোচন বন্ধ করে দেয়। এর পরে এই শ্বেত বামন বহু লক্ষ বছর পরে কেবলই ঠাণ্ডা হয় যত দিন না সে মহাকাশের মত তাপশূন্য হয়ে পড়ে।

যে সব তারার বস্তু সূর্যের দেড় গুণ বা তার বেশী তারা অত সহজে শ্বেত বামনের স্থবিরতা লাভ করে না। তার কারণ চন্দ্রশেখর আবিষ্কৃত প্রকৃতির এক নিয়ম যে সূর্যের ১.৪৪ গুণ ভারী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পিণ্ড টিঁকতে পারে না। যদি তার অস্তিত্ব সম্ভব হত তবে তার মধ্যে যে পরিমাণ অভিকর্ষীয় শক্তি থাকত তাতে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি পর্যন্ত ভেঙে যেত এবং তারার সংকোচন চলত চির কাল—ক্রমে ক্রমে সেই গোলকের আয়তন হত সূর্য, পৃথিবী, কলাইসুটির দানা, বিন্দু, পরমাণু, এমন কি ইলেক্‌ট্রন কণার সমান। এই অদ্ভুত অকল্পনীয় অবস্থা এড়াবার জন্যই যেন প্রকৃতি চন্দ্রশেখর সীমা নির্ধারিত করেছে। এবং তাই এ পর্যন্ত যত শ্বেত বামনের ভর জানা আছে তারা সবই ১.৪৪ সূর্যের চেয়ে অনেক হালকা।

কিন্তু ভারী তারাদের তা হলে কি হয়? জন্ম কালে এদের অনেকেরই বস্তু পরিমাণ চন্দ্রশেখর সীমা থেকে আরম্ভ করে বহু সূর্যের সমান। ১৯৬৮ সালে ক্যানাডার এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এক যুগ্ম তারা আবিষ্কার করেন, তাদের ভর সূর্যের ৬০ ও ৫০ গুণ। আসলে ভারী তারারা নিজেদের ওজন কমাবার ব্যবস্থা রাখে। খুব ভারী তারা সাধারণত বিরল ও

রহস্যাবৃত, কিন্তু এদের অধিকাংশই দ্রুত ঘুরপাক খায় এবং সম্ভবত তার ফলে বহু যুগ ধরে নিরক্ষ রেখা অঞ্চল থেকে বস্তু নিক্ষিপ্ত হয় মহাকাশে।

কিন্তু কতগুলি ভারী তারা জন্ম থেকেই আস্তে ঘোরে, তাদের পক্ষে ভার কমানো সম্ভব নয়। এদের জীবন ইতিহাস বুঝতে জ্যোতিষপদার্থ-বিজ্ঞানীরা যে তত্ত্বটি গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে নিহিত মহাকাশের এক অত্যাশ্চর্য ও নাটকীয় ঘটনার কাহিনী।

তারার হিলিয়াম-কেন্দ্রে যে বিস্ফোরণের কথা আগে বলা হয়েছে তা যখন ভারী ধীরঘূর্ণি তারার অভ্যন্তরে ঘটে তখন তার অত্যধিক মহাকর্ষীয় শক্তি বিস্ফোরণকে চেপে রাখে। হিলিয়াম-কেন্দ্রের পরে ক্রমে ক্রমে যে অন্যান্য কেন্দ্রগুলি সৃষ্টি হয় (কারবন-অক্সিজেন-নিয়ন, ম্যাগ্‌নিসিয়াম, সিলিকন-অ্যালুমিনিয়াম-গন্ধক, ইত্যাদি) সেগুলি সম্বন্ধেও এ কথা সম্ভবত সত্য। অবশেষে ভারী ধীরঘূর্ণি তারা পেঁয়াজের খোসার মত সাতটি সুনির্দিষ্ট স্তরে জ্বলতে থাকে—সবচেয়ে বাইরে লঘু হাইড্রোজেন, গভীর অভ্যন্তরে গুরুভার লৌহ।

এই সময়ে আপাত শান্ত তারাটির অবস্থা ঠিক একটি বোমার মত। কেন্দ্রে সব পারমাণবিক ইন্ধন ক্ষয়ে গেলে বহির্মুখী চাপ আর থাকে না মহাকর্ষকে বাধা দেবার মত, সুতরাং শুরু হয় প্রচণ্ড অন্তর্ধাবন; ফুটো বেলুনের মত চুপসে যেতে যেতে ঘষা চাপায় গ্যাসের তাপ চড়ে যায় ১০,০০০ কোটি ডিগ্রি। শেষ মরণ দশায় তারার এই আকস্মিক সর্বঘাতী অন্তর্ধাবনের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ঘটে সাংঘাতিক বিস্ফোরণ, ১০০ কোটি তারার তুল্য তার দীপ্তি। সর্বোচ্চ তেজ চড়ে যেতে পারে সমগ্র ছায়াপথের অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি তারার সমান। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সেকেন্ডে ২০০০-৩০০০ মাইল বেগে গ্যাসের আবরণ বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়, অনেকখানি বস্তু মহাকর্ষের টান কাটিয়ে চির কালের মত মহাকাশে ছুটে চলে, বাকি থাকে অতিউত্তপ্ত ঘন এক অষ্ঠিকে ঘিরে বিক্ষুব্ধ গ্যাস রাশি।

এই বিস্ফোরণই অতিনোভা। এখানে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা উল্লেখযোগ্য, সুইডেনের পদার্থবিৎ হানেস্ আল্‌ফভেন বলেছেন অতিনোভার (ও কোআজ়ারের) উৎপত্তি বস্তু-প্রতিবস্তুর সংঘর্ষে।

ছায়াপথে এ পর্যন্ত যে ক'টি অতিনোভার খবর জানা আছে তা সবই ঐতিহাসিক দলিল থেকে, কিন্তু এ কালের জ্যোতিষীরা অন্যান্য নীহারিকায় প্রতি বছর কয়েকটি করে দেখতে পান। তাঁদের হিসাবে প্রতি নীহারিকায় কয়েক শতাব্দ পর পর একটি অতিনোভার সৃষ্টি হয়।

আমাদের নীহারিকায় শেষ অতিনোভা দেখা গিয়েছে ১৬০৪ সালে, এবং তার আগে ১৫৭২ সালে; এরা যথাক্রমে কেপ্‌লারের তারা ও টিকোর তারা নামে পরিচিত; প্রথমটি সম্বন্ধে কেপ্‌লার এক বই লিখেছিলেন, দ্বিতীয়টি টিকো ব্রাহে প্রথম লক্ষ করেছিলেন। তার আগে যেটি জানা আছে তা ঘটে ১০৫৪ সালে, এই বিস্ফোরণ চীনা জ্যোতিষীদের এত বিভ্রান্ত করেছিল যে তাঁরা আকাশের গায়ে এর স্থান সম্বন্ধে দলিলে স্পষ্ট নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন। বৃষ (Taurus) তারামণ্ডলের সেই অংশে আজ দূরবিন লক্ষ করলে দেখা যায় অস্থির বিক্ষুব্ধ এক গ্যাসীয় মেঘ, চেহারা অনুসারে যার নাম দেওয়া হয়েছে কর্কট নেবুলা। এই গ্যাস বেড়ে চলেছে ঘণ্টায় ২৫ লক্ষ মাইল বেগে, জোর রেডিও বাণীতে সর্বদা জানাচ্ছে তার বিক্ষোভ। মেঘের কেন্দ্রে দেখা যায় এক পাতলা-নীল তারকা খণ্ড।

মার্কিন জ্যোতিষী বার্নার্ড গোল্‌ডষ্টাইন ও মালয়শিয়ার হো পেং ইয়োকে বলেন যে আর একটি অতিনোভা বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে ১০০৬ সালে। আরব্য, চীনা, জাপানী ও ল্যাটিন দলিল অনুসারে নাকি ঐ বছরের বসন্ত ঋতুতে দক্ষিণাকাশের লুপুস তারামণ্ডলে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে সে কালের লোক দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ইত্যাদিকে যুক্ত করেছিল। এই 'তারা' নাকি জ্বলজ্বল করেছে ৩½ মাস, এবং কয়েক বছর ধরে খালি চোখে দেখা গিয়েছে। ছায়াপথের তারা x-৩ রঞ্জন রশ্মি ও রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে, সম্প্রতি এটিকে নতুন অতিনোভা বলে সন্দেহ করা হয়েছে, কারণ ৩১.৮.৭২ ও ২.৯.৭২ তারিখের মধ্যে হঠাৎ তার রেডিও বিকিরণ দুই মান বেড়ে যায়।

অন্যান্য নীহারিকায় প্রায়ই অতিনোভা দেখা দেয়, পালোমার গিরির ক্যামেরা দিয়ে নিয়মিত অনুসন্ধান করে ফ্রিট্‌জ্ জ্‌ইকি ও সহকর্মীরা ১৯৭২ সালের শেষাশেষি সব সুদ্ধ ২৪০ অতিনোভা আবিষ্কার করেছেন। ১৯৬৬ সালে ভিরগো তারামণ্ডলের এক অনামিত নীহারিকায় একটি আবিষ্কার করেন

এক সুইস্ জ্যোতিষী। সোভিয়েট আরমেনিয়ার দুই নারী জ্যোতিষী ১৯৬৭ সালে এক দূর নীহারিকায় নতুন অতিনোভা আবিষ্কারের খবর জানান। ১৯৭২ সালে একটি পেয়েছেন আমেরিকার চার্লস কোআল ২০০ ইঞ্চি দূরবিন দিয়ে ; মাত্র দশ আলোকবর্ষ দূরে সেন্টরাস তারামণ্ডলের এক ক্ষুদ্র অবিন্যস্ত নীহারিকার প্রান্তে এই অতিনোভা তার চরম দীপ্তির দিন কয়েকের মধ্যে ক্যামেরার প্লেটে ধরা পড়ে। পূর্ববর্তী ৩৫ বছরের মধ্যে উজ্জ্বলতম এই অতিনোভার প্রভা সমগ্র নীহারিকাটিকে হার মানিয়েছিল।

ছায়াপথের বাইরে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিস্ফোরণটি ঘটে ১৮৮৫ সালে আমাদের প্রতিবেশী অ্যান্ড্রমিডা নীহারিকায়, এই অতিনোভার প্রভা দশ কোটি সূর্যকে হার মানিয়েছিল—২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে প্রায় খালি চোখে দেখতে পাওয়ার মত। তেজ বিকিরণ আদি তারার মৃত্যুর পরেও অনেক কাল ধরে চলে, মহাকাশ থেকে যত রেডিও শক্তি আজ পৃথিবীতে ঝরছে তার বেশ একটা অংশের উৎপত্তি অতিনোভার অবশিষ্ট মেঘে।

অতিনোভার চেয়ে ছোট এক রকম বিস্ফোরণকেই বলা হয় নোভা, এরা এত বিরল নয়, এদের তেজও কম। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'নোভা স্টেলি' থেকে, মানে 'নতুন তারা'; আসলে নতুন মোটেই নয় এরা, যা আগে ছিল অদৃশ্য তা হঠাৎ জ্বলে উঠে দৃশ্যগোচর হওয়াতে প্রাচীন আকাশদর্শীদের মনে ঐ রকম ভুল ধারণা হয়েছিল। না বুঝে ভুল নাম দেওয়ার এই রকম দৃষ্টান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে আরও আছে।

আজ কয়েকটি নোভার পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে তারা যুগ্ম তারা, এবং এই ধারণা গড়ে উঠছে যে সব বা অধিকাংশ নোভা বিস্ফোরণ ঘটে যখন স্ফীত, বিবর্তনরত এক দানব তারার নিক্ষিপ্ত বস্তু গিয়ে আঘাত করে তার শ্বেত বামন সঙ্গীকে। এমন মতও দেখা যায় যে এক শ্রেণীর অস্থিরদ্যুতি তারা হয় মাত্র এক বার অথবা বহু কাল পর পর বিস্ফোরিত হয়ে নোভা সৃষ্টি করে।

নোভা বিস্ফোরণের পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায় ১০,০০০ থেকে লক্ষ গুণ, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হয় সেকেন্ডে হাজার মাইল বেগে, সূর্যের লক্ষ গুণ তেজ সৃষ্টি হয় বিস্ফোরণের চরম দশায়। ছায়াপথ নীহারিকায় নয় মানের বেশী উজ্জ্বল নোভা দেখা দেয় বছরে প্রায় ২০, এ

পর্যন্ত শতাধিক লক্ষিত হয়েছে। এক ইংরেজ স্কুল-শিক্ষক ১৯৬৭ জুলাইতে সিগ্‌নাস তারামণ্ডলে এক নোভা আবিষ্কার করেন।

কেপ্‌লার তাঁর অতিনোভা সম্বন্ধে যে বই লেখেন তাতে মানুষের ভাগ্যের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, যদিও তার প্রকৃত চরিত্র তিনি বুঝেছিলেন। ইংরেজ কবি জন ডন এই তারাবস্থার নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে লেখেন

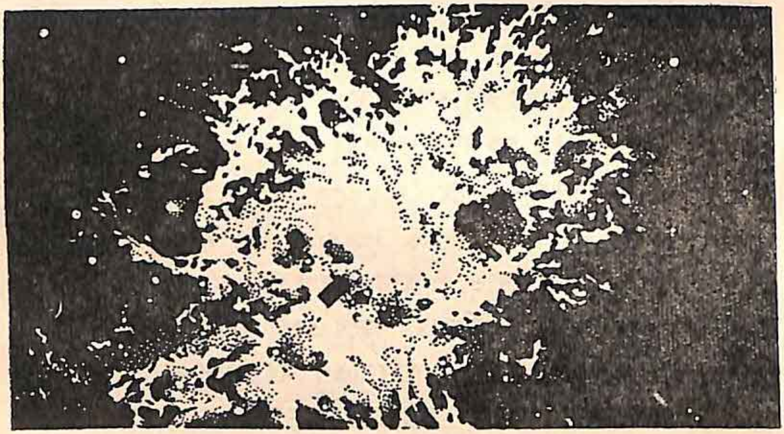
> Who vagrant transitory Comets sees,
> Wonders, because they are rare : but a new starre
> Whose motion with the firmament agrees,
> Is miracle, for there no new things are.

নোভা ও অতিনোভাকে সে কালের লোক ধূমকেতুর মতই দুর্লক্ষণ বা দুর্নিমিত্ত ভেবেছিল বলেই বোধ হয় তাদের খবর সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছে, নতুবা তাদের ইতিহাস আমাদের অজানা থাকত। কিছু দিন আগে পিকিং থেকে চীনা অ্যাকাডেমি এদের এক নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে প্রাচীন চীনা ও জাপানী দলিল অনুসন্ধান করে যার কোনও কোনওটা ইয়োরোপের জ্যোতিষীয় দলিলের চেয়ে অনেক পুরনো; এতে সপ্তদশ শতাব্দের শেষ পর্যন্ত পরিলক্ষিত নব্বইটি নোভা ও অতিনোভার খবর আছে। অ্যাকাডেমির বিশ্বাস ছায়াপথে মোটামুটি প্রতি ১৫০ বছরে একটি অতিনোভা ঘটে। ১৯৭০ সালে অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী জিম ক্যাসোএল মহাকাশে অবশিষ্টের সংখ্যা পরীক্ষা করে পাশ্চাত্ত্য হিসাব সংশোধন করেছেন, তদনুসারে এই হার হল প্রতি ৫০ বছরে একটি; সুতরাং 'কেপ্‌লারের তারা'র পর ছায়াপথে আর একটির আবির্ভাবের সময় অনেক দিন পেরিয়ে গিয়েছে।

অতিনোভা ও শ্বেত বামনদের প্রসঙ্গে নিউট্রন তারা উল্লেখযোগ্য। এই তারার ধারণা প্রস্তাবিত হয় ১৯৩০ দশকে। এই ধারণা অনুসারে অতিনোভা বিস্ফোরণের আগে তারার কেন্দ্রে অত্যধিক চাপে বস্তুর সাধারণ গঠন ভেঙে যায়, পরমাণুর ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিস্ফোরণের বিপরীত চাপে অবশিষ্ট অষ্ঠি আরও ঘনীভূত হয়, ফলে শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু নিউট্রনের এক পিণ্ড। হয়তো তার ব্যাস মোটে দশ মাইল, সুতরাং ঘনতা প্রায় অকল্পনীয়—এক ঘন ইঞ্চির ওজন হয়তো লক্ষ কোটি টন!

ভেবে দেখলে তা খুব আশ্চর্য নয়, কারণ বস্তুর অধিকাংশই ফাঁকা, পরমাণুর ভিতরে প্রোটন, নিউট্রন, ইলেক্‌ট্রন ইত্যাদি কণা এই ফাঁক পেরিয়ে শুধু শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণে বাঁধা।

নিউট্রন তারার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ ছিল, পাল্‌সার আবিষ্কারের পর তা অনেকটা দূর হয়েছে। টমাস গোল্‌ডের প্রকল্প অনুসারে বর্তমান ধারণা এই যে অতিঘন নিউট্রন তারা দ্রুত পাক খাওয়ার ফলে চতুর্দিকের উত্তপ্ত আয়নিত গ্যাস প্রচুর পরিমাণ নানা রূপ তেজের সঙ্গে থেকে থেকে রেডিও বিকিরণ ছড়ায় যার তাল বা স্পন্দন অতি সূক্ষ্ম ভাবে নির্ধারিত; এই স্পন্দন কাল সেকেন্‌ডের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এবং বিভিন্ন তারার বিভিন্ন তাল।



৫ নং চিত্র

কর্কট নেবুলা ও তার অন্তর্বর্তী পাল্‌সার (চিহ্নিত)

অনুসন্ধানের ফলে কর্কট নেবুলায় এক পাল্‌সার পাওয়া গিয়েছে, রেডিও বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক একই তালে এই তারায় আলোর দপদপানিও দেখা যায়, যেন কোনও নৈসর্গিক ট্র্যাফিক সিগন্যাল! এই নিউট্রন তারাটির এবং অন্যান্য পাল্‌সারের স্পন্দন ক্রমশ ধীর হয়ে পড়ছে, কিন্তু তার পরিমাণ দিন প্রতি এক সেকেন্‌ডের বহু লক্ষ অংশ, যদিও আধুনিক যন্ত্রে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাতিক্রমও ধরা পড়ে। পাল্‌সারদের মধ্যে এই তাল-মন্দা যে

দেখা যাবে তা গোল্‌ড আগেই বলেছিলেন—এর কারণ এই যে বয়সের সঙ্গে তাদের আবর্তন গতি মন্থর হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ১৫০০ আলোকবর্ষ দূরে আর একটি পাল্‌সার ধরা পড়েছে আর এক প্রকাণ্ড গ্যাসীয় মেঘের কেন্দ্রে যার নাম গাম নেবুলা। এর সৃষ্টিদাতা অতিনোভার বয়স নির্ণয় করতে জ্যোতিষীরা সাহায্য চেয়েছেন পুরা-বিজ্ঞানীদের, অর্থাৎ যাঁরা প্রাচীন মানুষের ইতিহাস খোঁজেন। চীন দেশে ছাড়াও উত্তর আমেরিকার মানুষ কর্কট নেবুলার জনক অতিনোভার প্রমাণ রেখেছে গুহায় এবং পাথরের গায়ে ছবি এঁকে। গাম পাল্‌সারের বর্তমান স্পন্দন থেকে তার বয়স অনুমান হয় ৯০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ, এ কালের আকাশ-দর্শীদের আশা এই যে প্রস্তর যুগের শিল্পী হয়তো আকাশের গায়ে হঠাৎ এক 'উজ্জ্বল তারা'র আবির্ভাব লক্ষ করে তা লিপিবদ্ধ করেছে; তা আশ্চর্য নয় কারণ সম্ভবত এই তারার দীপ্তি ছিল সপ্তমীর চাঁদের তুল্য, ভরা দিবালোকেও দৃষ্টিগোচর ছিল তা। এই রকম ছবি বা সংকেত যদি খুঁজে পাওয়া যায় তবে প্রত্নতত্ত্বের আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে এই ঘটনার বয়স আরও নিখুঁত ভাবে নির্ধারণ করা যাবে।

নিউট্রন তারার মত আর একটি বস্তুর রহস্য নিয়ে সম্প্রতি খুব উত্তেজিত আলোচনা চলছে। তত্ত্ব বলে সূর্যের অন্তত তিন (সম্ভবত দশাধিক) গুণ ভারী তারার অবপারমাণবিক জঠরাগ্নি যখন নিভে যেতে আরম্ভ করে তখন বহির্মুখী চাপ কমে যাওয়াতে গ্যাস ছোটে ভিতর দিকে, ফলে তারাটি চুপসে হয়ে পড়ে অতিঘন এক গোলক, যার ব্যাস হয়তো দু তিন মাইল মাত্র এবং প্রতি ঘন ইঞ্চির ভার বহু হাজার কোটি টন। তখন এই প্রচণ্ড মহাকর্ষ শক্তির বন্ধন কাটিয়ে কোনও রকম বিকিরণই মুক্তি পায় না, বরং তা নিকটবর্তী গ্যাস ও বিকিরণ শুষে নেয়, সুতরাং বস্তুটিকে চোখে দেখা বা যন্ত্রে ধরা সম্ভব না। তারার এই শীতল মৃতদেহের যথার্থ নাম দেওয়া হয়েছে অন্ধকূপ (black hole)।

এই ভৌতিক বস্তুকে ধরবার নানা উপায় খুঁজে সম্প্রতি কিছু সাক্ষ্য মিলেছে। সিগ্‌নাস তারামণ্ডলের x-১ নামক কেন্দ্র থেকে জোর রঞ্জন রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে যা প্রতি ৫·৬ দিনে হঠাৎ কমে যায়। সোভিয়েট তাত্ত্বিকদের মতে অন্ধকূপের যদি জুড়ি তারা থাকে তবে তার থেকে টেনে-নেওয়া গ্যাস

গরম হয়ে রঞ্জন রশ্মি ছড়াবে। এ দিকে জোরালো দূরবিনে x-১র কাছাকাছি এক প্রকাণ্ড তারা দেখা গেল (সূর্যের অন্তত ২০ গুণ ভারী) যার চলন যেন সূর্যের অন্তত তিন গুণ ভারী এক অদৃশ্য যুগল তারার মহাকর্ষের টানাটানিতে বিচলিত, সুতরাং সম্ভবত এই ছোট তারাটি তার প্রদক্ষিণ পথে ৫'৬ দিন অন্তর বৃহত্তর সঙ্গীর আড়ালে পড়ছে, রঞ্জন রশ্মি যাচ্ছে কেটে। তত্ত্ব ও পরীক্ষার এই যৌথ নজির থেকে মনে হয় অন্ধকূপ জ্যোতিষীদের কল্পনা মাত্র নয়।

ভেবে দেখলে আমরা—এবং বিশ্বের অন্য কোথাও যে প্রাণী থাকতে পারে তারাও—দূর দূরান্তরের তারার উপাদানে তৈরি। তাদের গর্ভে যে কারবন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে, নোভা অতিনোভা বিস্ফোরণে তা ছড়িয়ে পড়ছে মহাকাশে, ক্রমে নতুন গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টিতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে এরাও দানা বাঁধছে ; এই উপাদানের সংযোগেই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সাড়া সম্ভব হয়েছে। সুতরাং যদি বলি আমাদের জন্ম দূর মহাকাশের তারায় তারায় তো খুব অসংগত হবে না।…

৭। সূর্য

অপরিমেয় নক্ষত্র লোকের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিকটতম তারা যে কোনও রকম বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে না তা আমরা জানি। তার আয়তন ভর ঔজ্জ্বল্য সবই সাধারণ, যে নীহারিকায় জন্ম তার কেন্দ্র স্থল থেকে অনেক দূরে তার স্থান। তবু সে আমাদের তারা, মাত্র আট আলোক-মিনিট (৯'৩ কোটি মাইল) দূরে বিরাজমান আকাশের রাজার মত। সে না থাকলে গ্রহ গ্রহাণু উপগ্রহ ধূমকেতুও থাকত না, এই সৌর লোকের শক্তি ও গতির উৎস সে—সবচেয়ে গুরুভার ও সবচেয়ে উজ্জ্বল এই বস্তুকে ঘিরেই যত আয়োজন। যদি তার বাঁধন হঠাৎ ছিঁড়ে যায় তো মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পরিবার ছিটকে হারিয়ে যাবে মহাকাশে, যদি তার তাপ জুড়িয়ে যায় তো পৃথিবীর সাগর নদী জমে প্রাণ ধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর এই প্রাণও সৃষ্টি করেছে তারই আলো আদিম সাগরের নোনা জলে। আজ গাছপালা পশু পাখি সবই নির্ভর করে সূর্যের উপর ; তার আলো না পেলে ক্লোরোফিলের সাহায্যে আঙ্গারিক গ্যাস (carbon dioxide) থেকে গাছের খাদ্য তৈরি হয় না, আর তরু লতা না পেলে কোনও কোনও পশু বাঁচে না, আবার তাদের ছাড়া বাঁচে না মাংসাশী পশু। সূর্যের বাতি নিভে গেলে আমাদেরও দিন ফুরাবে।

তা ছাড়া অন্য তারার তুলনায় সূর্য যতই হীন হক তার নিজের ক্ষেত্রে সে অবিসংবাদিত সম্রাট। লাল তারা যেমন একাই হতে পারে সহস্রাধিক তারার চেয়ে বড়, নীল তারা গিলতে পারে সহস্রাধিক সূর্যকে, তেমনি সূর্য সহস্রাধিক বার গ্রাস করতে পারে তার বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতিকে, যার পেটে আবার জায়গা আছে সহস্রাধিক পৃথিবীর। সমগ্র সৌর লোকে যত বস্তু আছে তার ৯৯'৮৭ শতাংশের স্থান সূর্যের দেহে। এই উত্তপ্ত গ্যাস পিণ্ডের ওজন ২০ লক্ষ কোটি কোটি কোটি টনেরও বেশী, আয়তন ৩৩৫০

কোটি কোটি ঘন মাইল, কেন্দ্র স্থলে বস্তুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে লক্ষ কোটি পাউন্‌ড পরিমাণ।

কিন্তু সংখ্যা বিচারের চেয়ে এই কেন্দ্র স্থলে যা ঘটছে তার খবরই বেশী আশ্চর্য, কারণ সূর্যের যত তেজ তাপ জ্যোতি তার উৎপত্তি এইখানে। অতখানি ভীষণ চাপের নিচেও যে গ্যাস কঠিন পদার্থে পরিণত হয় না তার কারণ এই তেজ, যা আভ্যন্তর তাপ তুলে দেব ১.৪ কোটি ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড পর্যন্ত—গভীর অন্তর্দেশে নাকি তাপ ৩.৬ কোটি ডিগ্রি। উত্তপ্ত জঠরে হাইড্রোজেন পরিণত হচ্ছে হিলিয়াম গ্যাসে, তারই থেকে এত তেজের সৃষ্টি। এক হিলিয়াম পরমাণুর ওজন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ঠিক সমান নয়, ৯৯.২৯ শতাংশ; বাকি ০.৭১ শতাংশ বিনষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ রূপান্তরিত হচ্ছে তেজে। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রতি সেকেন্‌ডে ৬৫.৭০ কোটি টন হাইড্রোজেন থেকে ৬৫.২৫ কোটি টন হিলিয়াম ভস্ম সৃষ্টি হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ৪৫ লক্ষ টন বস্তু ক্ষয়ে হচ্ছে নিউট্রিনো ও গামা রশ্মি—তবু এই সূর্য আরও বহু শত কোটি বছর শক্তি যুগিয়ে যাবে!

নিউট্রিনো অতিক্ষুদ্র অবপারমাণবিক কণা, আর গামা রশ্মি অতি প্রবল এক জাতের বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গ। নিউট্রিনোর ভর নেই, বিদ্যুৎধর্ম নেই, তা কোনও বাধা মানে না; সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভূগর্ভে নিউট্রিনো মেপে দেখেছেন তা তত্ত্ব-সঙ্গত অনুমানের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। এর থেকে মনে হয় সূর্যের তেজ বিস্তার অস্থির, তা যুগে যুগে বেড়েছে কমেছে। হয়তো এই কারণেই পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে তুষার যুগ এসেছে। মঙ্গল গ্রহের মেরু অঞ্চলে যে বরফ জমে আছে হয়তো তার জলই একদা নদী নালার সৃষ্টি করেছিল, যার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ম্যারিনার মহাকাশ যান প্রেরিত ছবিতে।

এই যে বস্তুর বিলোপে তেজের উৎপত্তি তা ঘটছে আইনষ্টাইনের প্রসিদ্ধ সূত্র $E=mc^2$ অনুসারে। অর্থাৎ দশমিক পদ্ধতিতে বলা চলে প্রতি সেকেন্‌ডে কত ওআট শক্তি সৃষ্টি হয় তা জানতে হলে যত কিলোগ্রাম বস্তু বিনষ্ট হয়েছে তাকে গুণ করতে হবে আলোর দ্রুতির বর্গফল দিয়ে; আলো সেকেন্‌ডে যত মিটার যায় তার থেকে হিসাব করে এই বর্গফল হিসাব করে দাঁড়ায় প্রায় ৯০০ কোটি কোটি, সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে

সামান্য একটুখানি বস্তুর বিলোপে প্রভূত পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হয়।

এই শক্তি বাইরের দিকে চলে এসে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, প্রাণদায়ক তাপ ও তেজ বিতরণ করে আমাদের—হিসাবে দেখা গিয়েছে পৃথিবীতে অবিরত এসে পৌঁছায় ৩৮০,০০০ কোটি কোটি ওআট। হাইড্রোজেন বোমার জঠরে এই একই হাইড্রোজেন-হিলিয়াম প্রক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, কিন্তু সূর্যের ব্যাস ৪৬৪,০০০ মাইল, এই পুরু গ্যাসের আবরণ ভিতরের তেজ অনেকটা কমিয়ে দেয়। অন্যান্য অধিকাংশ তারার মত সূর্যবস্তুর তিন চতুর্থাংশের বেশী হাইড্রোজেন, প্রায় এক পঞ্চমাংশ হিলিয়াম। আরও অনেক রকম পরমাণুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া সম্ভব—পারমাণবিক বোমার ভিতরে ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণুর ছেদন ঘটে—কিন্তু উৎপন্ন তেজের হিসাবটা সূর্যের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম প্রক্রিয়ার সঙ্গে এত ভাল মেলে যে সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নেই।

এখানে মেঘনাদ সাহার গবেষণা উল্লেখযোগ্য। সৌর আবহে হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ক্যালসিয়ামের মত ভারী পদার্থের নিচে থাকে, তাঁর এক তত্ত্ব বলে সূর্য কিরণের চাপ ক্যালসিয়াম পরমাণুকে দূরে ঠেলে দেয়। আলোর যে চাপ আছে তা আমরা ধূমকেতুর প্রসঙ্গেও দেখব। সাহার আর এক তত্ত্ব অনুসারে তারার তাপে মৌলিক পদার্থ আয়নিত হয়; এর থেকে তারার আবহের রাসায়নিক উপাদান, তাপ ও ঘনতার তারতম্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়।

মানুষ শুধু তারা জঠরের তেজের খবরই আবিষ্কার করে নি, হাইড্রোজেনের ক্ষয়জনিত এই তেজ কাজে লাগিয়ে বোমা বানিয়েছে। অথচ মাত্র ১৯৩৪ সালে জীন্‌স লিখেছিলেন বস্তুর এই ভগ্নপরমাণু অবস্থা নিয়ে আমাদের গবেষণাগারে পরীক্ষা করা কোনও দিন সম্ভব হবে না, নির্গত তেজের অত্যধিক চাপ থেকে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই রকম বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্‌বাণী এ যুগে আরও কত মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে।

যাই হক, সূর্যের কেন্দ্রে বস্তুর ক্ষয়ে যে গামা তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে তা সমগ্র সৌর লোকের মারণ রশ্মি হয়ে দাঁড়াতে পারত, ভাগ্যক্রমে উপর স্তরের গ্যাস তার উগ্র তেজ অনেকটা হরণ করে নিচ্ছে। সেখানে পরমাণুরা এই তেজ শুষে নেয়, তার ফলে তাদের উত্তেজনা বাড়ে, কখনও কখনও তারা

ভেঙেও যায় ; না ভাঙলেও তাদের ইলেক্‌ট্রন কেন্দ্রনিকটবর্তী কক্ষ থেকে আরও দূর কক্ষে লাফ দেয় এবং আরও নানা রকম বিদ্যুৎ-চুম্বকী তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কখনও বা ইলেক্‌ট্রন পরমাণুর থেকে একেবারে বেরিয়ে যায়, তখন সৃষ্টি হয় এক্‌স বা রঞ্জন রশ্মি, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ৪০০ কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে ৪০,০০০ কোটি ভাগের এক ভাগ ; যখন লম্ফনের ফলে ইলেক্‌ট্রন দূর কক্ষে পৌঁছায় তখন তৈরি হয় অতিবেগনি আলো, আরও একটু কাছের কক্ষে গেলে দৃশ্যগোচর আলো—এদের তরঙ্গ যথাক্রমে দীর্ঘতর ; অতি ক্ষুদ্র লম্ফন থেকে হয় অবলোহিত বা তাপ রশ্মি, যার তরঙ্গ এক ইঞ্চির তিন কোটি ভাগের এক ভাগ থেকে চার লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ।

রঞ্জন ও অতিবেগনি রশ্মি যখন আবার বিভিন্ন পদার্থের ইলেক্‌ট্রনদের ঠেলাঠেলি করে তখন ইলেক্‌ট্রনদের সংখ্যা ও সাজ অনুযায়ী পরমাণুরা বিশেষ বিশেষ স্বকীয় আলো বিকিরণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের স্বাক্ষর থাকে এই আলোর রঙে বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে। পরমাণু যখন তেজ গ্রহণ বা শোষণ করে তখন ইলেক্‌ট্রন ভিতর থেকে বাইরের কক্ষে যায়, তখন সৌর অভ্যন্তরক্ষরিত জ্যোতির বর্ণালীতে কালো দাঁড়ি দেখা দেয় জায়গায় জায়গায়। তেজ যখন নিসৃত বা বিকীর্ণ হয় তখন ইলেক্‌ট্রন সরে আসে কেন্দ্রের দিকে, দেখা দেয় উজ্জ্বল দাঁড়ি। ইতিপূর্বে এই বিশোষণ ও বিকিরণ বর্ণালীর আলোচনা হয়েছে। পৃথিবী যে ৯২ মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি বর্ণালীর পরীক্ষায় তার ৬৬ পদার্থ সূর্যে চেনা গিয়েছে প্রায় ২৫,০০০ বিভিন্ন উত্তেজনার অবস্থায় ; তা ছাড়া লক্ষিত হয়েছে এই সব পদার্থের কয়েক শো আইসোটোপ *।

সূর্য যে পাক খাচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের গ্যাস সর্বত্র সমান জোরে ঘুরছে না ; সূর্যের আবর্তন কাল ২৫ দিন, ঐ সময়ে নিরক্ষ রেখার প্রান্ত এক বার ঘোরে, কিন্তু মেরুর কাছে উঁচু অক্ষাংশ (latitude) নেয় ৩৫ দিন। এই

* তৃতীয় অধ্যায়ে হাইড্রোজেন সম্পর্কে আইসোটোপ উল্লিখিত হয়েছে ; এরা একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপ, কেন্দ্রে নিউট্রনের সংখ্যা ভেদে এদের পারমাণবিক ভার আলাদা, কিন্তু এতে পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম কিছু বদলায় না।

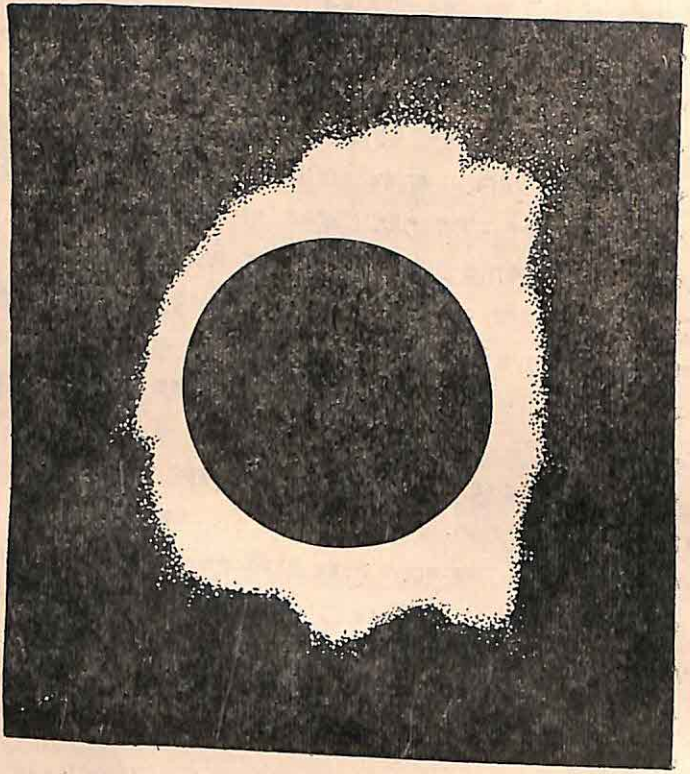
সবই সূর্যের সর্বব্যাপী অশান্তির পরিচায়ক।

সূর্যের বহির্ভাগে বিভিন্ন স্তর লক্ষিত হয়েছে, যথা আলোক মণ্ডল (photosphere), বর্ণ মণ্ডল (chromosphere) ও মুকুট (corona)। আলোক মণ্ডল ৪০,০০০ মাইল গভীর, তপ্ত গ্যাসের স্রোত তার উপরের দিকে ঠেলে ওঠে, দূরবিনে তাদের দানার মত দেখায় যদিও এক একটির ব্যাস হতে পারে ৫০০ মাইল পর্যন্ত ; এদের অধিকাংশই অভিকর্ষের টানে ফিরে আসে, কিন্তু কোনও কোনও অংশ বাইরের দিকে ছোটে, ঝরে পড়ার আগে এই নিক্ষিপ্ত গ্যাস ৩০০০ মাইল পর্যন্ত ওঠে। এই জলন্ত গ্যাসবিকীর্ণ অংশকে সূর্যের নিম্ন আবহ বলা চলে, লাল রঙের জন্য নাম দেওয়া হয়েছে বর্ণ মণ্ডল, গভীরতা ১০,০০০ মাইল ; এইখানে সূর্যের তেজ আরও মৃদু হয়ে পড়ে।

অবশ্য সূর্য তেজের যে অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাকে আরও বশ মানায় আমাদের বায়ু মণ্ডল, এমন কি তেজ-বর্ণালীর অল্প একটু অংশ ছাড়া সবই তা ছেঁকে নেয়। এত সত্ত্বেও সূর্যের এমনই প্রখর দীপ্তি যে তার দিকে তাকাতে গেলে গাঢ় রঙীন কাঁচ দিয়ে চোখ ঢাকতে হয়, নয় তো অন্ধতার আশঙ্কা। গ্যালিলিও যে বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়েছিলেন তাঁর ধারণা ছিল তা এই কারণে। সূর্য পর্যবেক্ষণের দূরবিনও আলাদা, তাতে তার প্রতিবিম্ব পরীক্ষা করা হয় এক পরদার গায়ে।

আলোক মণ্ডলের তাপ গড়ে ৫৫০০ ডিগ্রি, অর্থাৎ জঠরের ২৫০০ গুণ কম, তবু তা এত উষ্ণ যে মাত্র ১৮ রকম অণু বা সংযুক্ত পরমাণু সেখানে টিঁকে থাকতে পারে। তার মানে পরমাণুর আকর্ষণী শক্তি সাধারণত হার মানে এই তাপের বিচ্ছেদনী শক্তির কাছে, এমন কি অধিকাংশ পরমাণু এত উত্তেজিত যে তাদের অধিকাংশ কাল কাটে আয়নিত অবস্থায়, অর্থাৎ যে অবস্থায় পর ও অপর বিদ্যুতের স্বাভাবিক সমতা নষ্ট হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ইলেক্‌ট্রন স্বাধীন ভাবে উড়ে বেড়ায়, ফলে গড়ে ওঠে বৈদ্যুতিক বাত্যা।

সূর্যের উচ্চ আবহ বা মুকুট প্রায় বুধ গ্রহ পর্যন্ত (৩·৬ কোটি মাইল) বিস্তৃত, যেমন পৃথিবীর দূর আবহ চাঁদকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে গিয়েছে। মুকুটের দূর অংশ অবশ্য চোখে দেখা যায় না, দৃশ্যগোচর বড়জোর ছ ভাগের এক ভাগ ; হয়তো অস্থির বস্তুর এক সূক্ষ্ম কুয়াশা ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে সৌর



৬ নং চিত্র
পূর্ণ গ্রহণে সৌর মুকুট

লোকের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আগে পূর্ণ গ্রহণ ছাড়া মুকুটের দৃশ্যগোচর অংশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল না, অর্থাৎ কয়েক বছর পর পর মাত্র দু তিন মিনিট সময় পাওয়া যেত; ১৬৩০ সালে ফরাসী জ্যোতিষী বের্নার লিও দূরবিনের ভিতরে এক ছোট কালো চাকতি ঢুকিয়ে সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই সহজ উপায়ে যখন খুশি কৃত্রিম পূর্ণ গ্রহণ সৃষ্টি করে ধীরে সুস্থে সৌর মুকুটের পরীক্ষা সম্ভব হল।

কিন্তু সুবিধা মত পূর্ণ গ্রহণে গবেষণার বস্তু এখনও প্রচুর, এবং পেশাদার বিজ্ঞানী ছাড়াও অনেকে তখন মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। এই রকম একটি দেখা গিয়েছিল ১৯৭০ মার্চ মাসে মেক্সিকো থেকে, আমেরিকা

মহাদেশে এমন সুযোগ ৫৩ বছরে আর আসবে না। অনুসন্ধানে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, বিমান ইত্যাদি ব্যবহার হয়। পূর্ণ গ্রহণ খুব বিরল না হলেও প্রায়ই তা দেখা যায় দুর্গম জায়গা থেকে, নয়তো সূর্য থাকে দিগন্তের কাছাকাছি।

সূর্যের জঠর থেকে নির্গত নিউট্রিনো ও বিবিধ রশ্মির মত বর্ণ মণ্ডল ও মুকুট থেকে ক্রমাগত বিকীর্ণ হয় মহাজাগতিক রশ্মি, এবং তাও এক অপূরণীয় ক্ষতি। শূন্যে বিচরণ করতে করতে তারামধ্যবর্তী গ্যাস থেকে বস্তু সংগ্রহ করে সূর্য হয়তো কিছু নতুন ইন্ধনের সংস্থান করতে পারে, কিন্তু নিরন্তর যতখানি পুড়ছে তার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং বহু কোটি বছর আগে সূর্য যখন জ্বলতে শুরু করেছে তখন থেকেই এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এই বাতি এক দিন নিভবে, শক্তি ক্ষয় হতে হতে তার জরা আসবে।

চাঁদের মত সূর্যের গায়েও কলঙ্ক (sunspot) আছে, তবে সূর্য অস্থির উত্তপ্ত—তার কলঙ্কের উৎপত্তি বৈদ্যুতিক ও চুম্বকী বিক্ষোভে। সূর্যের উজ্জ্বল সাদা গায়ে এই সব কালো দাগগুলি ৫০০ থেকে ৫০,০০০ মাইল কি তারও বেশী বিস্তৃত। কোনও নিগূঢ় কারণে এদের শক্তি প্রতি ১১ বছরে বাড়ে কমে; এই চক্রের প্রথম দিকে এরা দেখা দেয় নিরক্ষ রেখার প্রায় ৩০ ডিগ্রি দূরে, শেষে দাগগুলি এসে পড়ে মাত্র আট ডিগ্রি দূরে। কোনও কোনও বছরে এদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। ক্ষুদ্রতম কলঙ্কগুলি টেঁকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা দিন, বড়গুলি তিন থেকে চার মাসের বেশী নয়। সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে এরা পুব থেকে পশ্চিমে সরে যায়, বড় এবং দীর্ঘায়ু কলঙ্কগুলি এক প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে পক্ষ কাল পরে অপর প্রান্তে দেখা দিতে পারে। এই রকম পরীক্ষার থেকেই গ্যালিলিও সূর্যের আবর্তন কাল অনুমান করেছিলেন প্রায় ২৬ দিন।

সূর্যকলঙ্ক বিপরীত চুম্বকধর্মী জোড়ায় জোড়ায় দেখা দেয়, অর্থাৎ যে আগে চলে সে যদি হয় পরধর্মী তো তার পিছনের সঙ্গী অপরধর্মী। ঘোড়ার খুরের মত যে চুম্বক হয় মনে করা যেতে পারে সেই রকম এক প্রকাণ্ড চুম্বক সূর্যের দেহে নিহিত, শুধু তার মাথা দুটি অর্থাৎ পর ও অপর মেরু ত্বকের কাছে এসে ঠেকেছে। এই ব্যবস্থা ১১ বছর বজায় থাকবে, সেই সময়ের

মধ্যে কলঙ্কের দল ধীরে ধীরে নিরক্ষ রেখার দিকে সরে আসবে, তার পর মিলিয়ে যাবে। আবার এক দল নতুন কলঙ্ক উচ্চ অক্ষাংশে দেখা দেবে, কিন্তু তখন তাদের চুম্বকী ধর্ম হবে বিপরীত; অর্থাৎ এ বার চুম্বকের অপর মেরু আগে চলবে, পর মেরু পিছনে, এবং এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে আরও ১১ বছর।

এ ছাড়া উত্তর গোলার্ধের বিপরীতধর্মী জুড়ি থাকে দক্ষিণ গোলার্ধে। ১৯৪০ সালে দুই দল সৌর কলঙ্ক নিরক্ষ রেখার ৩০ ডিগ্রি উত্তরে ও দক্ষিণে দেখা দেয়, উত্তরে পথিকৃৎ কলঙ্কের পর চুম্বকী ধর্ম, দক্ষিণে পথিকৃতের অপর ধর্ম। ১৯৫০ সালে তারা কাছাকাছি চলে আসে আট ডিগ্রি উত্তর দক্ষিণে, তার পর ক্রমশ যখন ক্ষীণ হতে আরম্ভ করে তখন আবার ৩০ ডিগ্রির কাছে দেখা দেয় উলটো দুই মেরু—উপরে আগে অপর, নিচে আগে পর; ১৯৬০ সালে আবার প্রায় ফিরে আসে ২০ বছর আগের অবস্থা। ২২ বছরের চক্রে সূর্যের সমগ্র চুম্বকী ক্ষেত্র উলটে যেতে পারে, অর্থাৎ চুম্বকী সুমেরু হয়ে পড়তে পারে কুমেরু, ভৌগোলিক সুমেরু হতে পারে চুম্বকী কুমেরু।

সৌর কলঙ্ক কালো দেখায় তার কারণ ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত শীতল—ত্বকের স্বাভাবিক তাপ ৫৫০০ ডিগ্রির তুলনায় তার তাপ ৪৬০০ ডিগ্রি। কেন্দ্রের গাঢ় প্রচ্ছায়া (umbra) অংশকে ঘিরে তার কিছু কম কালো ও বেশী গরম উপচ্ছায়া (penumbra) অংশ থাকে।

সূর্যের আভ্যন্তর বিক্ষোভের প্রতিফলন দেখা যায় শুধু কলঙ্কে নয়, নানা রকম উৎক্ষেপে (prominence)। জ্যোতিষীদের বিশ্বাস এগুলি ঘটে যখন ভিতরের স্পন্দনের ফলে অতি উত্তপ্ত গোলাপী লাল গ্যাস উপরের দিকে ঠেলে ওঠে, বাইরে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে হয়তো কয়েক লক্ষ মাইল বেগে—কখনও বা কিছু দূর গিয়ে যেন জ্বলে উঠে শিখা ফিরে আসে সূর্যে। সবচেয়ে ছোট উৎক্ষেপ হয়তো টেঁকে মোটে পাঁচ মিনিট এবং ওঠে মাত্র কয়েক হাজার মাইল; যে কোনও সময়ে এই রকম দৃশ্য সংখ্যায় ২০,০০০ পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু এর চেয়ে অনেক আশ্চর্য দৃশ্য হল গোল করে পাকানো বা ধনুকের মত বাঁকানো অতি উজ্জ্বল গ্যাসের স্রোত যা শূন্যে ঠেলে উঠতে পারে পাঁচ লক্ষ মাইল বা তারও বেশী, টিঁকতে পারে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা। অনেক সময়ে সৌর কলঙ্কের অদৃশ্য চুম্বকী শক্তিরেখা অনুসরণ করেই এইগুলি গড়ে ওঠে। লোহার গুঁড়ো যেমন চুম্বকের দুই মেরুর নির্দেশে নিজেদের সাজায় তেমনি গ্যাসের স্রোতও জোড়া সৌর কলঙ্কের সুমেরু কুমেরুর ঊর্ধ্বে আকাশে ঝুলতে পারে ; কখনও এক ধনুক ৩০,০০০ মাইল পর্যন্ত উঠে সেতু তৈরি করতে পারে ১২৫,০০০ মাইল জুড়ে। কিন্তু সব রকম উৎক্ষেপের সঙ্গে সৌর কলঙ্কের সম্পর্ক পাওয়া যায় না।

বহু সহস্র মাইল জোড়া গ্যাসের সেতু অনেক দিন শান্ত থেকে হয়তো হঠাৎ ফেটে পড়ে, তখন এত জোরে পরমাণু শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয় যে কখনও কখনও তারা সেকেন্ডে ৩৪৭ মাইল অতিক্রম করে সূর্যের অভিকর্ষীয় ক্ষেত্র ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে। অন্যান্য চুম্বকী উদ্‌গিরণের থেকে ঘূর্ণবাতের (tornado) সৃষ্টি হয় এবং হাইড্রোজেনের জ্বলন্ত জিহ্বা শূন্যে লক্ষাধিক মাইল লেহন করে। আয়নিত গ্যাস বা প্লাজ়মার এই সবচেয়ে বড় উৎসারণকে বলে সৌর শিখা (flare)। এই শ্রেণীর বিস্ফোরণ থেকে কিছু কিছু কণা পৃথিবী পর্যন্ত চলে আসে, উচ্চ আবহে গোলমাল পাকিয়ে ক্ষুদ্রতরঙ্গ বেতার বাণী মুছে দেয়। আবার এই সব কণাই পৃথিবীর বায়ু আয়নিত করে বানিয়েছে আয়ন মণ্ডল যা না থাকলে বেতার বাণী প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসত না, অর্থাৎ রেডিওই সম্ভব হত না। তা ছাড়া এরাই সৃষ্টি করে প্রকৃতির অতি আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য মেরুজ্যোতি (aurora)।

১৯৭২ অগাসটে সূর্য হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে ওঠে, তার সেই উৎক্ষেপের তেজ দিয়ে নাকি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শতাব্দী কাল বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটানো যায়। এই ঝঞ্ঝা ১১ বছরের নিয়ম ভঙ্গ করে মাত্র তিন বছর পর আসাতে বিশেষজ্ঞদের চোখে সূর্য আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালে মার্কিন স্কাইল্যাব যান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে করতে সূর্য সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছে। যদিও তখন ১১ বছরের চক্রে সূর্যের অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্তি, ছবিতে ধরা পড়েছে দুটি প্রকাণ্ড সৌর শিখা, তার একটি পৃথিবীর ব্যাসের ১৭ গুণ বড়। তা ছাড়া উৎক্ষেপের উদ্‌গিরণও দেখা গিয়েছে প্রতি দু সপ্তাহে একটি।

সৌর শিখা বা উৎক্ষেপ স্বাস্থ্যের হানি করে এমন ধারণা আছে

অনেকের মনে। সোভিয়েট রাশিয়ায় নাকি লক্ষিত হয়েছে যে এরা চরমে উঠলে ভূমিকম্প ও মহামারী বাড়ে, সুস্থ লোকের মধ্যে রক্তচাপ, হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য, স্নায়ুরোগ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি দেখা দেয়। তা ছাড়া, উদ্ভিদের, জন্তু জানোয়ারের, এমন কি জীবাণুর বৃদ্ধি হয়। আমাদের আবহাওয়ার উপর সৌর কলঙ্কের প্রভাব আছে অনেক জ্যোতিষীরই এমন বিশ্বাস। কিছু প্রমাণ নাকি পাওয়া গিয়েছে যে ১১ বছরের চক্রে তাপ ও বারিপাত বদলায়—কলঙ্ক বাড়লে গ্রীষ্ম বেশী গরম হয়, বৃষ্টি কম পড়ে, কমলে হয় উলটো। এ সব যদি সত্য হয় তো অন্তত একটি জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য কিছুটা যুক্ত।

সৌর লোকের সৃষ্টি সম্বন্ধে অল্প কাল আগেও যে ধারণা প্রচলিত ছিল আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। জেম্‌স জীন্‌স বলতেন এবং অধিকাংশ জ্যোতিষী বিশ্বাস করতেন যে অন্য কোনও তারা আকাশ পথে চলতে চলতে হঠাৎ সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে মহাকর্ষের টানে তার থেকে কিছু কিছু বস্তু ছিনিয়ে নিয়েছে, পরে এই গ্যাস জমে তৈরি হয়েছে গ্রহ কুল। ১৯৩০ দশকের প্রথম দিকে এই তত্ত্ব অচল হয়ে পড়ে। পরে বৈজ্ঞানিক চিন্তা উষ্ণ সৌর গ্যাস থেকে গ্রহের উৎপত্তির ধারণাই বর্জন করল, এবং ১৯৪৩ সালে নতুন পথ দেখালেন জারমেনির হ্বাইৎসেকার ও রাশিয়ার ও জে শ্‌মিড; হ্বাইৎসেকার শুরু করলেন শীতল গ্যাস ও ধূলির মেঘে ঢাকা সূর্য দিয়ে, শ্‌মিড অনুমান করলেন সূর্য তারামধ্যবর্তী সূক্ষ্ম মেঘ থেকে কঠিন বস্তু ও কণার পুঞ্জ সংগ্রহ করেছে। পরে আমেরিকার কুইপার ও উরে, ইংলন্‌ডের হয়েল ইত্যাদি এই সব 'শীতল সংগ্রহ' (cold accretion) তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ প্রস্তাব করেন। আজ প্রায় সকলেই একমত যে সূর্য ও তার গ্রহ পরিবার একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে এবং গ্রহের জন্ম কোনও দুঃসম্ভব আকস্মিক ঘটনা নয়।

এ সম্বন্ধে ১৯৫০ দশকে জেরার্ড কুইপার যে তত্ত্ব প্রস্তাব করেন তা আজ অনেকেই গ্রহণ করেছেন। এই মত অনুসারে সূর্য ও তার পরিবারের জন্ম হয়েছিল প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে। আজ এই নীহারিকার তারাদের ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার গ্যাস ও ধূলি কণার চলাচল সূর্য লোকের

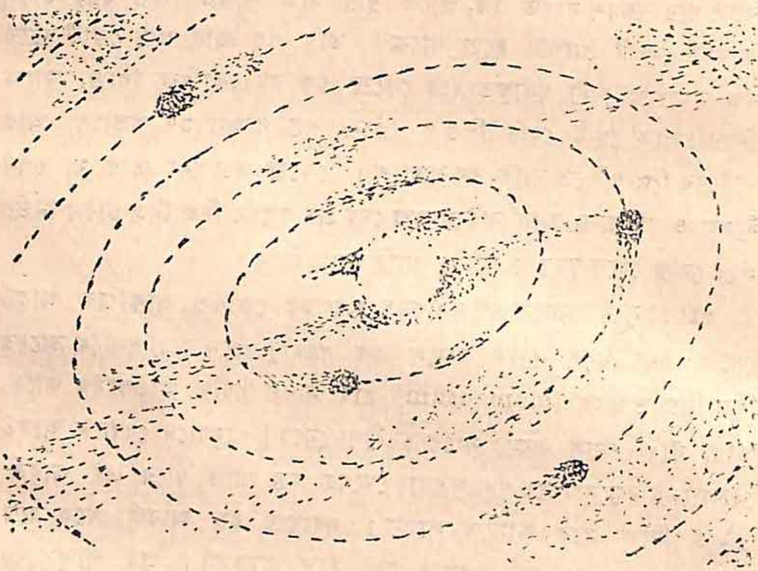
উপাদানও ছিল প্রায় সেই রকমই, তার সর্বত্র ঘুর্ণি ও আবর্ত, তা প্রায় সর্বাংশে বিশ্বের আদি হাইড্রোজেন, যদিও সূর্যের চেয়েও প্রাচীন তারাদের মধ্যে অবপারমাণবিক রূপান্তরের ফলে যে অন্যান্য মৌলিক পদার্থ তৈরি হয়েছে তাও কিছু ছিল এই গ্যাসে। আজ সৌর জগতের যতখানি বিস্তৃতি গ্যাস ও ধূলির এই আদি মেঘ তত দূর প্রসারিত ছিল।

জ্যোতিষপদার্থবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে এই রকম গ্যাসীয় মেঘ সম্পূর্ণ স্থির নয়, তাতে সর্বদা কিছু চলাফেরা ও অনির্দিষ্ট ঘূর্ণি গতি থাকে। এর ফলে অণুর পারস্পরিক মহাকর্ষীয় টানে এই অতি সূক্ষ্ম মেঘ অনেক কাল ধরে ক্রমশ সংহত হয়, তাতে ঘুর্ণি গতি আরও স্পষ্ট হয়, তাতে আবার মেঘটি চ্যাপটা হতে থাকে। তার পর প্রায় আট কোটি বছরে বস্তু সবচেয়ে বেশী ঘনীভূত হবে কেন্দ্রে এক বা একাধিক পিণ্ডে, তাকে ঘিরে চলবে ছোট ছোট পিণ্ড। কেন্দ্রে বস্তু থাকল ৯০ শতাংশ, আর বাইরের পিণ্ডগুলিতে বাকি দশ শতাংশ। কেন্দ্রে জন্ম নেয় তারা যা তখন শীতল ও অনুজ্জ্বল, আর বাইরে জন্ম নেয় গ্রহ যাদের নিজ নিজ চরিত্র নির্ভর করে কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ও স্থানীয় আদি বস্তুর উপর।

হয়তো সূর্যের গ্যাসে এই ঘনীকরণ শুরু হয় কোনও আকস্মিক আবর্ত থেকে; এর ফলে একই অঞ্চলে এত পরমাণু এসে জমা হল যে তাদের নিজ নিজ ভরবেগ (momentum) হার মানল যৌথ অভিকর্ষের কাছে, তারা বাঁধা পড়ল একই সংকোচনশীল মেঘে। যেখানে যেখানে আবর্ত সেইখানেই বস্তু সবচেয়ে ঘন, সুতরাং মেঘের বস্তু অতি ধীরে এই আবর্ত-গুলির দিকে সরে আসতে লাগল। সবচেয়ে বড় আবর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে সূর্য, তাকে সেই অবস্থায় বলা চলে প্রাক্‌সূর্য। এই প্রাক্‌সূর্যের সর্বজয়ী অভিকর্ষের প্রভাবে মেঘের বাকি অংশ হয়ে পড়ল প্রকাণ্ড এক ঘূর্ণমান থালা। এ ছাড়া আর প্রতিটি অভিকর্ষীয় সংকোচনের ফলেও থালার চক্রগতি বাড়ল, এই রকম প্রতিটি বৃদ্ধির ফলে থালা আরও চ্যাপটা হয়ে পড়ল।

থালার মধ্যে অণু পরমাণুর সংঘর্ষ ক্রমে তাদের পাগলা গতি বশে আনল এবং সংঘর্ষজনিত তাপ ছড়িয়ে পড়ল শূন্যে। এই ভাবে কমল মেঘের বিবিধ আভ্যন্তর গতির শক্তি এবং ক্রমে আদিম বস্তুকণাগুলি বশ মেনে নিয়মানুগ

হয়ে ঘুরতে থাকল প্রাক্‌সূর্য ও ক্ষুদ্রতর আবর্তগুলিকে ঘিরে। এই ছোট আবর্তগুলিকে বলা চলে প্রাক্‌গ্রহ, তারা অলস ভাবে ঘুরছিল পরস্পরের চার পাশে, ক্রমে তাদেরও আভ্যন্তর গতি নিয়ন্ত্রিত হল, তারা সংকুচিত হতে লাগল। বহু লক্ষ বছর ধরে ভারী বস্তুগুলি সবচেয়ে আগে দানা বাঁধল এবং জড়ো হতে থাকল কেন্দ্রের দিকে, বাইরে থাকল প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। বর্তমান গ্রহগুলির তুলনায় প্রাক্‌গ্রহগুলি অনেক ভারী ও বড় ছিল, ভারী পৃথিবীর ওজন ছিল সম্ভবত এখনকার ৫০০ গুণ এবং ব্যাস ২০০০ গুণ।



৭ নং চিত্র
সৌর পরিবারের সৃষ্টি

ইতিমধ্যে সংকোচনরত প্রাক্‌সূর্যের মধ্যে বাইরের পরমাণু আছাড় খেয়ে পড়ার ফলে তার ভিতরে তাপ সৃষ্টি হচ্ছিল, এবং যে অনুপাতে তাপ জমে উঠছিল সেই অনুপাতে তা বিকীর্ণ হতে পারছিল না। সুতরাং প্রাক্‌সূর্যের কেন্দ্রে তাপ ধীরে ধীরে বাড়ল, বাড়তে বাড়তে তা যখন দশ লক্ষ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেল, তখন ভারী ও লঘু হাইড্রোজেন আইসোটোপের মধ্যে

পরমাণুকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ার ফলে আরও অনেকটা শক্তি যোগ হল সংকোচন-জনিত তাপের সঙ্গে, সূর্যের ত্বক প্রথমে লাল, তার পর কমলা, তার পর হলুদ রং ধারণ করল—সে পেল দীপ্তি। প্রথম লাল রশ্মি ও আয়নের উষ্ণ স্রোত অর্ধজাত গ্রহগুলির উপর পড়ে তাড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল আবরণী বস্তুর ধোঁয়া—যে বস্তুর থেকে তাদের জন্ম এবং যার থেকে তারা তখনও গড়ে উঠছে। দেখতে দেখতে প্রাক্‌গ্রহগুলি পারস্পরিক পরিক্রম বন্ধ করে লাভ করল স্বাধীন প্রদক্ষিণ গতি।

সৃষ্টির কুয়াশা দূর হলে দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক কোটি বছর পরে সবচেয়ে ভিতরকার গ্রহগুলির বাইরের গ্যাস মণ্ডল থেকে লঘু পদার্থগুলি পালিয়ে গেল, পড়ে থাকল ইতিমধ্যে যা কঠিন হয়ে জমে গিয়েছে, প্রধানত লৌহবস্তু ও পাথর, এবং তাদের যা মধ্যে ধরা পড়েছে এমন কিছুটা তরল পদার্থ ও গ্যাস। বুধ (Mercury) ও মঙ্গল (Mars) জমছিল আদি মেঘের হালকা অঞ্চলে, তাদের মধ্যে কঠিন অষ্ঠি অল্প থাকাতে তারা হল ছোট গ্রহ, বেশী বস্তু জমিয়েছে বলে পৃথিবী ও শুক্র (Venus) হল অপেক্ষাকৃত বড়। মঙ্গলের পরে আছে বহু ক্ষুদ্র গ্রহ বা গ্রহাণুর ঘন পুঞ্জ—এরা এক হয়ে জুড়ে যাওয়ার সময় পায় নি, থেকে গিয়েছে পৃথক বস্তু পিণ্ড চির কালের মত (আমরা পরে দেখব গ্রহাণুদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন মতও আছে)। গ্রহাণু পুঞ্জের অঞ্চল পেরিয়ে আছে বড় বড় গ্রহ বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস ও নেপ্‌চুন, তাদের মধ্যে আদি মেঘের লঘু অংশ (হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন বা আলেয়া গ্যাস (methane)) অনেকখানি বর্তমান, কারণ তরুণ সূর্যের রশ্মি অত দূরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

নেপ্‌চুনের ও পারে সূর্যের মহাকর্ষ ক্ষীণ বলে আদি মেঘ অতখানি চ্যাপটা হয় নি এবং তার গতিও অতটা নিয়মানুগ হয় নি। সূর্যের বহির্গামী আলো যখন মেঘের বহিরাঞ্চল থেকে অবশিষ্ট গ্যাস তাড়িয়ে দিল তখন লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিণ্ড থেকে গেল ; এদের মহাকর্ষ এত প্রবল নয় যে কঠিন গোলক রূপে জমে যেতে পারে, আবার তা এত দুর্বলও নয় যে ক্ষীণ সূর্যালোকের ধাক্কায় সৌর লোক থেকে একেবারে বেরিয়ে যাবে। এই ধূমকেতুরা আজও সেইখানেই আছে, চলছে আদি কক্ষ পথে, এদের ঢিলে বরফ-ভরা

দেহ থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই সৌর লোক একেবারে প্রথম দিকে কি ভাবে দানা বেঁধেছিল। আজ এদের কেউ যখন সূর্যের কাছে আসতে আসতে উবে-যাওয়া গ্যাসের পুচ্ছ সৃষ্টি করে তখন তা আদি কালেরই এক ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি; নবীন সূর্য যখন প্রাক্‌গ্রহদের গ্যাসীয় বহিরাবরণ দূর করছিল তখন এই রকমই ছিল তাদের চেহারা।

গ্যাস ও ধূলির থেকে দানা বাঁধতে সূর্যের দশ কোটি বছর কেটে গেল। প্রথম উষায় কয়েকটি প্রাক্‌গ্রহের বিবর্তন ছিল অসম্পূর্ণ, তাদের পরিবেষ্টনের মধ্যে কিছু কিছু আবর্ত থেকে গিয়েছে, বস্তু যা কিছু জমে কঠিন হয়েছে তার সংগ্রহও সম্পূর্ণ হয় নি। প্রাক্‌গ্রহদের অধিকাংশ গ্যাস যে সময়ে শূন্যে পালিয়ে গেল সেই সময়ে এরাও হারাল বাইরের খণ্ডগুলিকে টেনে আনার অভিকর্ষীয় শক্তি। এই পরিত্যক্ত অবগ্রহগুলি হয় হয়ে পড়ল উপগ্রহ, নয়তো স্বাধীন কক্ষে দূরে সরে গেল।

কুইপারের প্রস্তাবিত এই প্রকল্প এখনও অনেকটা আনুমানিক। তাঁর মতে আদি মেঘের বাষ্পীকরণ যখন চলছিল তখন প্রাক্‌গ্রহ ও সূর্যের মধ্যবর্তী গ্যাস আয়নিত হয়ে পড়ে এবং এই বিদ্যুৎধর্ম পেয়ে তারা সূর্যের চুম্বকী শক্তির সেতু হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ যেন কয়েকটি সমকেন্দ্রিক বিশাল ঘূর্ণমান চাকার নাভিতে আছে সূর্য, ধারে ধারে প্রাক্‌গ্রহ, আর সূর্যের সঙ্গে তাদের যোগ স্থাপন করেছে আয়নিত গ্যাসের স্থিতিস্থাপক (elastic) পাকি। এই পাকির ভিতর দিয়ে সূর্য আবর্তনী শক্তি ত্যাগ করল, ঘুরতে লাগল আরও ধীরে; পক্ষান্তরে আদি মেঘের পলাতক কুয়াশা শক্তি সঞ্চয় করল, এবং আরও দ্রুত বেগে পাকিয়ে পাকিয়ে বাইরের দিকে চলল। গ্রহদেরও দ্রুতি বাড়ল এবং তাদের মেরু হেলে পড়ল প্রায় আজ যতখানি দেখা যায় ততখানি; এই ঝোঁকার কারণ এই যে সূর্য সর্বদা একই দিকে বসে তাদের হালকা বস্তু বাষ্পীকৃত করছে মধ্য অঞ্চল থেকে।

প্রথম সূর্যালোক ছিল খুবই ক্ষীণ কারণ সূর্য তখনও সংকোচনরত এবং কেন্দ্রের অবপারমাণবিক ইন্ধন ছিল আজকের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা, কম ঘন। সংকোচন শেষ হতে লাগল প্রায় আট কোটি বছর, তখন সৌর তেজ বর্তমান মাত্রার ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেল, ফলে আদি মেঘের শেষটুকু পর্যন্ত বিতাড়িত হয়ে গ্রহরা পড়ে রইল শুধু, একা একা আপন ভাগ্য গড়ে

তুলল তারা। প্রথম দশ কোটি বছরে ছটি হারানো উপগ্রহ বিপরীতমুখী কক্ষ পথে তাদের প্রাক্তন গ্রহদের কাছে আবার ধরা পড়ল, যেমন নেপ্‌চুন গ্রহের ট্রাইটন উপগ্রহ। তার পরে কতগুলি গ্রহাণু ধাক্কা খেয়ে বৃহস্পতি, পৃথিবী, চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের পেটে ঢুকেছে। কিছু কিছু আবদ্ধ গ্যাস ও তরল বস্তু বেরিয়ে এসে আবহের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। এই সব ছোট খাটো পরিবর্তন সত্ত্বেও সূর্যের পরিবার যেমন সৃষ্টি হয়েছিল মোটামুটি তাই থেকে গিয়েছে। (ইংরেজ জ্যোতিষী ফার্সফের হিসাবে বর্তমান সৌর জগতের ৭২ শতাংশ হাইড্রোজেন, ২৬ শতাংশ হিলিয়াম, বাকি দুই শতাংশ অন্যান্য পদার্থ।)

বর্তমান সৌর লোকের অনেক বিষয়ে তার উৎপত্তির এই সাধারণ পরিকল্পনার সমর্থন আমরা পাই। সূর্য থেকে গ্রহগুলির দূরত্ব শুধু যে নিয়মানুগ তাই নয়, সবগুলিরই কক্ষ সৌর নিরক্ষ রেখার সমক্ষেত্রের কয়েক ডিগ্রির মধ্যে অবস্থিত, সবচেয়ে বেশী তফাতে আছে দূরতম গ্রহ প্লুটো (১৭ ডিগ্রি); কিন্তু প্লুটো হয়তো আদি ও অকৃত্রিম গ্রহ নাও হতে পারে, তাকে অনেকে নেপ্‌চুনের পলাতক উপগ্রহ বলে সন্দেহ করেন। তা ছাড়া সূর্য যে দিকে পাক খায়, সব গ্রহই সেই দিকে তাকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের উত্তর মেরুর উপর থেকে দেখলে এই গতি দক্ষিণ থেকে বামে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে। গ্রহদের স্বকীয় পাক বা আবর্তনও সেই দিকে, এক শুক্র ও ইউরেনাস ছাড়া। অধিকাংশ উপগ্রহেরও আবর্তন ও প্রদক্ষিণ গতি এই একই দিকে! বিপরীতমুখী অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বরাবর আবর্তন বা প্রদক্ষিণকে বলা হয় প্রতীপ (retrograde) গতি।

অবশ্য অনেকে নিজের মত অনুসারে কুইপার তত্ত্বে জোড়াতাড়া দিয়েছেন। যথা, হয়েল ও বিক্রমসিংহ বলেন গ্রহগুলি প্রথম থেকেই উষ্ণ ছিল, পরে তাতে নি এবং তাপ এসেছে মহাকর্ষের টানে আদি গ্যাসের সংকোচন থেকে; তবে গ্যাসীয় চক্রের প্রান্ত দেশ অর্থাৎ ইউরেনাস ও নেপ্‌চুনের অঞ্চল ছিল শীতল। বিশিষ্ট সোভিয়েট জীববিৎ ওপারিন তাঁর 'প্রাণের উদ্ভব' বইতে লিখেছেন শীতল পৃথিবীর তাপ পরে বেড়েছে আভ্যন্তর তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় থেকে যখন সূর্য জ্বলতে শুরু করে এই গ্রহটির হালকা গ্যাস তাড়িয়ে দিল। আর প্রাক্‌সূর্যের তাপ ছিল চরম

শূন্যের কাছাকাছি (চরম শূন্য -২৭৩ ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড, তার বেশী শৈতল্য অসম্ভব)। হাজার ডিগ্রি কি তারও বেশী তাপ উঠলে পৃথিবীর কঠিন বস্তু গলে গেল, ভারী লৌহযুক্ত অংশ ডুবে গেল গর্ভের দিকে, হালকা সিলিকেট ইত্যাদি উঠল উপরে।

সৌর লোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাক্তন প্রকল্পগুলির অধিকাংশই গাণিতিক পরীক্ষায় পাশ হতে পারে নি। এই পরীক্ষার এক বড় সমস্যা কৌণিক ভরবেগ (angular momentum) নিয়ে, যার ফলে সূর্যের ঘূর্ণন এবং গ্রহদের আবর্তন। যদিও সৌর লোকের সমগ্র বস্তুর প্রায় ৯৯.৯ শতাংশ আছে সূর্যে তথাপি সমগ্র কৌণিক ভরবেগের মাত্র দুই শতাংশ আছে তার মধ্যে। যে তত্ত্ব এই আপাত অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করতে পারে না তা প্রথম থেকেই বাতিল। কুইপারের পরিকল্পনায় এই পার্থক্যে কোনও গাণিতিক অসঙ্গতি নেই।

মার্টিন শোআর্জচাইল্‌ড ও অ্যালান স্যান্‌ডেজ প্রমুখ জ্যোতিষীরা সূর্যের ভবিষ্যৎটাও হিসাব করেছেন। সে যদি আজকের মত সেকেন্‌ডে শুধু ৬৫.৭০ কোটি টন হাইড্রোজেন খরচ করে যায়, তবে আরও ৫০০০ কোটি বছর কি তারও বেশী কাল সে জ্বলবে। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে তারারা ক্রমে বেহিসাবী খরচের পথে এসে পড়ে, যে যত গুরুভার সে তা হয় তত দ্রুত। সূর্য মাঝারি ওজনের তারা, তার যত কাল কেটে গিয়েছে আরও তত কাল অর্থাৎ ৫০০ কোটি বছরে তার আয়তন ও তাপে পরিবর্তন শুরু হবে। কারণটা অবশ্য এই যে কেন্দ্রে পারমাণবিক ছাই জমতে জমতে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম প্রক্রিয়া ছাড়াও কারবন সৃষ্টি ইত্যাদি অন্যান্য প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে, জঠরের অবপারমাণবিক চুলা ক্রমেই জ্বলবে উষ্ণতর হয়ে।

তখন সূর্যের দেহ ফুলে উঠবে বহু গুণ, ফলে তার ত্বক ঠাণ্ডা হবে এবং প্রথমে কমলা, পরে আবার তরুণ বয়সের মত লাল রং ধারণ করবে সে। কিন্তু আলোক মণ্ডলের প্রতি বর্গ মাইল আগের চেয়ে কম তেজ বিকিরণ করলেও বর্গ মাইলের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যাওয়াতে মোট বিকীর্ণ তেজও অনেকটা বেশী হবে। এই লাল দানবের আওতায় পড়ে বুধ পুড়বে, শুক্র

ভাজা হবে, পৃথিবীর সাগর নদী টগবগ করে ফুটে দেখতে দেখতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সীসা গলবে ঝোলা গুড়ের মত। হিসাবে বলে প্রায় ১০০ কোটি বছরে বসুন্ধরার গড় তাপ ৫০০ ডিগ্রির কাছাকাছি উঠে যাবে। কিন্তু কে জানে—তত দিনে হয়তো আমাদের বংশধররা এই ভীষণ তেজ আটকাবার কোনও ব্যবস্থা উদ্‌ভাবন করে ফেলবে। নতুবা লাল দানবের নির্দয় উষ্মায় পৃথিবী হবে প্রাণশূন্য—অবশ্য এখানে আমরা অনুমান করছি যে তার আগে মানুষ আত্মঘাতে বা প্রকৃতির খেয়ালে নিশ্চিহ্ন হবে না।

মানুষের কপালে যাই থাক, সূর্য অনুসরণ করবে তার নিজের ভাগ্য। তার এই তেজ ও তাপ বিতরণী উদারতা খুব বেশী দিন টিঁকবে না ; প্রায় ২০০ কোটি বছর পরে সৌর জগতের অধিকাংশ স্থানের অধিকারী স্ফীত সূর্য আবার সংকুচিত হতে আরম্ভ করবে। তাতে হয়তো ঘটবে কিছু বিক্ষোভ কিছু উৎক্ষেপ, ফলে অবশিষ্ট দূর গ্রহগুলি ধ্বংসকারী গামা রশ্মিতে সিঞ্চিত হতে পারে। সূর্যের দেহ যেমন হবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তার জঠরের অবপারমাণবিক অগ্নি নিভে যাবে, যেটুকু জ্যোতি তখনও থাকবে তা আসবে শুধু সংকোচনজাত অভিকর্ষীয় চাপ থেকে। ক্রমে সূর্য হয়ে পড়বে পৃথিবীর চেয়েও ছোট, এই শ্বেত বামনের গ্যাসীয় ঘনতা এত বাড়বে যে এক বালতির ওজন হবে একটি যুদ্ধজাহাজের চেয়েও বেশী। কয়েক সহস্র কোটি বছর ধরে সে ঠাণ্ডা হবে শুধু অল্প স্বল্প অবলোহিত রশ্মি বিকীর্ণ করে। অবশেষে আরও ৫০০০ কোটি বছরে স্থবির দেউলে সূর্য সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে দূর মহাকাশের হিম আঁধারে, আজকের এই প্রকাণ্ড, দীপ্ত, দৃপ্ত জ্যোতিষ্কের কোনও চিহ্নই থাকবে না আকাশে!

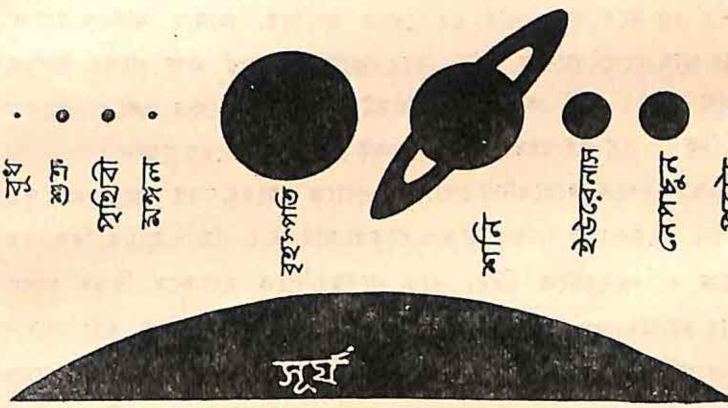
৮। সৌর পরিবার

সূর্য এবং তার পরিবার বিশ্বের তুলনায় সব বিষয়ে অতি নগণ্য হলেও কাছের থেকে দেখলে তার মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্য এবং পৃথিবীবাসীর চোখে তার বিশাল বিস্তৃতি। সৌর লোক আয়তনে পৃথিবীর কোটি কোটি গুণ বড়, তার মধ্যে আছে নয় গ্রহ, ৩২ উপগ্রহ, প্রায় ৩০,০০০ গ্রহাণু, প্রায় ১০,০০০ কোটি ধূমকেতু, এবং তা ছাড়া অসংখ্য ধূলি কণা, গ্যাসের অণু ও বিচ্ছিন্ন পরমাণু। সৌর লোকের ৯৯·৮৭ শতাংশ বস্তু একলা সূর্যের দেহে, বাকি বস্তুর এক শতাংশেরও কম আছে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে। মহাকাশ পরিভ্রমণ চির কাল না হলেও বহু কাল সৌর লোকের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং সেই বিবেচনার থেকেও এই গ্রহ উপগ্রহ গ্রহাণুর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় করা দরকার।

পৃথিবী ছাড়া এই নব গ্রহের পাঁচটির সঙ্গে পুরা কালের লোকের পরিচয় ছিল। খালি চোখে দেখতে তারার মত এই জ্যোতিষ্কগুলির স্থান ও গতি অস্থির ও অনিশ্চিত ঠেকত বলে এই আকাশদর্শীরা তাদের বলত অস্থির তারা। ইংরেজি প্ল্যানেট শব্দ এসেছে গ্রীসীয় প্লানেটাই থেকে, তার অর্থ যাযাবর। আজ অবশ্য আমরা জানি তারার তুলনায় গ্রহ অনেক ক্ষুদ্র, শীতল ও নিকট, এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, নিকট বলেই এদের এই গতি এতখানি প্রতীয়মান।

প্রদক্ষিণের কক্ষ উপবৃত্ত হলেও তা সাধারণত বৃত্তাকারের এত কাছাকাছি যে এই কাগজে আঁকলে পথটা বৃত্তই মনে হবে, যদিও সূর্য যে ঠিক কেন্দ্রে নেই তা ধরা পড়বে চোখে। এই কক্ষ পথ ঠিক সূর্যের নিরক্ষ রেখার সমক্ষেত্রে অবস্থিত নয়, অর্থাৎ গ্রহরা এই ক্ষেত্র ছেড়ে সামান্য ওঠানামা করে। দূরতম গ্রহ প্লুটো ছাড়া এই বিচ্যুতি পৃথিবীরই সর্বাধিক—১৪ ডিগ্রি সৌর অক্ষাংশেরও বেশী। সুতরাং পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অন্যান্য গ্রহের কক্ষও আমরা দেখি সামান্য উপর বা নিচ থেকে।

এই প্লুটো নানা ব্যাপারে একটু খাপছাড়া, তাকে বাদ দিলে গ্রহদের ভাগ করা চলে দুই শ্রেণীতে। নিকট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও তাদের বস্তু প্রধানত কঠিন ; তাদের পরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপ্‌চুন বিশালাকৃতি এবং তাদের দেহে গ্যাসের পরিমাণ বেশী। এ সব বিষয়ে প্লুটো অনেকটা বুধ গ্রহের সামিল, কি করে দানবের দলে এই বামনের স্থান হল সে আলোচনা পরে। ঠিক মাঝখানে পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতি সবচেয়ে বড়, সহস্রাধিক পৃথিবীকে সে গিলতে পারে। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে অনেকখানি ফাঁক, সেইখানে আছে বহু সহস্র গ্রহাণুর পুঞ্জ।



৮ নং চিত্র

সূর্য ও তার গ্রহদের আপেক্ষিক আয়তন

গ্রহদের মাঝখানে কি রকম ফাঁক এবং সূর্য থেকে তারা কতখানি দূরে তার আন্দাজ করা যেতে পারে যে কোনও একটিকে আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এনে। যথা, নিকটতম গ্রহ বুধ যদি হয় সূর্যের ২০ ফুট দূরে তো পৃথিবী থাকবে ৫০ ফুট এবং প্লুটো প্রায় আধ মাইল তফাতে ; এই ক্ষুদ্র মাপকাঠিতেও নিকটতম তারার স্থান ৩০০০ মাইল দূরে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯·৩ কোটি মাইল, এর থেকে সৌর পরিবারের ছবিটা আমরা মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারি।

যে গ্রহ সূর্যের যত দূরে তার কক্ষ পথ অবশ্য তত বড়, উপরন্তু সে তত মন্থরগতি, সুতরাং তার বর্ষ কালও সেই অনুপাতে বাড়ে। বুধ চলে ঘণ্টায় ১১০,০০০ মাইল বেগে, পৃথিবী ও প্লুটো যথাক্রমে ৬৭,০০০ ও ১০,০০০ মাইল বেগে। যেমন আগে বলেছি, ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে উপর থেকে দেখলে সকলেরই গতি তার বিপরীতমুখী। এই প্রদক্ষিণ গতি ছাড়া সকলেরই অবশ্য স্বাবর্তন গতি আছে, যার দ্বারা দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য নির্ধারিত। যদি কেউ বছরে এক বার শুধু নিজের অক্ষ ঘিরে পাক খায় তবে তার দিবস ও বৎসর সমান। বুধ, শুক্র ও সম্ভবত প্লুটো ছাড়া সব গ্রহেরই উপগ্রহ বা চাঁদ আছে, এদের অধিকাংশই বাধ্য ছেলের মত প্রদক্ষিণ করে গ্রহের স্বাবর্তন গতির দিকে মুখ করে। ধূমকেতু কখনও বহু দূরে চলে যায় গ্রহ লোক ছাড়িয়ে, আবার কখনও হয়তো সূর্যের প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, তার কারণ তাদের কক্ষ পথের উপবৃত্ত অত্যন্ত লম্বা। এই কক্ষ পথও প্রায়ই গ্রহদের সমক্ষেত্র থেকে অনেক উঁচু নিচু। তবু এই ছন্নছাড়ার দল একই সৌর পরিবারের সন্তান।

১৭৭০ দশকে জারমেনির জ্যোতিষী বোডে গ্রহদের দূরত্ব সম্বন্ধে এক সূত্র প্রবর্তন করেন যার ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নি। তিনি সূর্যের নিকটতম গ্রহকে ০, পরেরটিকে তিন, তার পরেরগুলিকে যথাক্রমে দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ ছয়, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ এবং ১৯২ নির্ধারণ করে দেন এবং বলেন এই সংখ্যাগুলির সঙ্গে চার যোগ করে দশ দিয়ে ভাগ করলে তাদের দূরত্ব পাওয়া যাবে। গ্রহের দূরত্ব মাপতে যে জ্যোতিষীয় মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় তাতে সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধান, অর্থাৎ ৯·৩ কোটি মাইল, হল এক। দেখা গেল প্রকৃত দূরত্বের সঙ্গে উপরোক্ত ভাগফল সত্যিই প্রায় হুবহু মিলে যায়। বোডের সময়ে ২৪ ও ১৯২ স্থানে কোনও গ্রহ জানা ছিল না, কিন্তু পরে গ্রহাণুরা ২৪ নম্বর স্থান হুবহু অধিকার করলে, এবং ১৭৮১ সালে ইউরেনাস আবিষ্কারের পরে সেও ১৯২ স্থানে বেশ মিলে গেল; তবে দূর নেপ্‌চুন এবং বিশেষত প্লুটোর বেলায় বোডের সূত্র অনেকটা বেমিল। অনেকে বলেন এই সূত্রের কোনও তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই, মিল সম্পূর্ণ আকস্মিক, কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা বিজ্ঞান জগতের বৃহত্তম রহস্যের অন্যতম। তত্ত্বলব্ধ ও পরীক্ষালব্ধ সংখ্যাগুলি নিচে দেওয়া হল, এবং সেই সঙ্গে গ্রহদের ভর ও

ঘনতা, যার থেকে তাদের আয়তনের আন্দাজ পাওয়া যাবে। তুলনার সুবিধার জন্য এখানে পৃথিবীকে এক ধরা হয়েছে।

	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (পৃথিবী = ১)		ভর	গড় ঘনতা
	পরীক্ষালব্ধ	বোডের সূত্রানুযায়ী	(পৃথিবী = ১)	(পৃথিবী = ১)
ছোট গ্রহ : বুধ	০'৩৯	০'৪	০'০৫৭	১ ?
শুক্র	০'৭২	০'৭	০'৮২	০'৯২
পৃথিবী	১'০০	১'০	১	১
মঙ্গল	১'৫২	১'৬	০'১০৭	০'৭১
গ্রহাণু	বিভিন্ন			
	প্রায় ২'৮	২'৮	অল্প	—
বড় গ্রহ : বৃহস্পতি	৫'২০	৫'২	৩১৮'৪	০'২৪
শনি	৯'৫৪	১০'০	৯৫'৩	০'১৩
ইউরেনাস	১৯'১৯	১৯'৬	১৪'৬	০'২৫
নেপচুন	৩০'০৭	৩৮'৮	১৭'৩	০'৪
ছোট গ্রহ : প্লুটো	৩৯'৫২	৭৭'২	?	?

এই বার এদের প্রত্যেকের পৃথক পরিচয় দরকার।

সূর্যের সবচেয়ে কাছে ভাল্‌কান নামে এক গ্রহ কেউ কেউ কল্পনা করেছেন, প্রখর সৌর দীপ্তিতে সে নাকি সম্পূর্ণ অদৃশ্য, কিন্তু আমরা ধরে নেব বুধই নিকটতম। বুধ ওজনে পৃথিবীর ১৮ ভাগের এক ভাগ, তার অভিকর্ষীয় টান মোটে আট ভাগের এক ভাগ। যে যখন তার উপবৃত্তিক পথে সূর্যের সবচেয়ে তফাতে যায় তখন তার দূরত্ব ৪'৩ কোটি মাইল, সবচেয়ে যখন কাছে তখন ২'৯ কোটি মাইল। বুধের গা থেকে দেখলে এক এক সময়ে মনে হবে সূর্য থেমে আছে, তার পর কিছুটা পিছনে হটছে। গ্রহের কাছে সূর্যের জ্যোতি এত প্রখর যে দূরবিনে তার গায়ের দাগ বিশেষ কিছু ধরা যায় না, সুতরাং এত কাল তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কিছুই জানা ছিল না। ১৯৭৪ মার্চের শেষে মার্কিন মহাকাশ যান ম্যারিনার-১০ বুধের ৪০০ মাইল কাছ দিয়ে যেতে যেতে তার প্রথম অন্তরঙ্গ ছবি পাঠায়, দেখা গেল এক রুক্ষ দৃশ্য, মধ্যে মধ্যে চাঁদের মত পাহাড় ও মোটামুটি গোলাকার খাদ

(crater) ; তবে চাঁদের তুলনায় পাহাড় অনেক ছোট, এবং খাদের মেঝে ঢালু না হয়ে বরং সমতল, তাদের দেয়ালও অনেক পাতলা। খাদগুলির সৃষ্টি উলকার আঘাতে মনে হয়। তা ছাড়া দেখা গেল ঢিবি, ঢালু চড়াই এবং কিছু নালা—কোনওটা সোজা, কোনওটা আঁকাবাঁকা, জল গড়িয়ে গেলে যেমন হয়।

এই মহাকাশ যানের যন্ত্র বুধের চার পাশে চুম্বকী ক্ষেত্র (magnetic field) পেয়েছে, তার শক্তি পৃথিবীর ক্ষেত্রের শতাংশ মাত্র হলেও এই আবিষ্কার অপ্রত্যাশিত, কারণ গ্রহটি পাক খায় অনেক ধীরে। বুধে সামান্য গ্যাসের আবহও ধরা পড়েছে, এবং তা বিজ্ঞানীদের অবাক করেছে আরও বেশী, যদিও তার ঘনতা পার্থিব বায়ুমণ্ডলের হাজার ভাগেরও কম ; এই ক্ষুত্র গ্রহের অভিকর্ষ দুর্বল, তা ছাড়া সূর্যের তেজ অণু পরমাণুর অস্থিরতা বাড়িয়েছে, সুতরাং আদি গ্যাসের আবরণ বহু আগেই বিদায় নিয়েছে এই ছিল ধারণা। সূর্যের থেকে যে বিবিধ কণার স্রোত প্রবাহিত তারই থেকে হয়তো বুধ নিয়ত সংগ্রহ করছে এই পাতলা আবহ, নতুবা গ্রহ গর্ভে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়ে তার সৃষ্টি। আবহে আছে হাইড্রোজেন, আরগন এবং সম্ভবত অন্যান্য গ্যাস।

সূর্য প্রদক্ষিণ করতে বুধ নেয় আমাদের ৮৮ দিন এবং আপন কক্ষ ঘিরে এক পাক ঘুরতে ১৭৬ দিন, ১৯৬৫ সালে রাডারের অনুসন্ধান এই তথ্যটির নির্দেশ দিয়েছে। তা হলে বুধের দিবস তার বৎসরের দ্বিগুণ দীর্ঘ! সম্প্রতি রাডার জ্যোতিষীরা অনুমান করছেন গ্রহ গাত্রের তাপ ভরা দুপুরে প্রায় ৫০০ ডিগ্রি পর্যন্ত চড়ে যেতে পারে, রাত্রে হয়তো নেমে যায় -১৭৭ ডিগ্রিতে। এই নির্দয় জগতে কোনও জীব বাঁচতে পারে বলে ভাবা যায় না।

কিন্তু সূর্যের এত কাছে থেকেও কি করে বুধ এখনও নিজের গতি বজায় রেখেছে? টমাস গোল্ড হিসাব করে দেখিয়েছেন যে এই নব আবিষ্কৃত গতি বর্তমান কক্ষে ৪০ কোটি বছরের বেশী সম্ভব নয়, তিনি বলেন বুধ এক কালে ছিল শুক্রের উপগ্রহ, তার ছিল নিজের গতি ; ক্রমে সে সরতে থাকে এবং এক সময়ে সূর্য তাকে বন্দী করে ফেলে, তা মাত্র ৪০ কোটি বছর আগের ঘটনা। এর নজিরে তিনি বলেন যে বুধ কিছুটা খাপছাড়া, তার কক্ষ পথ সাধারণ গ্রহদের তুলনায় বেশী উপবৃত্তিক।

দিগন্তের অল্প উপরে আকাশ প্রদীপের মত শুক তারা ও সন্ধ্যা তারা একাধারে কবি ও বিজ্ঞানীকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। একই গ্রহ কখনও দেখা দেয় ভোরে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও আকাশের গায়ে চলতে চলতে ঝিমিয়ে পড়ে, তার পর থেমে আবার উলটো দিকে চলে। আশ্চর্য নয় যে এদের বলা হয়েছে অস্থির তারা।

আজ অবশ্য জানা আছে যে শুক্র আভ্যন্তর গ্রহ অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত বলে যখন সে আমাদের কাছের থেকে দূরে সরে যায় তখন তার চক্রপথে মোড় ঘুরবার সময়ে মনে হয় যেন সে দিক পরিবর্তন করল। এই কারণেই চাঁদের মত সে কলায় কলায় বাড়ে কমে, যখন সবচেয়ে দূরে অর্থাৎ সূর্যের ও পাশে তখন সে গোল এবং আয়তনে ক্ষুদ্রতম, যত সে কাছে আসে তত তার ব্যাস বাড়লেও আলো-প্রতিফলনকারী অংশ কমে যায়, একে একে ক্ষয়ে যায় কলা। তার বার্ষিক প্রদক্ষিণে লাগে আমাদের ২২৪'৭ দিন, কক্ষ পথ প্রায় বৃত্তাকার। সবচেয়ে যখন সে কাছে আসে তখন দূরত্ব মোটে ২'৫৭ কোটি মাইল, চাঁদের পরেই শুক্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তবু সে রহস্যমণ্ডিত, অনেক ব্যাপারে তার থেকে আমরা মঙ্গল গ্রহ এমন কি দূর আকাশের তারা সম্বন্ধেও বেশী জানি। তার কারণ নিজেকে সে ঢেকে রেখেছে পুরু হলদেটে তুলোর মত মেঘের আবরণ দিয়ে। শুক্র গ্রহে মানুষ আছে যদি আমরা কল্পনা করি তো তারা আমাদের মত নীল আকাশ বা তারার মেলা দেখতে পায় না, মেঘের কম্বলে তাদের দৃষ্টি বাধা পায়, যদিও দিন রাত্রির পার্থক্য বুঝতে পারে।

তাদের এও মনে হবে যে অস্পষ্ট সূর্য উঠছে পশ্চিমে, অস্ত যাচ্ছে পুবে। কেন? সৌর জগতের এক আশ্চর্য সাম্প্রতিক আবিষ্কার সুক্রের প্রতীপ স্বাবর্তন গতি ; গ্রহরা সব একই দিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সেই দিকেই সাধারণত আপন অক্ষকে ঘিরে পাক খায়, কিন্তু শুক্রের পাক বিপরীতমুখী। রাডার প্রতিধ্বনির পরীক্ষায় জানা গিয়েছে এক পাক ঘুরতে লাগে প্রায় আমাদের ২৪৩ দিন, সুতরাং শুক্রের দিনও তার বছরের চেয়ে বড়! বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ মনে করেন প্রদক্ষিণের সমক্ষেত্রে শুক্রের স্থান ক্রমশ বদলাচ্ছে, ফলে কয়েক হাজার বছর পরে সে প্রতীপ গতি ত্যাগ করে সোজা

মুখে ঘুরবে, তখন দূর হবে এই নৈসর্গিক ব্যতিক্রম।

শুক্র অন্তর্গ্রহ হওয়াতে পর্যবেক্ষণের অসুবিধা বেড়েছে। যখন সে সবচেয়ে কাছে তখন তার অন্ধকার দিকটা আমরা দেখি, যত দূরে যায় তত তার আলোকিত অংশ বাড়ে। তা ছাড়া সেই কারণেই তাকে রাত্রে আকাশের উপর দিকে পাওয়া যায় না, সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময়ে অল্প কালের জন্য দিগন্তের কাছাকাছি পাওয়া যায়। এই অবস্থায় খুব সন্তোষ-জনক পরীক্ষা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পূর্ণ দিবালোকে কোনও কোনও পরীক্ষায় অসুবিধা আছে।

আজ মহাকাশ পাড়ি দিতে শিখে মানুষ শুক্র সম্বন্ধে যা জেনেছে তা কয়েক বছর আগেও ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৬১ সালের মে মাসে যখন রাশিয়ার ভেনেরা-১ মহাকাশ যান শুক্রের প্রায় লক্ষ মাইল ঘেঁষে ছুটে যায় (পরে তা হয়ে পড়ে সূর্যের কৃত্রিম গ্রহ)। পৃথিবীর বাইরে ভিন্ন গ্রহে প্রথম মানুষ-সৃষ্ট বস্তুর ছোঁয়া লাগে যখন ভেনেরা-৩ শুক্রের উপর পড়ে (১ মার্চ ১৯৬৬)। ভেনেরা-৪ (অকটোবর ১৯৬৭) এবং ভেনেরা-৫ ও ৬ (মে ১৯৬৯) যন্ত্রপাতি ধীরে নামায় প্যারাশুটে করে, অবতরণের পথে আবহের তথ্য পাঠায় বেতারে। ভেনেরা-৭ (ডিসেমবর ১৯৭০) সর্বপ্রথম নামার পরেও খবর পাঠায় ২৩ মিনিট ধরে (তা পৃথিবীতে পৌঁছায় তিন মিনিট ২৫ সেকেন্ডে), যত ক্ষণ না তাপ ও চাপে যন্ত্র বোবা হয়ে পড়ে। শুক্রের সূর্যমুখী অর্থাৎ দিনের দিকে প্রথম যন্ত্র নামায় ভেনেরা-৮ (জুলাই ১৯৭২), নামবার পরেও এরা কাজ করে ৫০ মিনিট, সুতরাং যন্ত্র ঠাণ্ডা রাখবার এবং চাপ সইবার সমস্যা অনেকটা বাগে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র পাঠিয়েছে ম্যারিনার-২ (ডিসেমবর ১৯৬২) ও ম্যারিনার-৫ (অকটোবর ১৯৬৭), এরাও অনেক তথ্য সরবরাহ করেছে, কিন্তু গ্রহে নামে নি; দ্বিতীয়টি শুক্রের মাত্র ২৫০০ মাইল ঘেঁষে দূরে চলে যায়।

এই সব আবিষ্কারী যানের তথ্যে প্রথম দিকে কিছু কিছু অসংগতি থাকলেও কতগুলি বিষয় এখন মোটামুটি স্পষ্ট। আবহের নিচে শুক্রের গায়ের তাপ ৫০০ ডিগ্রির কাছাকাছি, ১২½ মাইল উর্ধ্বে ৩২০ ডিগ্রি। গ্রহের গায়ে আবহের চাপ পৃথিবীর প্রায় এক শো গুণ, অর্থাৎ আবহ সেই পরিমাণ ভারী, উপরের দিকে অবশ্য চাপ ক্রমশ কমছে। এই আবহের

প্রায় শতকরা ৯৭ অংশ আঙ্গারিক গ্যাস যা পৃথিবীর আবহে আছে সামান্য। আমাদের বাতাসের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন সেখানে দুই শতাংশের কম, মেঘে জলীয় বাষ্প শতাংশের ও অক্সিজেন সম্ভবত সহস্রাংশেরও কম; আমাদের উচ্চ আবহের জলের অণু ভেঙে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সৃষ্টি হয়, সুতরাং শুক্রের গায়ে জল সামান্যই আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ম্যারিনার-৫ ও ভেনেরা-৮ যথাক্রমে শুক্রের আবহে সামান্য হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়ার চিহ্ন পেয়েছে।

পৃথিবীর তুলনায় শুক্রে দ্বিগুণ সূর্য কিরণ পৌঁছায় বটে, কিন্তু ভেনেরা-৮ প্রেরিত তথ্য অনুসারে মোটা মেঘাবরণ ভেদ করে তার মাত্র দুই তৃতীয়াংশ গ্রহের গায়ে পড়ে। শুক্রের ধীর স্বাবর্তনের জন্য দিনের আলো থাকে আমাদের প্রায় ১১৬ দিন ধরে, রাত্রিও তদনুরূপ দীর্ঘ; কিন্তু তা সত্ত্বেও রাত্রে গ্রহের গা বেশী জুড়ায় না; তার কারণ আঙ্গারিক গ্যাসের মেঘাবরণ কম্বলের মত কাজ করে, ভিতরের উত্তাপ (অবলোহিত রশ্মি) আটকে রাখে।

এই মেঘ বিক্ষুব্ধ, বিতাড়িত—সর্বদা যেন ভয়ংকর ঝড় বইছে, এই ছিল অনুমান। ভেনেরা-৮ নির্দেশ দিয়েছে ৩০ মাইল উপরে সত্যিই বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ১১০ মাইল, যদিও মাটির কাছাকাছি তা কমে দাঁড়ায় মাত্র চার মাইল। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর ধারণা গ্রহের স্বাবর্তন গতির থেকে এই বায়ুর সৃষ্টি, কারণ তা যেন কেবল ঐ পাকের দিকে মুখ করেই বয়। ম্যারিনার-১০ বুধের দিকে ছুটতে ছুটতে পথে শুক্রের ৩৫০০ ছবি তুলে পাঠিয়েছে (ফেবরুআরি ১৯৭৪), তাতে জানা গেল ঘন মেঘাবরণ গ্রহের স্বাবর্তন গতির ৬০ গুণ বেগে বিতাড়িত। নিরক্ষ রেখা অঞ্চলে এই ঢাকনার মধ্যে প্রকাণ্ড এক ফাঁক এবং দুই মেরু ঘিরে উজ্জ্বল, সম্ভবত শীতলতর বলয়ও লক্ষিত হয়েছে।

আবহের নিচে শুক্রের কি চেহারা, তার মাটি কি দিয়ে তৈরি ইত্যাদি সম্বন্ধে এ যাবৎ কিছুই জানা ছিল না। কুইপার অনুমান করেছেন ত্বক যেন আগ্নেয় গিরির টাটকা উদ্‌গিরণ ক্ষেত্র, তাতে গন্ধকের ফোয়ারা টগবগ করে ফুটছে, গলিত ধাতুর রক্ত-লাল স্রোত বয়ে চলেছে, ছাই আর আঙ্গারিক গ্যাস উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সৃষ্টি করছে পুরু হলুদাভ মেঘ। এ ক্ষেত্রেও প্রথম

তথ্য পাঠিয়েছে ভেনেরা-৮। যেখানে সে নেমেছে সেখানে স্থলে বস্তুর ঘনতা পৃথিবীর মাটির অর্ধেক মাত্র। তার গামা রশ্মি বর্ণালী যন্ত্র সেখানে পেয়েছে তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম, এবং তাদের পরিমাণও মেপেছে। দেখা গেল পৃথিবীর অনেক আগ্নেয় গিরিজাত পাথরে এই পদার্থগুলির আপেক্ষিক পরিমাণের সঙ্গে তা প্রায় মিলে যায়। এই আবিষ্কারটি ইঙ্গিত করছে পৃথিবীর (এবং সম্ভবত মঙ্গল ও চাঁদের) মত শুক্রও পৃথক স্তরে ভাগ করা, অর্থাৎ একদা তা এত উত্তপ্ত ছিল যে তার সব বস্তু গলে ভারী পদার্থগুলি গর্ভের দিকে যায় এবং হালকাগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ সঙ্গে নিয়ে উপরের ত্বকটি তৈরি করে।

আমেরিকার জেট প্রোপাল্‌শান গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা ১৯৭২ জুলাইতে শুক্রের নিরক্ষ রেখা বরাবর প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক বর্গ মাইল জরিপ করেছিলেন রাডার তরঙ্গ পাঠিয়ে; এই রশ্মি বিভিন্ন স্থানে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় নিয়েছে তার সামান্য তারতম্য থেকে মানচিত্র বানিয়ে ধরা পড়েছে গোটা বারো গোল খাদ, সুতরাং ঐ অঞ্চলের চেহারা চাঁদের গায়ের মত। খাদগুলি ৫০০০ ফুটের বেশী গভীর নয়, কিন্তু বৃহত্তমটির ব্যাস ১৯৯ মাইল।

আবিষ্কারী মহাকাশ যানগুলি শুক্রের চার দিকে পৃথিবীর মত কোনও চুম্বকী ক্ষেত্র বা বিকিরণের বলয় (**radiation belt**) পায় নি; চুম্বকী ক্ষেত্রের এক কারণ গ্রহের দ্রুত স্বাবর্তন গতি, শুক্র অবশ্য মন্থরগতি। মহাকাশের ক্ষতিকর রশ্মি ও কণা পৃথিবীর এই ক্ষেত্র ও বলয়ে আটকে পড়ে, সুতরাং শুক্রভ্রমণার্থী বা শুক্রবাসীদের পক্ষে এদের অভাব ক্ষতির বিষয়।

শুক্র সম্বন্ধে, বিশেষত মেঘের নিচে গ্রহটির রূপ, উপাদান ইত্যাদি বিষয়ে এখনও অনেক জানতে বাকি। কিন্তু মহাকাশ যানের আগে বিজ্ঞানীরা বহু বছরের চেষ্টায় যা জেনেছেন তা যেন অন্ধের হাতি বর্ণনার মত, এই ব্যর্থতার ইতিহাস আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্র ও তাদের নিকট ব্যবহারের আবশ্যিকতা প্রমাণ করে। মেঘ-ঢাকা গ্রহের গায়ে কোনও স্থায়ী চিহ্ন ধরা যায় নি বলে তার স্বাবর্তন কাল ছিল অজানা—আমাদের এক দিন থেকে ২৫২ দিন (১৯৬৫ সালে) পর্যন্ত প্রস্তাবিত হয়েছে। অবলোহিত রশ্মির পরীক্ষায়

নিম্নতম গাত্রতাপ বেরিয়েছিল মাত্র ১১ ডিগ্রি। ১৯৬২ সালে টমাস গোল্‌ড বলেন আবহ প্রধানত নাইট্রোজেনে তৈরি, আঙ্গারিক গ্যাসে নয়। ১৯৬৪ সালের শেষে জন্‌স হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানীরা বেলুনে বর্ণালীযন্ত্র পাঠিয়েছিলেন ৮৬,০০০ ফুট উর্ধ্বে, তাঁরা বললেন মেঘে আছে প্রধানত জল, সম্ভবত বরফের দানা রূপে। এর আগে একই উপায়ে অন্যরা মেঘে প্রধানত সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বা ধূলি কণা (এবং আঙ্গারিক গ্যাস) আবিষ্কারের দাবি জানান।

শুক্রকে যখন আমরা কৃশকায় দেখি তখন তার আঁধার অংশে এক মৃদু আভা লক্ষিত হয় যার নাম দেওয়া হয়েছে ভস্মাভ আলো (ashen light)। চাঁদের গায়েও এই জিনিসটা দেখা যায়, পৃথিবীর গা থেকে প্রতিফলিত আলো তার কারণ, কিন্তু শুক্রের কোনও উপগ্রহ নেই যার থেকে সে আলো পেতে পারে। ১৮৪২ সালে এক কল্পনাবিলাসী বিজ্ঞানী বলেন যে শুক্রবাসীরা তাদের নতুন রাজার অভিষেক উৎসবে প্রকাণ্ড বনে আগুন লাগিয়েছে, তার থেকে এই আভা। এই ধরনের প্রস্তাবের একমাত্র দোষ এই যে তা কেউ বিশ্বাস করে না। এই ক্ষীণ দ্যুতির রহস্য এখনও সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নি।

কিন্তু শুক্রে প্রাণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বহু কাল ধরে জল্পনা করেছেন। আয়তন ও ওজনে শুক্র পৃথিবীর সামান্য মাত্র খাটো (যথাক্রমে ৮৮ ও ৮২ শতাংশ), তাকে বলা হয় পৃথিবীর যমজ বোন, যেমন মঙ্গল গ্রহকে বলা হয় ছোট বোন। অথবা বিজ্ঞানীরা বলতেন মঙ্গলে হয়তো আমরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অবস্থাটা দেখছি, শুক্রে অতীত। প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সাগরে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সাহায্য করেছিল তখনকার বাতাসে আঙ্গারিক গ্যাসের প্রাচুর্য, আজ যেমন শুক্রে। পৃথিবী ২৯ কোটির অধিক বছর আগে প্রকাণ্ড উদ্ভিদের বনে ঢাকা ছিল যার থেকে আজকের কয়লা তৈরি হয়েছে, সেখানে চরে বেড়াত অতিকায় সরীসৃপ ডাইনোসরের দল, কোনও কোনও বিজ্ঞানী শুক্রের এখন সেই অবস্থা অনুমান করেছেন—যেমন অর্ধ শতাব্দ আগে সুইডেনের প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ আরেনিয়াস। সেই কল্পনা আজগুবী হলেও মার্কিন জ্যোতিষী কার্ল সেগান সম্প্রতি জল্পনা করেছেন শুক্রের উর্ধ্ব আবহ তাপ, চাপ ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা পৃথিবীর মত বলে সেখানে হয়তো কোনও রকম

আদিম প্রাণী ভেসে বেড়াচ্ছে, আয়তনে তারা পিংপং বলের মত। তিনি এও বলেছেন যে ৩০০-৪৫০ কোটি বছরে সূর্য তেতে উঠলে পৃথিবীর অবস্থাটা অনেকটা শুক্রের মত হয়ে পড়বে, আবহে আঙ্গারিক গ্যাস অথবা উষ্ণ জলীয় বাষ্প জমে; তখন মঙ্গল গ্রহের অবস্থাটা দাঁড়াবে আজকের পৃথিবীর মত, সুতরাং মানুষ যদি তখনও টিকে থাকে তো তারা হয়তো সেইখানে বাসা বদল করবে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আমরা পরে আলোচনা করব, তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেশ কয়েক বছর আগে সেগান শুষ্ক ও অকৃসিজেন-শূন্য শুক্রকে এ যুগেই কি করে বাসযোগ্য করা যায় তার এক পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর তাপসহ নীলসবুজ শেওলা (algae) আছে যারা বাস করে ৮০ ডিগ্রি উষ্ণ ঝরনার জলে। সেগান বললেন এদের বপন করতে হবে শুক্রের উচ্চ আবহে; সেখানে এরা বাড়বে, তার ফলে ক্রমে আঙ্গারিক গ্যাস কমবে, তাতে আবার নিচের কম্বলচাপা প্রতিবেশ দূর হয়ে গ্রহের গাত্রতাপ নেমে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থা আসবে যখন পৃথিবীর প্রাণীরা সেখানে গেলে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাবে না, নিশ্বাসেও নিতে পারবে শুক্রের বাতাস।

শুক্র গ্রহের পরেই পৃথিবী, কিন্তু এই বসুন্ধরা ও তার চাঁদ আমাদের এতই আপন যে তাদের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় দরকার।

পৃথিবীর বহির্দিকে প্রথম গ্রহ তার 'ছোট বোন' মঙ্গল, আয়তনে প্রায় অর্ধেক, ওজনে মাত্র এক দশমাংশ, ফলে তার অভিকর্ষীয় টান এতই দুর্বল, বস্তুর ওজন এতই কম যে একই শক্তি ক্ষয় করে সেখানে আমরা পৃথিবীর তুলনায় তিন গুণ উঁচু বা লম্বা লাফ দিতে পারি। সে আমাদের থেকে ২৪·৭ কোটি মাইল দূর পর্যন্ত যায়, আবার কখনও তফাৎটা কমে দাঁড়ায় ৩·৪৬ কোটি মাইল মাত্র; এই প্রতিবেশী খুব কাছে এসেছিল ১৯৭১ সালে যখন রাশিয়া ও আমেরিকা মহাকাশ যান পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সব গ্রহের মধ্যে এক মাত্র মঙ্গলের ভূমিই আমরা কিছুটা স্পষ্ট দেখতে পাই। সৌর গ্রহ কুলে মঙ্গলেই প্রাণী থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, সুতরাং একাধারে জ্যোতির্বিৎ ও সাধারণ লোকের সে বিশেষ কৌতূহলের বস্তু।

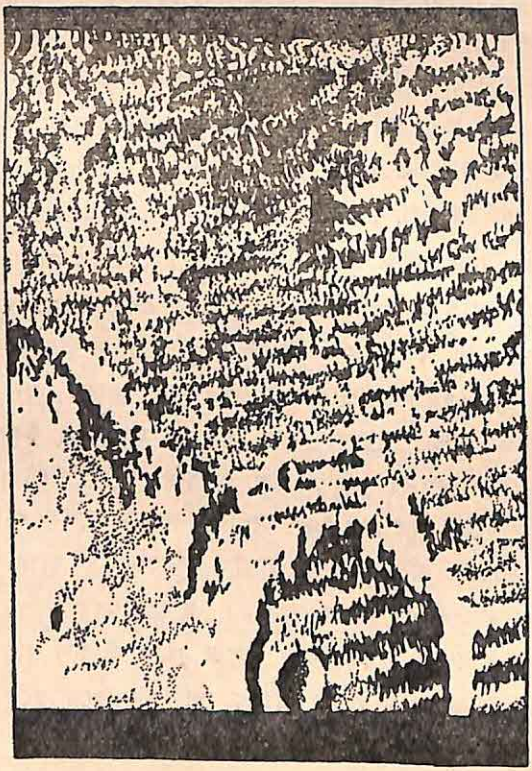
দূরবিনে গ্রহটিকে লাল দেখায়—এই আগুনে রং দেখেই পুরা কালের আকাশদর্শীরা এই 'অস্থির তারা'র নাম দিয়েছিল মার্স, রোমক যুদ্ধ দেবতার নামে। এ যুগে অনেকে বলেছে রংটা মাটিতে লিমনাইট বা ঐ রকম কোনও লৌহযুক্ত পদার্থের। কিন্তু গায়ের রং সর্বত্র এক নয় বা সমান গভীর নয়। কোথাও কোথাও এই বিভিন্ন অংশের নানা রকম কাব্যিক নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন যৌবন নির্ঝর, আরব্য উপসাগর, ভিনাস সাগর, সূর্য হ্রদ, ইত্যাদি। এই রকম এক অংশের পাক মেপে মঙ্গলের আবর্তন কাল বা দিন নির্ধারিত হয়েছে প্রায় ২৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রায় আমাদেরই সমান। দূরে বলে তার বছর অবশ্য দীর্ঘতর, আমাদের ৬৮৭.৫ দিন। দূরবিনের দৃষ্টিতে মঙ্গলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মেরু অঞ্চল ঘিরে সাদা মুকুট।

মঙ্গল সম্বন্ধে শুক্রের চেয়ে অনেক বেশী জানা ছিল, তবু মাত্র কয়েক বছরে এই জ্ঞান অনেকটা বেড়ে গিয়েছে রকেট দূত পাঠিয়ে, আগের ধারণাও বেশ কিছু বদলেছে। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় এ যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের দান বেশী, রাশিয়া অনেক কাল শুক্রের দিকেই মনোযোগ দিয়েছে; ১৯৭১ সালের নভেমবরে তাদের মার্স-২ ও ৩ মঙ্গলে পৌঁছেছিল প্রায় আমেরিকার ম্যারিনার-৯ যানটির সঙ্গে অনেক আশা নিয়ে (এদের ওজন ছিল ১০,০০০ পাউন্ড, ম্যারিনার-৯ ১৩০০ পাউন্ড)। কিন্তু তখন মঙ্গলে প্রচণ্ড ধূলির ঝড় বইছে, তার বেগ ঘণ্টায় ৩০০ মাইল (পৃথিবীর সর্বোচ্চ ২২৫ মাইল), একটির ভাগ্য এখনও রহস্যাবৃত, অন্যটির যন্ত্র গ্রহের গা থেকে মাত্র ২০ সেকেন্ড বার্তা পাঠায়, তখন সম্ভবত যন্ত্রাধারটি উলটে পড়ে তা বন্ধ হয়; টেলিভিশনের ছবিও ছিল অস্পষ্ট। সোভিয়েটরা কিন্তু বলে এই যান দুটি অনেক দিন ধরে মঙ্গল প্রদক্ষিণ করেছে ও তথ্য পাঠিয়েছে।

১৯৭৩ সালের গ্রীষ্মে মঙ্গল আবার সুবিধাজনক স্থানে আসে, তখন সোভিয়েটরা মার্স-৪, ৫, ৬ ও ৭ পাঠায়। তাদের খবর অনুসারে অর্ধবার্ষিক যাত্রার শেষে মার্স-৫ মঙ্গলকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে উৎকৃষ্ট ছবি পাঠিয়েছে। মার্স-৪ প্রদক্ষিণ করতে না পেরে গ্রহকে অতিক্রম করে চলে যায়, কিন্তু সে নাকি ১৪০০ মাইলের মধ্যে এসেছে এবং ছবিও পাঠিয়েছে। মার্স-৬ ও ৭ গিয়েছিল গ্রহের গায়ে যন্ত্র নামাবে বলে, একটির যন্ত্রাধার ঠাঁই পায় নি, অন্যটির যন্ত্র আবহে প্রবেশ করলেও নামতে নামতে কোনও কারণে সংকেত

বন্ধ হয়ে যায় (হয়তো ঝড়ের প্রকোপে), কিন্তু তথ্য যা এসে পৌঁছেছে তার নির্দেশ এই যে বাতাসের জল বাষ্প প্রত্যাশিত পরিমাণের কয়েক গুণ বেশী।

মার্কিন মহাকাশ যানের গবেষণা শুরু হয় ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি যখন ম্যারিনার-৪ ১৩ কোটি মাইল পেরিয়ে মঙ্গলের মাত্র ৫৬০০ মাইল ঘেঁষে চলে যায় এবং একুশটি ছবি ও অন্যান্য তথ্য পাঠায়। ছবির আশ্চর্যতম বৈশিষ্ট্য বহু গোল ও উপবৃত্তাকার খাদ। চাঁদের খাদ সুপরিচিত, তা দূরবিনে অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে, কিন্তু মঙ্গলে অনুরূপ খাদ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাদের ব্যাস ৩-৭৫ মাইল, হিসাবে দেখা গেল সংখ্যা সারা গ্রহে সম্ভবত দশ



৯ নং চিত্র

ম্যারিনার-৬ থেকে ২১৩০ মাইল দূরে মঙ্গল গ্রহের দৃশ্য

হাজারের বেশী। এর পরে ম্যারিনার-৬ ও ৭ ১৯৬৯ সালে যথাক্রমে নিরক্ষ রেখা ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে মঙ্গলের এক পঞ্চমাংশ ভূমির ছবি তোলে, কখনও মাত্র ২১৩০ মাইল দূর থেকে, তাতে খাদ ছাড়াও সমতল অবথা এবড়ো খেবড়ো ভূমি এবং ছোট খাটো পাহাড় ও উপত্যকা দেখা যায়।

মঙ্গলের অন্তরঙ্গ পরিচয় আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে ম্যারিনার-৯। গ্রহকে শুধু সেলাম জানিয়ে সে পালিয়ে যায় নি, প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে থাকে; তাকে বলা যেতে পারে পৃথিবীর বাইরে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (তার পূর্ববর্তীরা শেষ পর্যন্ত হয়েছে কৃত্রিম সৌর গ্রহ)। প্রদক্ষিণের পথে কখনও সে মঙ্গলের ৮০০ মাইল কাছে এসেছে, এবং যদিও তার মেয়াদ ধরা হয়েছিল তিন মাস, আসলে আরও আট মাস ধরে সে সমগ্র গ্রহটির এবং তার দুই উপগ্রহের ৭৩২৯ সংখ্যক ছবি পাঠিয়েছে, তার থেকে মঙ্গলের সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরি সম্ভব হয়েছে। সম্ভবত আরও এক শতাব্দী ম্যারিনার-৯ মঙ্গলকে ঘিরে ঘুরবে, কিন্তু ৬৯৮ বার প্রদক্ষিণের পর পৃথিবীর থেকে সংকেতে ছবি পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়, কারণ যন্ত্রের নাইট্রোজেন গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়াতে নিখুঁত ছবি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

চাঁদের যে সব নিকট চিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, সংস্কারের পর এ সব ছবির কয়েকটি প্রায় তারই মত স্পষ্ট ও সুন্দর। মাত্র ১০০ গজ মাপের বস্তুও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। আবহের উর্ধ্বে থাকায় ধূলি ঝড় তাকে সোভিয়েট যানগুলির মত কাবু করতে পারে নি। এই মহাকাশ দূতের চোখে ধরা পড়েছে অন্তত চারটি উত্তুঙ্গ আগ্নেয় গিরি, কয়েকটি সম্ভবত এখনও সক্রিয়। নিক্স অলিম্পিকা গিরিটি আমাদের মাউন্ট এভারেস্টের তিন গুণেরও বেশী উঁচু, তার মুখ ৩১৫ মাইল বিস্ফারিত। তা ছাড়া ধরা পড়েছে আঁকাবাঁকা শুকনো নালা, তাদের একটি ২৫০০ মাইল লম্বা, ৭৫ মাইল চওড়া ও প্রায় চার মাইল গভীর। অন্যত্র কোথাও কোথাও যেন বরফের স্রোত বা হিমবাহ বয়ে গিয়েছে, কোথাও বা ঝোড়ো হাওয়া যে বালি তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ঘণ্টায় কয়েক শো মাইল বেগে তার চিহ্ন। এক অঞ্চলের অসংখ্য খাদ দেখে মনে হয় তারা উলকার আঘাতে সৃষ্টি।

মঙ্গলে কোনও অদ্ভুত 'মানুষের' বাস আছে কিনা বহু দিন ধরে এই

প্রশ্ন পত্র পত্রিকায় রং চড়িয়ে আলোচনা হয়েছে। এইচ জি ওএল্‌স রচিত 'দুই জগতের যুদ্ধ' (War of the Worlds) উপন্যাসে মঙ্গলবাসীরা হঠাৎ পৃথিবী আক্রমণ করে আমাদের প্রায় হারিয়ে দিয়েছিল। ১৯৩৮ সালে এক বিখ্যাত অভিনেতা মজা করবার জন্য বেতারে এই রকম আক্রমণের খবর প্রচার করে আমেরিকায় প্রায় হাজার নাগরিককে দু এক ঘণ্টার জন্য ভয়ে দিশেহারা করে ফেলেছিলেন।

বিজ্ঞান জগতে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনার সূচনা করেন ইটালীয় জ্যোতিষী জোভানি স্কিয়াপারেলি। ১৮৭৭ সালে এক অপেক্ষাকৃত দুর্বল দূরবিনে তিনি ঐ গ্রহের নিরক্ষ রেখা অঞ্চলে কতগুলি আঁকিবুকি দেখতে পান এবং তাদের বর্ণনায় 'কানালি' শব্দটি ব্যবহার করেন ; তা প্রায় ইংরেজি কানাল (কৃত্রিম খাল) শব্দের মত শুনতে হলেও অর্থটা কিছুটা আলাদা—অনেকটা প্রাকৃতিক নালা। কিন্তু দেখতে দেখতে ইংরেজি অর্থটাই চলতি হয়ে গেল। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে দশ বছর পরিশ্রমের পর পৃথিবীর মানুষ তখন সবে ১০০ মাইল দীর্ঘ সুএজ় খাল শেষ করেছে, খালের আলোচনা তখন আকাশে বাতাসে। দু বছর পরে বিশ্বজনীন উত্তেজনার মধ্যে পড়ে স্কিয়াপারেলি নিজেই এই মত মেনে নিয়েছিলেন মনে হয়—এমন কি খালগুলির সমান্তরাল এক একটি জুড়িও দেখলেন।

অবিলম্বে এই মত ছড়িয়ে পড়ল যে মঙ্গলে মানুষের মত কি তদপেক্ষা বুদ্ধিমান জীব আছে, কিন্তু হালকা গ্রহ জল ধরে রাখতে পারে নি বলে সেই সভ্যতা এখন মুমূর্ষু, গ্রহটি শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে শেষ বিন্দু জল সংরক্ষণের জন্য তাদের এন্‌জিনিয়াররা খাল কেটেছে (যেমন পৃথিবীতেও একদা দরকার হতে পারে)। প্রতিষ্ঠাপন্ন বিজ্ঞানীরাও তা বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু ক্রমে অনেকে সন্দেহ সৃষ্টি করলেন এই বলে যে হয় তা কোনও রকম প্রাকৃতিক দাগ, নয়তো চোখের ধাঁধা ; অস্পষ্ট বস্তু জোর করে দেখতে গেলে লোকে অনেক সময়ে ভুল দেখে। হয়তো কারণটা তাই, এ পর্যন্ত কোনও রকেট যান কৃত্রিম খালের চিহ্ন পায় নি ; তবে পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী মহাকাশ যান থেকেও আমাদের গ্রহে মানুষের অস্তিত্ব ধরা যায় না—তার ইমারত রাজপথ সেতু কৃত্রিম প্রণালী ইত্যাদি সব কীর্তিই এত ক্ষুদ্র যে তারা ক্যামরার

চোখে অদৃশ্য।

মঙ্গলে হীনতর ক্ষুদ্রতর প্রাণীর সম্ভাবনা সর্বদাই বেশী মনে হয়েছে এবং তার সূত্রপাত মেরুর শ্বেত মুকুট থেকে। রকেট যানের যন্ত্র নাকি দক্ষিণ মেরুর উপরে জলীয় বাষ্পের চিহ্ন পেয়েছে, তার থেকে মনে হতে পারে মুকুট বরফের তৈরি, যেমন প্রথমে সকলে ভেবেছিল। পার্থিব পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা ছিল বসন্ত কাল থেকে কমতে কমতে এই মুকুট গ্রীষ্মে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়—ম্যারিনার-৯ দেখেছে ভরা গ্রীষ্মেও তার ব্যাস ২০০ মাইল। শীতের আগে এই সাদা আবরণ আবার বাড়তে আরম্ভ করে। মেরু মুকুটের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহের অন্যত্র রং বদলায়, সবুজ আভা দেখা যায়। এই বার্ষিক চক্র লক্ষ করে অনেকে বলেছে বরফ-গলা জলে মঙ্গলের মাটি উর্বর হয়, গাছ গাছড়া গজায়।

কিন্তু অনেক দিন থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে দলটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছে তাদের বিশ্বাস মুকুটের বস্তু জমে-যাওয়া আঙ্গারিক গ্যাস। এই মতটা সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর থেকে ঐ অঞ্চলের বর্ণালী পরীক্ষা করে। ম্যারিনার-৯ প্রেরিত ছবিতে দক্ষিণ মুকুটের আকৃতি দেখে কারও মনে হয়েছে তা বরফ, আবার দ্রুত সংকোচন দেখে কোনও কোনও বিজ্ঞানী ভেবেছেন অনধিক এক ইঞ্চি পুরু জমাট আঙ্গারিক গ্যাস। ১৯৭২ সালে এক উন্নত বর্ণালী যন্ত্র ৯০ ইঞ্চি দূরবিনে লাগিয়ে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ মেরুর যে স্পষ্ট অবলোহিত বর্ণালী পান তার সঙ্গে গবেষণাগারে তৈরী জমাট আঙ্গারিক গ্যাসের বর্ণালীর সাদৃশ্য দেখে তাঁরা নিঃসন্দেহ যে ঐ বস্তুই মুকুটের উপাদান; তাঁরা বলেন বর্ণালীতে জলের কোনও স্পষ্ট স্বাক্ষর নেই, থাকলেও তা আঙ্গারিক গ্যাসের এক শতাংশের কম। মোটামুটি বর্তমান বৈজ্ঞানিক ধারণা এই যে মেরু মুকুটের উপাদান প্রধানত আঙ্গারিক গ্যাস, তবে তার সঙ্গে সম্ভবত অল্প কিছু বরফ আছে।

কিন্তু গ্রীষ্মের আগে গ্রহের রং বদল যদি জলজনিত উদ্ভিদের জন্য না হয় তা হলে তার অন্য ব্যাখ্যা দরকার। এর একটি এই যে ঐ ঋতুতে বাতাস শীতলতর মেরু অঞ্চল থেকে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় অন্যত্র, এই ধূলির তুলনায় উদ্‌ঘাটিত ভূমি অনুজ্জ্বল।

জল ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের পক্ষে আবশ্যক অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন;

প্রথমটি প্রাণীরা নিশ্বাসে নেয়, দ্বিতীয়টি প্রধান দেহবস্তু প্রোটিনের অংশ। আমাদের বাতাসের এই দুই প্রধান উপাদান মঙ্গলের আবহে কোনও মহাকাশ যান পায় নি, শুক্রেরই মত তা প্রায় সর্বাংশে অ্যাঙ্গারিক গ্যাস দিয়ে তৈরি, কিছু মিথেন, নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরগন ও জলীয় বাষ্প ছাড়া। আরও পাওয়া যায় নি উল্লেখযোগ্য চুম্বকী ক্ষেত্র (পার্থিব ক্ষেত্রের তুলনায় তা ৫০০-১০০০ গুণ দুর্বল), বিকিরণ বেষ্টনীও অনুপস্থিত। এক বিশেষজ্ঞের হিসাবে এর ফলে মঙ্গলের গায়ে পৃথিবীর ৫০ গুণ বিকিরণ ঝরছে, বেশী মাত্রায় যার কোনও কোনওটা মারাত্মক।

এই সব বিরুদ্ধ যুক্তি সত্ত্বেও প্রাণের স্বপক্ষে কিছু ইঙ্গিত আছে, সুতরাং মঙ্গলে যে কখনও প্রাণের উন্মেষ হয় নি তা বিজ্ঞানীরা এখনও মানতে রাজী নন। ম্যারিনার-৯ এবং তার পূর্বতন যান যে সব নালা আবিষ্কার করেছে চেহারা দেখে বোঝা কঠিন তা জলের স্রোত ছাড়া আর কিসে সৃষ্টি হতে পারে। মনে হয় গ্রহে একদা যথেষ্ট জল ছিল, দুর্বল অভিকর্ষীয় টান কাটিয়ে যেমন অধিকাংশ আবহ বস্তু শূন্যে পালিয়ে গিয়েছে একটি হালকা আবরণ রেখে, তেমনি জলও উবে গিয়েছে। পার্থিব পরীক্ষায় আবহের ঘনতা যা ভাবা গিয়েছিল রকেট দূতের প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়েছে তার অনেক কম—আমাদের আবহের এক বা দুই শতাংশ মাত্র। পৃথিবীর প্রায় লক্ষ ফুট উর্ধ্বে বাতাসের যা চাপ মঙ্গলের গায়ে তাই, পৃথিবীর পিঠে বায়ুর চাপ এর দু শো গুণ বেশী। উপর দিকে আবহের প্রসার মাত্র আট মাইল—পৃথিবীর অর্ধেকেরও কম। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে আবহের স্বল্পতার জন্যই মঙ্গলে সূর্যাস্তের পর দেখতে দেখতে তাপ নেমে যায়, রাত্রে নিম্নতম হয় প্রায় -১০০ ডিগ্রি, আবার রোদ পড়লে তাড়াতাড়ি বাড়ে; সর্বোচ্চ তাপ বড়জোর ২০-৩০ ডিগ্রি। মার্স-২ ও ৩ গ্রীষ্মের শেষ দিকে তাপ মেপেছে সকাল বেলা ১০ ডিগ্রি (১১ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে) ও রাত্রে -৯৩ ডিগ্রি (১৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও অংশে কোনও কোনও কালে মানুষের পক্ষে শীত অসহ্য নয়।

সূর্যের চেয়ে বেশী দূরে বলে অবশ্য মঙ্গল পৃথিবীর তুলনায় উত্তাপ কম পায়। স্বাবর্তনের অক্ষ ২৪ ডিগ্রি ঝুঁকে আছে প্রায় পৃথিবীরই মত, তাই তার চার ঋতু। ম্যারিনার-৯ আবিষ্কার করেছে গ্রহটি সম্পূর্ণ গোল নয়,

নিরক্ষ রেখার কাছে ১০২ মাইল বেশী চওড়া, অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে সামান্য চাপা।

পৃথিবীর উচ্চ আবহে ওজোন (তিন পরমাণু অক্সিজেনের তৈরি গ্যাস) সূর্যের মারাত্মক অতিবেগনি রশ্মি পরদার মত আটকায়। ম্যারিনার-৯ মঙ্গলীয় আবহের অতিবেগনি বর্ণালীতে এই গ্যাসটি পেয়েছে, তাতে গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা বাড়ল। পৃথিবীর সঙ্গে আরও সাদৃশ্য ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। ম্যারিনার-৪ যে অব্যয় পরিবর্তনহীন গ্রহের চিত্রটি দিয়েছিল তার থেকে তখন অনেকে তাকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছে (অবশ্য চাঁদ সম্বন্ধেও এই ধারণা বদলেছে), এখন নানা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের ফলে মনে হয় সম্ভবত পৃথিবীর মতই তার বিবর্তন ঘটেছে, এখনও ঘটছে ; আগ্নেয় গিরি লাভার স্রোত ঢালছে, ধূলির ঝড়ে ভূমি ক্ষয়ে যাচ্ছে ; ম্যারিনার-৯ যন্ত্রের বর্ণালী পার্থিব পাথর গ্র্যানিট, কোআর্টজ় ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছে—তার থেকে মনে হয় এক কালে উত্তপ্ত গলিত বস্তুর গর্ভ থেকে অপেক্ষাকৃত লঘু পদার্থগুলি উপরে ভেসে উঠেছে পৃথিবীরই মত। পৃথিবীতে উলকার আঘাতে গোল গোল খাদের সৃষ্টি হয়েছে (বৃষ্টি ও আবহের প্রভাবে অধিকাংশ মুছে গেলেও এখনও শ' দুয়েক দেখা যায়), মঙ্গলের ও চাঁদের অনুরূপ ক্ষত-গুলির উৎপত্তিও সম্ভবত কিছু ঐ কারণে, কিছু হয়তো লুপ্ত বা সুপ্ত আগ্নেয় গিরির মুখ।

পৃথিবীর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রাণ শক্তির অসাধারণ ক্ষমতা বিরুদ্ধ অবস্থা সহ্য করবার। আমাদের শুষ্ক মরুতে প্রাণ বিরল নয়। পৃথিবীতে মুক্ত অক্সিজেনের অভাবেই প্রাণের শুরু হয়েছিল প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে, বর্তমান অক্সিজেন উদ্ভিদ জগতের দান ; এখনও কোনও কোনও ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় জীবাণুর অক্সিজেন একেবারেই দরকার হয় না, এমন কি কারও কারও পক্ষে তা মারাত্মক। যুক্তরাষ্ট্রে শরীরবিজ্ঞানী স্যানফোর্ড সিগেল এবং অন্যান্যরা গবেষণাগারে মঙ্গলের তাপ ও আবহ মিলিয়ে কৃত্রিম প্রতিবেশ সৃষ্টি করে নানা রকম হীন প্রাণীর পরীক্ষা করেছেন, কোনও কোনওটা মরেছে আবার কোনও কোনও জীব বিভিন্ন কাল পর্যন্ত টিকেছে। রুশরাও অনুরূপ গবেষণায় ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি লক্ষ করেছে, বিশেষত মরু অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকটির।

জল স্রোতে নালা সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই স্রোত কি করে তৈরি হল যে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। আগ্নেয় গিরির উত্তাপে মঙ্গলের বরফ গলে আকস্মিক বন্যা হতে পারে, দ্বিতীয়ত উত্তাপ আসতে পারে সূর্যের থেকে। মঙ্গলের স্বাবর্তনী অক্ষ ঠিক স্থির নয়, তার দুই মাথা ঘোরে বৃত্ত সৃষ্টি করে, যেমন করে লাট্টুর মাথা থামবার আগে ; সূর্য প্রদক্ষিণের পথে গ্রহের টলমলে মাথা যখন রোদ থেকে সরে যায় তখন আসে তুষার যুগ, যখন তা সোজা সূর্য তাপ পায় তখন উষ্ণ যুগ। ফলে প্রতি ২৫,০০০ বছরে মেরুর বরফ হয়তো গলে যায়, এই জল আকাশে উঠে বৃষ্টি হয়ে পড়ে দ্রুতগতি নদী, নালা, হ্রদ এমন কি অস্থায়ী সাগর পর্যন্ত সৃষ্টি করে থাকতে পারে। হয়তো এই জল কিছু কাল টিকেছে যাতে শুকিয়ে যাবার আগেই প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এই প্রকল্পের জনক কার্ল সেগান এও কল্পনা করেছেন যে ভবিষ্যতে মঙ্গল আবার যথোপযুক্ত গরম হলে মানুষ হয়তো সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধবে। সেগানের প্রতিবাদ করেছেন ব্রুস মারে, তাঁর মতে মঙ্গল এখনও বিবর্তনরত, সেখানে কখনও বড় নদী বা প্রাণ ধারণের উপযুক্ত বাতাস ছিল না, সম্ভবত মাত্র কয়েক কোটি বছর আগে আগ্নেয় গিরির উদ্‌গিরণ আবহ সৃষ্টি করেছে।

সব মিলিয়ে এখন অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা মঙ্গল চির দিন প্রাণশূন্য ছিল না, এবং এখনও হয়তো আনাচে কানাচে ব্যাক্‌টিরিয়া, শেওলা বা ছত্রাক (fungus) জাতীয় হীন প্রাণী থাকতে পারে। এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে হবে না, জৈব অন্বেষণের উপযুক্ত যন্ত্র নামাতে হবে। আমেরিকা ১৯৭৫ সালে যে ভাইকিং যান ধীরে নামাবার পরিকল্পনা করছে তাতে এই ব্যবস্থা থাকবে, ১৯৮০ দশকে তারা মানুষ পাঠাবে এমন একটা অস্পষ্ট আশাও আছে, অবশ্য যদি আর্থিক সামর্থ্যে কুলায়। রাশিয়ার মতলব যথারীতি রহস্যময়, তবে এক মার্কিন সাংবাদিককে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন তাঁদেরও ঐ ভাইকিং যানের মত একটি পরীক্ষার মতলব আছে একই সময়ে, তাতেও প্রাণের চিহ্ন অনুসন্ধানের যন্ত্রপাতি থাকবে। তা ছাড়া সোভিয়েটরা ইতিমধ্যে মহাকাশ-যাত্রীদের এক বছর কাল এক ক্ষুদ্র কামরায় বন্ধ রেখে তাদের দেহ মনের নানা রকম পরীক্ষা করেছে ; মানুষবাহী যান মঙ্গলে পৌঁছাতে প্রায় ঐ রকম

সময় নেবে। দূর পাড়িতে বিভিন্ন বিকিরণ ও সৌর শিখার প্রভাব সহ্য করতে হবে, দুই শতাধিক কুকুরের উপর তা পরীক্ষা করে কোনও ক্ষতি ধরা পড়ে নি।

গ্রহের প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত কোনও উপগ্রহের কথা বলা হয় নি। সূর্যের নিকটতম বুধ ও শুক্র এ বিষয়ে বঞ্চিত, উপগ্রহের পালা সুরু তার পরে। পৃথিবীর আছে একটি চাঁদ, মঙ্গলের দুটি। তারা ধরা পড়ে ১৮৭৭ সালে, যে বছর মঙ্গল আমাদের ৩·৫ কোটি মাইলের মধ্যে আসে ও স্কিয়াপারেলি তাঁর 'খাল' আবিষ্কার করেন। আমেরিকার থেকে আসাফ হল্ এদের প্রথম দেখতে পান, তিনি কাছেরটির নাম দেন ফোবস এবং দূরেরটির ডাইমস; প্রথম শব্দটির অর্থ ভয়, দ্বিতীয়টির ত্রাস—যুদ্ধদেবতার অনুচরদের উপযুক্ত নাম! মঙ্গলের কেন্দ্র থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৬৮০০ ও ১৪,৬০০ মাইল, প্রদক্ষিণ কাল সাত ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ও ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট।

১৭২০ সালে জোনাথান সুইফ্‌ট তাঁর গালিভারের ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছিলেন যে লাপুটা দেশের অধিবাসীরা মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছে; ভিতরেরটি গ্রহের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের ঠিক তিন গুণ দূরে, বাইরেরটি পাঁচ গুণ, প্রথমটি গ্রহকে ঘিরে ঘোরে দশ ঘণ্টায়, দ্বিতীয়টি ২১·৫ ঘণ্টায়। প্রায় ১৫০ বছর আগের উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের এতখানি আকস্মিক মিল বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

এ পর্যন্ত সৌর লোকে যত চাঁদ জানা আছে তার মধ্যে একমাত্র ফোবস গ্রহকে ঘুরে আসে গ্রহের এক দিনের অল্প সময়ে—অর্থাৎ এই উপগ্রহের প্রদক্ষিণ কাল গ্রহের স্বাবর্তন কালের চেয়ে কম। ফলে মঙ্গলে গেলে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যাবে: চাঁদ পশ্চিমে উদয় হয়ে পুবে অস্ত যাচ্ছে। বস্তুত, ফোবস এত জোরে ছোটে যে দিনে দু বার ১১ ঘণ্টা অন্তর অন্তর তার এই উদয় অস্ত হয়। ডাইমস কিন্তু বাধ্য ছেলের মত পুবে ওঠে ও পশ্চিমে ডোবে, যদিও মঙ্গলের পুবমুখী পাক-খাওয়া গতি ডাইমসের পুবমুখী প্রদক্ষিণের এত সামান্য মাত্র বেশী যে এই চাঁদটিকে আকাশের গায়ে প্রায় নিশ্চল মনে হয়। তাই পুব থেকে পশ্চিম দিগন্তে পৌঁছাতে তার প্রায় তিন দিন সময় লাগে, তার মধ্যে দু বার আসে পূর্ণিমা।

এই উপগ্রহ দুটির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই মত—হয় তারা ছিল উলকা, মহাকাশে ছোটার পথে মঙ্গলের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে, নয়তো মঙ্গলের জন্মের সঙ্গেই তাদের সৃষ্টি। ম্যারিনার-৯ এদের খুব স্পষ্ট কয়েকটি ছবি তুলেছে। কোনও বিশেষ আকার নেই, ফোবস দেখতে অনেকটা আলুর মত, আর ডাইমসের বর্ণনায় বলা হয়েছে যেন "এক খোবল খাওয়া আধখানা আপেল"; ফোবসের একটি ছবি প্রায় মড়ার খুলির উপরাংশের মত। দুইয়েরই গায়ে মঙ্গলের মত খাদের ক্ষত, সম্ভবত উলকা-ঘাতের সাক্ষী। মাপে ফোবস ১৩·৬ × ১১·২ মাইল, ডাইমস ৫·৫ × ৭ মাইল।

ফোবস এত কাছে হলেও এত ক্ষুদ্র যে মঙ্গল থেকে তার আকৃতি দেখাবে আমাদের চাঁদের এক তৃতীয়াংশ, যদিও তার উপর থেকে দেখলে মঙ্গল দিগন্ত থেকে অর্ধেক আকাশ জুড়ে থাকবে। ফোবস ক্রমেই মঙ্গলের কাছে আসছে মনে হয়, সুতরাং এক দিন তার দেহ এই গ্রহের অভিকর্ষীয় টানে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে। মঙ্গল থেকে দেখলে ডাইমসের আকার বোঝাই যাবে না, তাকে দেখাবে এক উজ্জ্বল তারার মত, পৃথিবীর থেকে শুক তারা যেমন দেখায়। সুতরাং আমাদের তুলনায় মঙ্গলে চন্দ্রালোক অতি ক্ষীণ, আসলে এই চাঁদগুলি উড়ন্ত পর্বতের বেশী কিছু নয়। তবু তারা হয়তো একদা মানুষের কাজে লাগতে পারে, মহাকাশে চলার পথে পা ফেলবার জন্য। বস্তুত ১৯৫৯ সালে বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ইয়োসিফ শ্‌ক্লোভ্‌স্‌কি বলেন যে এরা হয়তো ফাঁপা কৃত্রিম উপগ্রহ, মঙ্গলবাসীরা তাদের গ্রহ বাসের অযোগ্য হয়ে যাওয়ার পর ওগুলি বানিয়ে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। এই উপগ্রহ দুটির অদ্ভুত চাল চলন দেখে মনে হয়েছিল এরা অন্যান্য চাঁদের চেয়ে হালকা বস্তু দিয়ে তৈরি, তার থেকেই এমন ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে যে শ্‌ক্লোভ্‌স্‌কির তথ্য বিচারে ভুল ছিল।

মঙ্গলের পরে সৌর পরিবারের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি, এদের মধ্যে যতখানি ফাঁক (৩৪ কোটি মাইল) তাতে সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত অংশের তিন বার জায়গা হয়। কিন্তু এই স্থান সম্পূর্ণ খালি নয়, সেখানে ঘুরছে বহু সহস্র ক্ষুদ্র গ্রহ বা গ্রহাণু (asteroid)। মহাকাশে এরা পাথর ও ধাতুর

ছোট ছোট দ্বীপ, সব মিলিয়ে বস্তু পরিমাণ চাঁদের পাঁচ শতাংশেরও কম। কিন্তু তা ১৭.৫ কোটি মাইল চওড়া এক বেষ্টনী বানিয়েছে।

গ্রহাণুর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা সম্ভাবনা এই যে আদিতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে এক পূর্ণাঙ্গ গ্রহ ছিল, পরে তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, হয়তো কোনও ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। কিন্তু এখন এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে যে সৌর লোকের জন্ম কালে গ্যাস ও বস্তু কণা জমে যখন গ্রহ তৈরি হচ্ছিল তখন এইখানে অবশিষ্ট বস্তু ছোট ছোট আকারে দানা বেঁধেছে, জুড়বার সময় পায় নি ; জোড়ার কাজ হয়তো এখনও চলছে, হয়তো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজটা অসম্পূর্ণ থাকার কারণ বৃহস্পতির প্রবল মহাকর্ষীয় শক্তি। সুইডেন থেকে আল্‌ফভেন বলেছেন গ্রহাণুদের ছোট ছোট শ্রেণী যে প্রায় একই কক্ষ পথের যাত্রী ফেটে-যাওয়া গ্রহের ভগ্নাংশ হলে তা সম্ভব হত না। অন্য তারাদের ঘিরেও হয়তো নিজেদের সৃষ্টির অনেক পরে এমনি গ্রহ গড়ার কাজ চলছে।

গ্রহাণু (এবং খণ্ডিত ধূমকেতুর অংশ) প্রায়ই কক্ষচ্যুত হয়ে বহু দূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে ঢোকে তখন তাদের আমরা বলি উলকা (meteor) বা খসা তারা (falling star) ; তারা অবশ্য তারা মোটেই না, বাতাসের ঘষায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাত্র। এই ঘষায় অনেকগুলিই ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়, যেগুলি পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে তাদের বলা হয় পতিত উলকা (meteorite)। উলকা যে মোটেই বিরল নয় তা সকলেই জানে, রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে ঘণ্টায় একটা কি তারও বেশী 'তারকা পতন' দেখা যায়।

অধিকাংশ পতিত উলকার উপাদান পাথর, তবে সবচেয়ে বড়গুলি ধাতব, প্রায়ই নিকেল ও লোহার সংকর। উলকা শুধু সৌর লোকের অংশই নয়, তেজস্ক্রিয় পদার্থ মেপে দেখা গিয়েছে তাদের বয়স পৃথিবীর সমান ; সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস গড়ে তুলতে অথবা তার আভ্যন্তর উপাদানের খোঁজে এদের থেকে দরকারী খবর মেলে।

কোনও কোনও দ্রুতগতি উলকা আরও দূরের তারা লোক থেকে আসে হয়তো, তারা ও নীহারিকাদের মধ্যবর্তী মহাকাশ যে সম্পূর্ণ বস্তুহীন নয় তা আগে বলেছি। প্রসিদ্ধ মার্কিন বিজ্ঞানী হ্যারল্‌ড উরে এই প্রস্তাব করেছেন

যে পাথুরে উলকাগুলি চাঁদের থেকে আসে, আর লোহাপ্রধান উলকা গ্রহাণু দল থেকে।

প্রথম এবং বৃহত্তম গ্রহাণু আবিষ্কার করেন সিসিলির জ্যোতিষী জুসেপি পিয়াস্‌সি ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম রাত্রিতে। পর পর ৪১ রাত্রি তিনি একে লক্ষ করেন, তার পর সূর্যের এলাকায় এসে তা হারিয়ে যায়। সারা ইয়োরোপে জ্যোতিষীদের মধ্যে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল, কিন্তু ফল হল না কিছু। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন আলোচনা করলেন আবার পাওয়া গেলে তার কি নাম দেওয়া হবে। গণিতের বিরাট প্রতিভা কার্ল ফ্রিড্‌রিশ গাউস তাঁর সব কাজ ফেলে রেখে প্রাণপণে হিসাব করে চললেন এবং পিয়াস্‌সি যে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার থেকে গড়ে তুললেন লুপ্ত গ্রহিকার কক্ষ। কয়েক সপ্তাহ পরে কাগজ পত্র ফেলে উঠে তিনি জ্যোতিষীদের নির্দেশ দিলেন ঠিক কোথায় তাদের দূরবিন লক্ষ করতে হবে। তাই করে আবার ধরা পড়ল এই যাযাবর জ্যোতিষ্ক। এক রোমক দেবীর সম্মানে পিয়াস্‌সি এর নাম দিলেন সিরিজ়। অতি অসমান এই পাথুরে গোলকটির ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল, গায়ের মাপ বা তল (area) সাত লক্ষ বর্গ মাইল।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যস্থিত সিরিজ় বোডের সূত্র সম্পূর্ণ সমর্থন করল। হয়তো ছোট খাটো এক গ্রহের মর্যাদাও পেত, কিন্তু দেখতে দেখতে তারই সমশ্রেণীর আরও অনেকগুলি আবিষ্কার হওয়াতে তা আর হল না। জ্যোতিষীরা প্রথমে খুব উঠে পড়ে লেগেছিলেন নতুন গ্রহাণু আবিষ্কার করতে, তাদের কক্ষ ও অন্যান্য বিশেষত্বের পরীক্ষায়। কিন্তু এই অফুরন্ত পঙ্গপালের চর্চায় ক্রমে তাদের উৎসাহ কমে গেল, বিশেষত এই শতাব্দের প্রথমে যখন জ্যোতিষ বিদ্যায় বৈপ্লবিক আবিষ্কার ও চিন্তার ফলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হল দূর নীহারিকা ও নক্ষত্রের দিকে। তখন এরা হয়ে পড়ল অবাঞ্ছিত 'আকাশ পোকা'; এই পঙ্গপালের কে কবে ঠিক আকাশের কোন অংশে আছে এই ধরনের হিসাব সময় ও শক্তির অপব্যয় শুধু নয়, উপরন্তু নক্ষত্র বা অন্য কোনও সম্ভ্রান্ত জ্যোতিষ্কের পরীক্ষায় যখন ক্যামেরায় ছবি তোলা হয় তখন এরা তার মধ্যে ভীড় করে বিরক্তির সৃষ্টি করে।

গ্রহাণু আবিষ্কার করা হয় ঐ ক্যামেরায় ছবি তুলেই, খুব সহজ পদ্ধতিতে। ক্যামেরা যদি স্থির থাকে তো ছবিতে তারাগুলি বিন্দুর মত দেখায় আর তার

মধ্যে গ্রহাণু লম্বা দাগ টানে, তার কারণ তারারা এত দূরে যে অল্প সময়ের জন্য ক্যামেরা খুলে রাখলে তাদের গতি ধরা পড়ে না ; আবার ক্যামেরাকে যদি গ্রহাণুর গতির সঙ্গে সমান তালে ঘোরানো হয় তা হলে এই নিকটবর্তীরা দেখায় বিন্দুর মত, আর তারারা রেখার মত।

সিরিজের পর দেখতে দেখতে আরও তিনটি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহিকা আবিষ্কৃত হল—১৮০২ সালে প্যালাস, ব্যাস ৩০০ মাইল, আকৃতি গোল ; ১৮০৪ সালে জুনো, ব্যাস ১২০ মাইল, প্রায় গোল ; এবং ১৮০৭ সালে ভেস্টা ব্যাস ২৪০ মাইল, প্রায় গোল। আয়তন গ্রাহ্যের মধ্যে আসে এমন গ্রহিকার সংখ্যা আজ ধরা হয় প্রায় ৩০,০০০ ; এই দলে আছে সিরিজ় থেকে আরম্ভ করে এক মাইল আয়তনের ক্ষুদ্র পর্বত ইকারাস পর্যন্ত। আপাতত জ্যোতিষী-দের তালিকায় পরীক্ষিত গ্রহাণুর সংখ্যা ১৮৩১, এদের ব্যাস ১-৪৮০ মাইল, তার মধ্যে মাত্র গোটা কুড়ির ব্যাস ১০০ মাইলের বেশী। উপরোক্ত ঐ ৩০,০০০ ছাড়াও আছে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রতর পাথর, নুড়ি, বালিতুল্য কণা যাদের কোনও লেখাজোখা নেই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রহাণু ঈরস, কক্ষে বিচরণ করতে করতে সে (এবং জিওগ্রাফস) পৃথিবীর খুব কাছাকাছি আসে, সুতরাং প্রায় নিকট আত্মীয়। তা ছাড়া তার আকৃতি লম্বা, ১৫ মাইল দীর্ঘ ও পাঁচ মাইল প্রশস্ত সে এক ঘুরন্ত নোড়া। ১৯৩১ সালে যখন সে আমাদের ১'৬ কোটি মাইলের মধ্যে আসে তখন প্রথম ধরা পড়ে। সূর্য প্রদক্ষিণ করতে ঈরস নেয় ২১ মাস, তার মধ্যে কখন সে আমাদের কাছে আসবে তা অবশ্য হিসাব করা চলে। এই লম্বা গ্রহিকা প্রতি পাঁচ ঘণ্টায় এক বার পাক খায়, কিন্তু পাশের দিকে গড়িয়ে ঘোরে না, মাথা বরাবর ওলটায় ; ফলে আমাদের চোখে তার উজ্জ্বলতা বাড়ে কমে, যখন তার লম্বা দিকটা সূর্যালোক প্রতিফলিত করে তখন সে সবচেয়ে উজ্জ্বল। অনেক গ্রহাণুই আট দশ ঘণ্টায় এক বার পাক খায় এবং অসমানতার জন্য তাদের প্রভার পার্থক্য দেখা যায়।

ঈরসের দূরত্ব খুব সঠিক জানা সম্ভব বলে তা ব্যবহার করা হয়েছে মাপ কাঠি হিসাবে, সৌর লোকের অন্যান্য দূরত্বের সংস্কার করতে। সুতরাং সে অন্তত মানুষের একটা কাজে লেগেছে, ভবিষ্যতে মহাকাশবিহারীদের আরও প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে পারে।

ঈরসের অদ্ভুত আকৃতির কারণ তার ক্ষুদ্রতা ; যে জ্যোতিষ্ক যত বড় অভিকর্ষীয় টানে সে তত গোল হয়ে যেতে চায়। গ্রহিকাদের 'মাটির টান' অনেক সময়ে এত কম যে ক্রিকেট খেলতে গেলে বল হারিয়ে যাবে মহাকাশে।

তালিকাভুক্ত গ্রহাণুর সবগুলিই গ্রহদের মত পশ্চিম থেকে পুব দিকে ঘোরে। তবে তাদের কক্ষ পথ কিছুটা বেশী উপবৃত্তিক, সেই কারণে কেউ মাঝে মাঝে বৃহস্পতিকে অতিক্রম করে যায়। দুই পাশের গ্রহদ্বয়ের মধ্যে বৃহস্পতি বড় বলে সেই অধিকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের গতি, এমন কি চৌদ্দটি তারই কক্ষ পথে চলে—পাঁচটি পিছনে, নয়টি আগে। এদের বলা হয় ট্রোজান বা ট্রয়ের বীর, কবি হোমারের অনুসরণে অ্যাকিলিস, পেট্রক্লাস এই রকম সব নাম দেওয়া হয়েছে। এ যুগে মাতব্বর নেতার চলার পথে আগে পিছনে যে পুলিশ রক্ষী চলে এই অগ্রদূত ও পশ্চাদ্‌দূতরাও যেন সেই রকম। অষ্টাদশ শতাব্দের জ্যোতিষগণিতবিজ্ঞানী জোসেফ লুই লাগ্রাঁজ দেখান যে প্রতি গ্রহের কক্ষে আগে পরে দুটি মহাকর্ষীয় সাম্যের ক্ষেত্র আছে যেখানে বস্তু এসে জমতে পারে, ট্রয়ের বীররা এই দুই জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। কয়েক বছর আগে পোলান্‌ডের এক জ্যোতিষী বলেন যে চাঁদেরও আগে-পরে লাগ্রাঁজীয় ক্ষেত্রে ক্ষীণ বস্তু-মেঘ আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর আছে ছায়া চাঁদ।

অন্য গ্রহের অভিকর্ষীয় প্রভাবে গ্রহাণুদের প্রদক্ষিণ কক্ষ প্রায়ই বদলায়। বৃহস্পতির প্রবল প্রভাবে মাঝে মাঝে এক একটা সূর্যের দিকে চলে আসে, অথবা বাইরের গ্রহগুলির দিকে চলে যায় ধারাবাহিক কক্ষ ভ্রমণে ; হিডাল্‌গো পৌঁছে যায় শনি পর্যন্ত, ইকারাসের কক্ষ বেশী রকম উপবৃত্তিক, সে সূর্যের ১·৭ কোটি মাইলের মধ্যে আসে, আবার ১৮·৩ কোটি মাইল দূরে সরে যায়। সম্ভাবনা এই যে এক সময়ে এই পথভ্রান্ত গ্রহাণুরা আবার বৃহস্পতির কক্ষ অতিক্রম করবে, তখন সে আবার তাদের নিজের ক্ষেত্রে টেনে নেবে, নয়তো পাঠিয়ে দেবে নতুন কোনও দূর ভ্রমণে। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা প্রায়ই আমাদের এত কাছে আসে যে তা প্রায় আশঙ্কাজনক। ইকারাস প্রতি ১৯ বছরে পৃথিবীর কানের কাছ দিয়ে চলে যায়, ১৪. ৬. ১৯৬৮ তারিখে (এবং তার আগে ১৯৪৯ সালে) সে আমাদের ৪০ লক্ষ

মাইল কাছে আসে, গণিতের হিসাবে এই ফাঁকটা আগেই জানা থাকলেও সাড়া পড়ে যায় যে হয়তো সাংঘাতিক একটা ঠোকাঠুকি হবে ; সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বলেন আঘাতের তেজ হবে হাজার হাইড্রোজেন বোমার তুল্য (যদিও ইকারাসের ব্যাস মাত্র এক মাইল) এবং কক্ষের সামান্যতম পরিবর্তন হলেই সংঘর্ষ ঘটতে পারে। ভাগ্যক্রমে এ যাত্রায় তা হয় নি, কিন্তু পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহের প্রভাবে ক্রমশ তার কক্ষ বদলে একদা এই দুর্ঘটনা হতেও পারে। অবশ্য ইকারাসের চেয়েও কাছে এসেছে অ্যাপোলো ১৯৩২ সালে যখন সে ছিল মাত্র ২০ লক্ষ মাইল দূরে, চার বছর পরে এডনিস ছিল দশ লক্ষ মাইলেরও কাছে। ১৯৩৭ সালে হার্মিস যখন ৪৮৫,০০০ মাইলের মধ্যে আসে, অনুসরণরত জ্যোতিষীদের মনে হচ্ছিল যেন এক জেট-বিমান ছুটে যাচ্ছে—তখন তার দূরত্ব অবশ্য চাঁদের মাত্র দ্বিগুণ।

১০.৪.১৯৭২ তারিখে এক উল্কা পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসে এবং মাঝপথে চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার ব্যাস ১৩ ফুট, ওজন হাজার টন, বেগ ঘণ্টায় ৩৩,০০০ মাইল ; ভাগ্যক্রমে তা উত্তর আমেরিকার ৩৬ মাইল উপর দিয়ে চলে যায়। এই উলকা পৃথিবীকে আঘাত করলে কি হত ? জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে তা ধ্বংস করত গত মহাযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা জাপানে যা করেছিল তার চেয়েও বেশী।

মনে হয় অতীতে অন্য বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কয়েকটি গ্রহাণু কক্ষচ্যুত হয়েছে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষের ফল যে হয়েছে মৃত্যু তার প্রমাণ পতিত উলকা। এদের আয়তনে অনেক পার্থক্য—হাতের মুঠোয় কয়েক হাজারকে ধরা চলে এমন কণার অবিরাম বর্ষণ চলছে, আবার ৫০,০০০ টন কি তারও বেশী ওজনের উড়ন্ত পাহাড় পৃথিবীকে ধাক্কা দিয়েছে, যদিও হয়তো ১০,০০০ বছরে একটা ; বড় পাথরের মত উলকা পড়ে বছরে প্রায় ১৫০০। পৃথিবীর গায়ে উলকার তৈরি খাদের কথা আগে বলেছি, ১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় আকাশ যান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন একটি। মাত্র অল্প দিন হল ভূবিজ্ঞানীরা এই তথাকথিত 'তারাক্ষত'গুলিকে চিনেছেন, এ পর্যন্ত যা তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় উলকার আঘাতে পৃথিবীর চেহারা চাঁদের মতই বসন্ত রোগীর অনুরূপ হয়ে যেতে পারত ; হয় নি যে

তার কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডল অনেকটা বর্মের কাজ করেছে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ক্ষতের উপর প্রলেপ লাগিয়েছে, তা ছাড়া ভূমিক্ষয় (erosion) এবং যুগে যুগে পর্বত সৃষ্টি পৃথিবীর ত্বক বদলে দিয়েছে।

অধিকাংশ বড় উলকা বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়, কখনও বা প্রচণ্ড বাতাসের চাপে ফেটে যায়, তখন তার আওয়াজ কানে আসে হয়তো। এদের থেকে শুধু কিছুটা ধুলো এসে পৌঁছায় পৃথিবীতে। মাটিতে পড়েও বিস্ফোরণ ঘটতে পারে দুই কারণে: সামনের চাপা বাতাসের চাপ হঠাৎ মুক্তি পায়, কাগজের ঠোঙা ফুলিয়ে ফাটালে যেমন হয়; দ্বিতীয়ত, আঘাত জনিত তাপে উলকার পাথর বা ধাতু এবং পৃথিবীর মাটি গ্যাসীভূত হয়ে পড়ে, তার জন্য হঠাৎ কয়েক হাজার গুণ বেশী জায়গা দরকার হয়, গ্যাসের ধাক্কায় বস্তু চৌচির হয়ে ভাঙে।

পৃথিবীর গায়ে কয়েকটি উলকার ক্ষত বেশ প্রসিদ্ধ। ১৮৯১ সালে আমেরিকায় অ্যারিজোনা প্রদেশের মরুভূমিতে এক খনি-সন্ধানী লোহার খনি আবিষ্কারের খবর জানান, বলেন সেখানে মাটির উপর তাল তাল লোহা পড়ে আছে, শুধু গাড়িতে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। পরে বোঝা গেল এই লোহা জননী বসুন্ধরার গর্ভজাত মোটেই নয়, লৌহদেহী উলকার খণ্ড। প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে যখন অসভ্য মানুষ বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন এক দিন এক প্রকাণ্ড ধাতু পিণ্ড হঠাৎ মহাকাশ থেকে তেড়ে এসে পৃথিবীকে আঘাত করেছে ভীষণ জোরে, সৃষ্টি করেছে এক খাদ যার ব্যাস ৪১০০ ফুট, গভীরতা ৬০০ ফুট; এর থেকে এই উলকার ওজন ও দ্রুতির কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। অ্যারিজোনায় এই গর্তটির নাম ব্যারিন্‌জার খাদ।

বৃহত্তম উলকা ক্ষত আছে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্‌সভাল প্রদেশে, কঠিন গ্র্যানিট পাথরের গায়ে যে গামলার মত খাদটি সৃষ্টি হয় তার ব্যাস ২৬ মাইল। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই গ্রহিকার ব্যাস ছিল অন্তত এক মাইল এবং যে বিস্ফোরণী শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীকে আঘাত করেছে তার পরিমাণ দশ লক্ষ মেগাটন শক্তির এক পারমাণবিক বোমার অথবা কুড়িটি বৃহত্তম হাইড্রোজেন বোমার সমান। এই ঘটনা মানুষ অবশ্য চোখে দেখে নি, তা ঘটেছে ২৫ কোটি বছর আগে, আর পৃথিবীতে তার আগমন ২০ লক্ষ

বছরের কথা। মানুষ থাকলে এই অবিস্মরণীয় ঘটনা তার নিশ্চয় অলৌকিক দৈব দুর্বিপাক মনে হত, যেমন আজও অনেকের মনে হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা দেশে কয়েক হাজার বছর ধরে এক কিংবদন্তী চলে আসছে যে একদা সেখানে আকাশ থেকে তেড়ে এসেছিল এক প্রকাণ্ড লোহার স্তূপ ভয়ংকর অগ্নি পিণ্ডের মত। এ যুগে স্পেনীয় সৈন্যরা সেখানে আনুমানিক ৩৩,০০০ পাউন্ড ওজনের এক লৌহ খণ্ড আবিষ্কার করে, তা ভেঙে অস্ত্র শস্ত্রও বানায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৭৮৩ সালের পরে জায়গাটার হদিশ হারিয়ে যায়। সম্প্রতি কয়েক জন বিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে নতুন করে গবেষণা শুরু করেন এবং কিছু কিছু খণ্ড ও খাদ আবিষ্কার করেন, তার থেকে কতগুলি বিশেষত্ব চোখে পড়েছে ; আঘাতের ক্ষত ১১ মাইল লম্বা এবং খুব সংকীর্ণ, সাধারণ উলকার ব্যবহার এই রকম নয়। এঁরা আপাতত সিদ্ধান্ত করেছেন যে যে বস্তুটি পড়েছিল তা যথার্থ উলকা নয়, পৃথিবীর এক দ্বিতীয় চাঁদের অংশ। এঁদের মতে পতনের বহু শতাব্দ আগে এক উলকা বা গ্রহিকাকে পৃথিবী টেনে নিয়েছিল নিজের আওতায়, তা তখন উপবৃত্তিক পথে এই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং ক্রমে কাছে আসতে আসতে একদা পার্থিব অভিকর্ষের প্রভাবে হাজার হাজার খণ্ডে ভেঙে যায় (উপগ্রহের এই দশার আমরা আলোচনা করব বৃহস্পতি ও চাঁদের প্রসঙ্গে)। এই খণ্ডগুলি পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে যেমন গ্রহাণু দল সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, তার পর কক্ষ পথ পৃথিবীর বেশী কাছাকাছি এসে পড়ার ফলে অন্তত কয়েকটি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একই আবর্তন থেকে সবগুলি পড়ে নি, পরবর্তী আবর্তন থেকে পড়লে হিসাবে দেখা যায় তার খণ্ডগুলি আগের তুলনায় প্রায় ৬২০ মাইল দূরে পড়বে ; দিক ও দূরত্ব অনুসারে খোঁজ করে চিলি দেশে সত্যিই আরও খণ্ড পাওয়া গিয়েছে।

ভাগ্যক্রমে আর্জেন্টিনায় আঘাতের জায়গায় একটি পোড়া গাছের গুঁড়ি পাওয়া গিয়েছে, তার তেজস্ক্রিয় কারবন মেপে এই ঘটনার তারিখও জানা গিয়েছে—খৃষ্টপূর্ব ৩৮০০ সাল। সম্ভবত সেই সময় থেকেই কিংবদন্তীর সূচনা। এ সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলছে, তবে বিজ্ঞানীদের অনুমান যদি সত্য হয় তবে আমাদের এই পৃথিবীর আরও একটি চাঁদ ছিল অন্তত

কিছু কালের জন্য, পরে একদা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রিকার জ্যোৎস্নাও ঝরেছে তার উপর। আমরা পরে দেখব যে বর্তমান চাঁদকেও এই আনুমানিক চাঁদের মত পৃথিবী সূর্যের থেকে কেড়ে নিয়ে থাকতে পারে, এবং তারও এক দিন এই দশা ঘটতে পারে।

দূর অতীতের কথা ছেড়ে দিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে একটি অপার্থিব বস্তুর মারাত্মক সংঘাত এখনও রহস্যময়, যদিও তা নিয়ে অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নি। এই শতাব্দেই সাইবেরিয়ার জনবিরল অংশে দুটি বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার প্রতিটি এক একটি শহর ধ্বংস করে দিতে পারত। তবে এর মধ্যে যেটি ১৯০৮ সালে ঘটে তার কারণ এখনও জানা নেই ; রুশ বিজ্ঞানীরা বলেন ধূমকেতুর আঘাত, আমরাও ধূমকেতুর প্রসঙ্গে এর আলোচনা করব।

উলকা কখনও ঝাঁকে ঝাঁকে আসে, আমরা পরে দেখব বিয়েলা-র ধূমকেতু নামক এক ধূমকেতু খণ্ড খণ্ড হয়ে এই রকম এক ঝাঁকের সৃষ্টি হয়েছে। আবার পৃথিবীর কক্ষ কোনও উলকা স্রোতের কক্ষকে এক বিশেষ জায়গায় অতিক্রম করলে প্রতি বছর নিয়মিত একই মাসে উলকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ; কোনও কোনও দলের সঙ্গে এই রকম কাটাকাটি হয় নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর পর, তখন উলকা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে।

আজ এই মহাকাশ পরিভ্রমণের যুগে বিজ্ঞানীরা এই 'নভকীটদের' প্রতি নতুন করে মনোযোগ দিয়েছেন নানা কারণে। প্রথমত, মঙ্গলকে পেরিয়ে আরও দূরে মহাকাশ যান পাঠালে অন্তর্বর্তী পথে এদের আঘাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। গ্রহাণুরা সাধারণত ছোটে ঘণ্টায় ৩০,০০০ মাইল বেগে, সুতরাং ক্ষুদ্র কণিকার ধাক্কাও কঠিন আবরণ ভেদ করতে পারে, বৃহত্তর খণ্ড অবশ্য সেই অনুপাতে জখম করবে। কিন্তু বেষ্টনীর মধ্যে গ্রহাণুদের ঘনতা বেশী নয়, তার থেকে বিশেষজ্ঞরা হিসাব করেছেন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দশে এক। বৃহস্পতি-যাত্রী মহাকাশ যান পায়োনিয়ার-১০ সফল ভাবে বেষ্টনী পার হয়েছে, যদিও অনুমানের বেশী ঘা খেয়ে।

কিন্তু গ্রহাণুরা মহাকাশ যাত্রীদের কাজেও লাগতে পারে। দূরের পাড়িতে তারা হয়তো এই সব দ্বীপে স্টেশন বানাবে, হয়তো এদের উপাদান থেকে যাত্রার ইন্ধন সংগ্রহ করবে, কিংবা মূল্যবান ধাতু, মণি বা অন্য আকরিক

নিয়ে আসবে পৃথিবীতে। তা ছাড়া, যদি গ্রহিকারা অসম্পূর্ণ গ্রহের খণ্ড হয় তবে এই আদি বস্তুর থেকে আমরা হয়তো সৌর লোক, এমন কি প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধেও নতুন তথ্য জানতে পারব, কারণ তারা অপরিবর্তিত, তাদের গায়ে পৃথিবী ও অন্য গ্রহের মত ভূমিক্ষয় হয় নি।

বস্তুত, প্রাণবিজ্ঞানীরা উলকা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তার কারণ কোনও কোনও উলকায় কারবনযুক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়েছে, এবং পার্থিব প্রাণ কারবনের ভিত্তিতে গড়া। ১৯৬১ সালে এদের গায়ে মাখনের অনুরূপ বস্তু পাওয়া গেল, উলকার খণ্ড অতি যত্নে সংগ্রহ করল বিশ্বের নানা গবেষণাগার, নিপুণ বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়ল তথাকথিত 'প্রাণ বস্তু', অর্থাৎ নিউক্লিইক অ্যাসিড ও অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুরূপ পদার্থ। নিউক্লিইক অ্যাসিড পার্থিব প্রাণীদের দেহ কোষের কেন্দ্রে থাকে, ঐ বস্তু ছাড়া প্রাণ ও বৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না ; আর অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু জুড়ে জুড়ে প্রোটিন গড়ে ওঠে। (এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে পরে পৃথিবী প্রসঙ্গে।)

এই আবিষ্কারের পর পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা অনেক বেড়ে গেল। সাধারণ অজৈব পদার্থ থেকে গবেষণাগারে এ ধরনের বস্তু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎ বা অতিবেগনি রশ্মির প্রভাবে—মহাকাশে এই প্রভাব বর্তমান। ১৯৬২ সালে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী দাবি করলেন উলকাতে তাঁরা শেওলার মত হীন প্রাণীর জীবাশ্ম বা ফসিল পেয়েছেন, কিন্তু পরে প্রমাণ হল প্রাণীগুলি পৃথিবীজাত, পতনের পরে উলকার গায়ে লেগে গিয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থার কর্মী সিরিল পনামপেরুমা (ইনি আগে ছিলেন সিংহলী) আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক উলকাতে ইনি যে ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড পেয়েছেন বলা যেতে পারে তাদের আণবিক গঠন 'দক্ষিণপন্থী', আর পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রোটিন 'বামপন্থী' অ্যাসিড দিয়ে তৈরি (এই দুই শ্রেণীর মূর্তি আয়নার ছায়ার মত বিপরীত, কিন্তু আর সব রকমে তারা অভিন্ন)। সুতরাং যুক্তি এই যে পৃথিবীর থেকে উলকার গায়ে তা লাগে নি, তা বহিরাগত, হয়তো বহির্বিশ্বে প্রাণের নিশানা ; অবশ্য আপত্তি শোনা যাচ্ছে যে উলকার গায়ের তাপে পার্থিব অ্যামিনো অ্যাসিডের

রূপান্তর হয়েছে। বহির্বিশ্বে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে আরও আলোচনা হবে পরে।

গ্রহাণু দলের পরে বৃহস্পতি সূর্যের থেকে ৪৮'২ কোটি মাইল দূরে, গ্রহদের মধ্যে সে বৃহত্তম এবং সংখ্যা হিসাবে ঠিক মাঝামাঝি তার স্থান। আয়তনে সে এত বিশাল এবং তার বস্তু এত বিভিন্ন যে মনে হয় এখানে আমরা এক নতুন জগতে এসে পড়েছি।

বৃহস্পতির ব্যাস ৮৭,০০০ মাইল, পৃথিবীর ১১'২ গুণ, এবং তার পেটে ১৩০০ পৃথিবীরও বেশী জায়গা হতে পারে। অন্য আটটি গ্রহকে একত্র করলে যে পরিমাণ বস্তু হবে তার দ্বিগুণেরও বেশী ভর তার। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে বৃহস্পতির ঘনতা অনেক কম—পৃথিবীর ৫'৫, তার ১'৩৮ (জলের ঘনতা এক); এক ফলে সেখানে অভিকর্ষীয় আকর্ষণ পৃথিবীর ২'৫ গুণ, এই টানে কয়েক শো মাইল গভীর গ্যাসের স্তর আটকা পড়ে আছে তার গায়ে। যদি হঠাৎ আমরা সেখানে গিয়ে পড়ি তবে হয়তো আপন দেহের ভারেই ভেঙে পড়ব।

বৃহস্পতি অতি দ্রুত পাক খায়, তার দিন মোটে আমাদের ন ঘণ্টা ৫০ মিনিটের সমান। এর ফলে সে পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশী চ্যাপটা, তার দুই মেরুর অন্তর্বর্তী দূরত্ব নিরক্ষ রেখার ব্যাসের ১৬ ভাগের ১৫ ভাগ। কিন্তু সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অনেক ধীরে সুস্থে, সেকেন্ডে ৮'১ মাইল। তার বছর ঘুরতে চলে যায় আমাদের ১১'৯ বছর।

পৃথিবী ছাড়া গ্রহদের মধ্যে এক বৃহস্পতিরই জোরালো চুম্বকী ক্ষেত্র জানা আছে, হয়তো তার কারণ দ্রুত পাক-খাওয়া গ্রহের গর্ভে আছে তপ্ত তরল ধাতু, যেমন পৃথিবীতে। ঝড়বিক্ষুব্ধ বহির স্তরে নিরক্ষ রেখা ঘিরে পৃথিবীর মত কতগুলি বিকিরণ বেষ্টনীও আছে, সেখানে অসংখ্য বিদ্যুৎধর্মী কণা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে, তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে অপর্যাপ্ত রেডিও শক্তি।

অতিকায় গ্রহের দল বলও ভারী। উপগ্রহের সংখ্যা ১২, তার দুটি আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়, গ্যানিমিড বুধ গ্রহের চেয়েও বৃহদাকার। সেই কারণে তারও আবহ আছে—যদিও অতি সামান্য। এই আবিষ্কারটি ঘটে ১৯৭২ সালে যখন সে একটি তারাকে ক্রমশ আড়াল করে; ইংলন্ড,

ভারত ও জাভার থেকে পর্যবেক্ষকরা দেখেন তারার আলো অকস্মাৎ ঢাকা না পড়ে ধীরে ধীরে কমল এবং পরে গ্রহণের শেষে একই সময় ধরে ক্রমশ বাড়ল। এই পরীক্ষায় তার ব্যাস সূক্ষ্ম ভাবে সংশোধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৬৭ মাইল। বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহের ব্যাস ১৭৬০ মাইল থেকে ঐ সীমার মধ্যে, বাকি আটটির দশ থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে।

বৃহস্পতির উপাদান প্রধানত হাইড্রোজেন, এ বিষয়ে সে সূর্যেরই মত। বর্ণালীতে অ্যামোনিয়া ও মিথেনের স্বাক্ষর মিলেছে, তা ছাড়া আছে জল এবং নিষ্ক্রিয় পদার্থ কিছু হিলিয়াম। জল বাদে পৃথিবীতে এগুলি সবই গ্যাস, কিন্তু বৃহস্পতিতে কোথাও তরল বা কঠিন রূপেও থাকতে পারে। কেন্দ্রস্থিও অষ্ঠির উপরে আবহের গভীরতা ৬০ থেকে ৩৬০০ মাইল পর্যন্ত নানা সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে। অষ্ঠির গায়ে উপর স্তরের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহু গুণ—এক সোভিয়েট সূত্র অনুসারে দশ কোটি গুণ। বাইরের স্তর -১৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি শীতল। এক মার্কিন বিজ্ঞানী পেয়েছেন -১৪২, এঁর মতে শুধু সৌর উত্তাপ থেকে তা হওয়া উচিত -২৭০ ডিগ্রি। গ্রহটি সূর্যের উত্তাপ যা পায় তার প্রায় তিন গুণ বিকীর্ণ হয় তার গা থেকে, তার আছে নিজের উত্তাপ। সেই কারণে ও উপরের চাপে নিচের স্তরগুলি ক্রমশ উষ্ণতর। উপরোক্ত সোভিয়েট সূত্রটির হিসাবে ভিতরের আঁটি ২০,০০০ ডিগ্রি তপ্ত, কিন্তু অনেকের মতে তাপ তার কম।

বৃহস্পতির আভ্যন্তর তেজের কারণটা এখনও রহস্যাবৃত। তারার অন্তরে যে সাংঘাতিক চাপে পরমাণু ভাঙা গড়ার থেকে উত্তাপ সৃষ্টি হয় বৃহস্পতির গর্ভে চাপ ততটা নয়; পৃথিবী তেতেছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়ে; কিন্তু বৃহস্পতিতে এমন পদার্থ সম্ভবত এক দশমাংশের কম। কুইপার বলেছেন গ্রহটি এখনও সংকুচিত হচ্ছে, তাই আঁটির কঠিন হাইড্রোজেন কখনও জায়গায় জায়গায় ফেটে যায়, তার থেকে উৎসারিত হয় অপর্যাপ্ত উত্তাপ। হাইড্রোজেন অবশ্য কঠিন হয়ে জমেছে প্রচণ্ড চাপে। যদি এই হয় যে অভিকর্ষীয় টানে এখনও সংকোচন চলছে তা হলে সৌর পরিবারের সৃষ্টি এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নি এই অংশে।

আঁটির উপাদান ও চেহারা কি তা নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছে। আগে অনেকে ভেবেছে তা হয়তো পাথর বা ধাতু, এখন সাধারণ ধারণা কঠিন

হাইড্রোজেন। এই অবস্থায় গ্যাসটি হয়ে পড়ে ধাতু, তার ব্যবহার সম্পূর্ণ বদলে যায়। এক সাম্প্রতিক অনুমান অনুসারে আবহের উচ্চতম এবং শীতলতম স্তরে আছে জমাট অ্যামোনিয়ার বরফ, তার পর তার ফোঁটা ও বাষ্প; নিচে জলের ঐ তিন রূপ; তার নিচে কঠিন ত্বক অথবা তরল হাইড্রোজেনের সাগর, তার তলায় ধাতব হাইড্রোজেন এবং সবশেষে পৃথিবীর মত পাথুরে আঁটি। কিন্তু আসলে সঠিক কিছু জানা নেই।

দ্রুত আবর্তনের ফলে আবহ অতিশয় বিক্ষুব্ধ। দূরবিনে দেখা যায় গায়ে গোলাপী বা ধূসর মেঘের প্রবাহ, হয়তো তা জমাট অ্যামোনিয়া ও মিথেনের দানা। তার মাঝে কয়েক লক্ষ মাইল দীর্ঘ নানা রকম চিহ্ন চোখে পড়ে। নিরক্ষ রেখার ঠিক দক্ষিণে বিখ্যাত 'লাল দাগ' বৃহস্পতির আর এক অমীমাংসিত রহস্য। বহু বছর আগে আবিষ্কারের পর থেকে এর আয়তন বেড়েছে কমেছে, কখনও তা উজ্জ্বলতর হয়েছে কখনও প্রায় মিলিয়ে গিয়েছে। লাল দাগ নাম হলেও রং কখনও হয়ে পড়ে সবুজাভ সাদা। এই চলমান বহুরূপী চিহ্নটি বর্তমানে পৃথিবীর চেয়েও বড়, মাপ ২৫০০০×৮০০০ মাইল; দৈর্ঘ্য কখনও ৩০,০০০ মাইল পর্যন্ত বেড়েছে। দাগটির ব্যাখ্যা নিয়ে নানা অনুমান হয়েছে—চুম্বকী ক্ষেত্রের অস্বাভাবিক বিচ্যুতি বা আবহের নিচে প্রাকৃতিক বৈষম্যের ফল, নিচে কিছুর সঙ্গে যুক্ত অতিকায় ঘূর্ণি, উষ্ণ অঞ্চলের উপরে আবহের পরিচলন, গ্যাস সমুদ্রে হিলিয়ামের দ্বীপ, তরলীভূত বা প্রায় তরলীভূত ঘন আবহে ভাসমান কঠিন বস্তু, ইত্যাদি। ১৯৭১ সালে তিন মার্কিন বিজ্ঞানী বলেন প্রকাণ্ড কঠিন হাইড্রোজেন খণ্ড গ্যাস সাগরে ভাসছে; তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে মিশ্রিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের উপর যদি পার্থিব আবহ-চাপের কয়েক লক্ষ গুণ বেশী চাপ পড়ে তবে হাইড্রোজেন কঠিন রূপ নিয়ে বাকি মিশ্র গ্যাসের উপর ভাসবে তার ঘনতা কমে যাবে বলে, যেমন বরফ ভাসে জলে; আবহের কয়েক হাজার মাইল গভীর স্তরে এই রকম চাপ নাকি সম্ভব। এই হাইড্রোজেন খণ্ড গ্রহের উর্ধ্বমুখী উষ্ণ প্রবাহ আটকাবে, ফলে উপরের অপেক্ষাকৃত শান্ত অঞ্চলে সাদা অ্যামোনিয়া মেঘের ঢাকনা থাকবে না, সুতরাং গভীর অংশের লাল রং দেখা যাবে। আবহের স্রোতে বা অন্য কারণে দাগটি ওঠা নামা করলে যথাক্রমে তা ছোট বড় দেখাবে।

সুতরাং দেখা গেল বৃহস্পতি সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু অনিশ্চিত। শুক্র ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে এই অবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছে যন্ত্রবাহী মহাকাশ যান, বৃহস্পতিরও এখন এই অধ্যায় শুরু হয়েছে। পায়োনিয়ার-১০ ১৯৭৩ ডিসেম্বরে তার মেঘের ৮১,০০০ মাইল উপর দিয়ে উড়ে যায় ২১ মাস যাত্রার পর, রেডিও বার্তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় ৪৬ মিনিট পরে। বৃহস্পতির অভিকর্ষ তখন তাকে শনির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, হয়তো পরে সে তার ছবিও পাঠাবে। পরিশেষে সে ছুটবে সৌর লোকের সীমার দিকে, তা অতিক্রম করে হবে শূন্যপ্রায় দূর মহাকাশে মানুষের প্রথম সাক্ষী—কিন্তু পথহারা, উদ্দেশ্যহীন। এই দূতের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তার চলন শক্তি আসবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের (প্লুটোনিয়াম ২৩৮) ক্ষয়জনিত তাপ থেকে ; পূর্বতন যানগুলি এই শক্তি সংগ্রহ করেছে সূর্যের থেকে, বিশেষ ব্যাটারির সাহায্যে, কিন্তু পায়োনিয়ারের দূর পথে সূর্যতেজ দুর্বল। ১৯৭৩ এপ্রিলে পায়োনিয়ার-১১ যাত্রা শুরু করে, আশা করা যায় বৃহস্পতির ২৬,০০০ মাইল কাছ দিয়ে সে যাবে। তার পর তার অভিকর্ষের ঠেলায় শনিকে লক্ষ করে ছুটে সেখানে পৌঁছাবে ১৯৭৯ নভেম্বরে। এই দশকের মাঝামাঝি আরও উত্তেজক এক দূর পরিক্রমের প্রস্তুতি চলছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তা বাতিল হতে পারে। এই দূত বৃহস্পতি, শনি, নেপ্‌চুন, ইউরেনাস এবং প্লুটোর অন্তত তিনটির সঙ্গে এক যাত্রায় সাক্ষাৎ করত, ভাগ্যক্রমে তখন তারা এমন জায়গায় থাকবে যে এক একটি গ্রহের মহাকর্ষীয় টান যানটিকে পরবর্তী গ্রহের দিকে বিক্ষিপ্ত করতে পারত ; এই যোগাযোগ ও সুযোগ ১৭৯ বছরে আর হবে না।

পায়োনিয়ার-১০ বৃহস্পতির বিকিরণ বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে ক্রমাগত বিদ্যুৎবাহী কণার প্রবল আঘাত খায় ; দেখা গেল এই বেষ্টনীর তেজ মানুষ-মারা তেজের হাজার গুণ বেশী, এবং দশ গুণ বেশী প্রাক্তন অনুমানের (পৃথিবীর দশ লক্ষ গুণ)। এই মহাকাশ দূতের অন্যান্য আবিষ্কার : চুম্বকী ক্ষেত্রের জোর পার্থিব ক্ষেত্রের দশ গুণ এবং এই চুম্বকের উত্তর দক্ষিণ পৃথিবীর উলটো। দিন রাত্রির তাপে বিশেষ পার্থক্য নেই, এই আবিষ্কার প্রাক্তন ধারণাগুলির সমর্থন করে যে বৃহস্পতির পাক দ্রুত (পৃথিবীর হাজার গুণ), যার ফলে আবহের গ্যাসে তাপসাম্য ঘটে, এবং তার গর্ভে

নিজস্ব তাপ আছে; আসলে আর একটু বড় হলেই তার ভিতরে এমন পারমাণবিক চুলা জ্বলে উঠত যে গ্রহ না হয়ে সে হত তারা। পায়োনিয়ার-১০ আবহের গ্যাসে হিলিয়াম পেয়েছে।

বৃহস্পতির মত ভিন্ন প্রকৃতির গ্রহে প্রাণীর বাস অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীর উর্বর কল্পনায় বিষয়টা বাদ পড়ে নি। আবহে জল থাকলে সম্ভবত যথেষ্ট অকসিজেনের অভাব হবে না, প্রোটিন ও অন্যান্য পার্থিব জৈব বস্তুর উপাদান কারবন ও নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে মিথেন ও অ্যামোনিয়ার থেকে। বস্তুত বৃহস্পতির উপাদানগুলি চাপে ফেলে তার ভিতরে বিদ্যুৎ চালন করে পনামপেরুমা অ্যামিনো অ্যাসিড ও নিউক্লিইক অ্যাসিডের বস্তু পেয়েছেন, গ্রহের দ্রুত পাক এই রকম বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি করে। কি ধরনের প্রাণীর জন্ম হয়ে থাকতে পারে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন সিগেল। তিনি একটি ছত্রাক সংগ্রহ করেন ওএল্‌স দেশের এক বারোয়ারি প্রস্রাবখানা থেকে, সেখানে অ্যামোনিয়া গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধ। দেশে ফিরে পরীক্ষা করে দেখলেন গবেষণাগারে অ্যামোনিয়ার পরিমণ্ডলে তা বেশ ভাল গজায়। তা ছাড়া, প্রায় অনুরূপ এক প্রাণীর ফসিল পাওয়া গিয়েছে ক্যানাডায়, তার বয়স ২০০ কোটি বছর। আদি কালে পৃথিবীর আবহ সম্ভবত বৃহস্পতির মতই ছিল, সুতরাং সিগেল বলেন এখন সেখানে হয়তো এ রকম প্রাণী আছে!

বৃহস্পতির উপগ্রহ ইয়োরোপা ও গ্যানিমিড এবং শনির বৃহত্তম চাঁদ টাইটানেও প্রাণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জল্পনা হচ্ছে। সাম্প্রতিক পরীক্ষা অনুসারে প্রথম দুটিতে যথেষ্ট জল থাকতে পারে, এবং গ্যানিমিডের যে আবহ আছে তা আমরা দেখেছি। টাইটানের আছে আরও ভারী আবহ, সম্ভবত সেই কারণে প্রাণের পক্ষে সে খুব হিমশীতল নয়, যদিও উপগ্রহটি সূর্য থেকে পৃথিবীর প্রায় দশ গুণ দূরে।

•

সূর্য থেকে বৃহস্পতি যত দূরে শনির দূরত্ব তার প্রায় দ্বিগুণ—৮৮.৮ কোটি মাইল; আমাদের ২৯.৫ [বছরে তার এক বছর। ব্যাস ৭২,০০০ মাইল। প্রকাণ্ড, গ্যাসীয়, অর্ধসমাপ্ত এই জগৎ বৃহস্পতির চেয়েও আজব। পৃথিবীর ৯৫ গুণ ভারী, কিন্তু ঘনতা জলের সাত দশমাংশেরও কম (০.৬৮), অর্থাৎ

সে এত হালকা যে জলে ভাসবে। তারও ঘুর্ণি বেগ বেশী, দশ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে এক দিন, সুতরাং পেট কিছুটা ফোলা।

এই কটি দেশ ঘিরে আছে শনির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, যা আর কোনও গ্রহের নেই। সেখানে অবস্থিত তিনটি উজ্জ্বল বলয় (ring), প্রথমটি শুরু হয়েছে গ্রহগাত্রের ৬০০০ মাইল দূরে। এই 'ছায়াপথ' চওড়ায় সব সুদ্ধ ৪২,০০০ মাইল হলেও সম্ভবত মাত্র দশ মাইল পুরু। এখানে এক উপগ্রহ সৃষ্টি হতে হতে মাঝপথে থেমে গিয়ে এই পরিণাম ঘটেছে এই রকমই বর্তমান ধারণা। অবশ্য আর এক বিকল্প ধারণা অনুসারে এক সম্পূর্ণ উপগ্রহ ভেঙে এই বলয় ত্রয় সৃষ্টি হয়েছে, কি করে তা ঘটতে পারে জেম্‌স জীন্‌স এক জায়গায় তা বর্ণনা করেছেন।

বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহটি তার মহাকর্ষীয় টানে এখন প্রায় ডিমের মত লম্বা হয়ে পড়েছে, সে আরও কাছে আসবে আরও লম্বা হবে, তার পর এক সময়ে ভেঙে দু টুকরো হবে ; ক্রমে এই দুই চাঁদ প্রত্যেকে আবার দ্বিভক্ত হবে এবং এমনি করে অনির্দিষ্ট কাল চলবে এই ভাঙার কাজ। এই ধারণা অনুসারে শনির বলয়ও এই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে বেশী কাছে এসে-পড়া এক চাঁদের থেকে। শনির এক অক্ষত উপগ্রহ এবং মঙ্গলের ফোবস এখন নাকি বিপজ্জনক সীমার কাছাকাছি এসেছে। আমাদের চাঁদও এক দিন আসবে, ক্রমে অসংখ্য খণ্ড চাঁদ দিয়ে পৃথিবীরও হবে শনির মত বলয়। আলো প্রতিফলনের ক্ষেত্র বাড়ার ফলে তখন চাঁদের আলো থাকবে সারা রাত। এত জোৎস্নায় কবিরা মুগ্ধ হলেও এক নতুন বিপদ দেখা দেবে ; কিছু ক্ষণ পর পরই এই খুদে চাঁদগুলি ঠোকাঠুকি খেয়ে উলকার মত ঝরে পড়বে পৃথিবীতে, যেমন এখন পড়ছে শনির গায়ে। মানুষ যদি তখনও থাকে তো এই শিলা বৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। কিন্তু চাঁদের এই পরিণতি ছাড়া আর এক সম্ভাবনাও যে আছে তা আমরা পরে দেখব।

ফিন্‌ল্যান্‌ডের জ্যোতিষী কারি লুমে সম্প্রতি এই চূর্ণ উপগ্রহের ধারণাটা সমর্থন করে যুক্তি দিয়েছেন যে কোনও কোনও উপগ্রহের—যেমন শনির মিমাস, বৃহস্পতির আমাল্‌থিয়া ও মঙ্গলের ফোবস—প্রদক্ষিণ পথ ক্রমশ তাদের গ্রহের কাছে এগিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে বৃহস্পতি ও অন্যান্য গ্রহও

বলয়যুক্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে কয়েক বছর আগে নোবেল পুরস্কার বিজেতা হানেস আল্‌ফভেন দেখিয়েছিলেন যে গ্রহদের মধ্যে একমাত্র শনিই এমন ভরের অধিকারী যাতে তার রোশ (Roche) সীমানার মধ্যে বস্তুর প্রবেশ সম্ভব (এই পরিধির মধ্যে উপগ্রহ হয় ভেঙে যাবে, নয়তো তার সংগঠন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে), অথচ বস্তু এত কাছে আসবে না যাতে গ্রহের টানে তা তার গায়ে আছড়ে পড়ে। অর্থাৎ শনির বলয় উপগ্রহ সৃষ্টির আগের বা পরের অবস্থা দুইই হতে পারে।

উপগ্রহ ভেঙে যেমন অসংখ্য ক্ষুদ্র উপগ্রহ হয়ে থাকতে পারে, তেমনি এক ধারণা অনুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোনও গ্রহ অতিকায় বৃহস্পতির বেশী কাছে এসে পড়ায় গ্রহাণু দলের সৃষ্টি। ঈরসের আকৃতি যে লম্বা তা আমরা দেখেছি, হয়তো দ্বিভক্ত হতে হতে সে বেঁচে গিয়েছে।

যাই হক, শনির আশ্চর্য সুন্দর বলয়গুলির একটিই রূপ আমরা সর্বদা দেখি না আমাদের দূরবিনে। গ্রহটি আমাদের দৃষ্টিতে একটু হেলে আছে বলে তার প্রদক্ষিণ কালের অর্ধেক সময়, অর্থাৎ প্রায় পনের বছর, বলয়ের উত্তর দিক এবং বাকি অর্ধেক সময় দক্ষিণ দিক আমাদের চোখে পড়ে। উপর দিকের দৃষ্টিগোচর অংশ ছোট হতে হতে অবশেষে নিচের দিক দেখা দেয় এবং ক্রমশ বড় হতে থাকে; বলয় এত পাতলা যে মাঝখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য তা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রায় প্রতি ৩০ বছরে আমরা বলয়দের ঠিক একই রূপ দেখি।

যুক্তরাষ্ট্রের জেট প্রোপাল্‌শাল গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা বলয়ে রাডার সংকেত পাঠিয়ে জোরালো প্রতিধ্বনি পেয়েছেন এবং তার থেকে মনে করেন তাদের উপাদান ধূলি বা বরফ নয়, সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলেছে বেশ বড় পাথরের খণ্ড, তাদের ব্যাস এক মিটারের কম নয়।

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শনির নয়টি উপগ্রহ জানা ছিল, বলয়ের বাইরে। ঐ বছরের শেষে প্যারিসে ডল্‌ফাস দশমটি আবিষ্কার করেন বলয়ের সীমার কাছাকাছি; তার নাম হয়েছে জুনাস, ব্যাস মাত্র ১০০-২০০ মাইল, প্রদক্ষিণ কাল ১৮ ঘণ্টা। মিমাস শনির মাত্র ১১৫,০০০ মাইল দূরে। সবচেয়ে বড় টাইটান, বুধের সমান তার আয়তন, মঙ্গলের মত তার কমলা রং।

টাইটানের ও পারে দূরতম চাঁদ ফিবি এক বিশেষত্বের অধিকারী;

সমগ্র সৌর জগতে ৩২ সুনির্ধারিত উপগ্রহের মাত্র ছটির প্রদক্ষিণ গতি নিজ নিজ গ্রহের স্বার্বতন গতির বিপরীতমুখী—ফিবি এদের অন্যতম। শনির নিকটতম পাঁচটি উপগ্রহ রহস্যজনক, তাদের অন্তত তুটি মনে হয় বরফের তৈরি মসৃণ গোলক।

বৃহস্পতির প্রসিদ্ধ লাল দাগের মত, ১৯৬০ সালে শনির গায়ে ৫০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দাগ ধরা পড়ে; বস্তুটি এক অস্থায়ী সাদা উপবৃত্ত, সঙ্গে ছিল আরও কয়েকটি দাগ, এদের সাহায্যে শনির মেঘমণ্ডলের ঘূর্ণি বেগ মাপা সম্ভব হয়েছে।

বৃহস্পতি ও শনি স্পষ্টই এক দলের গ্রহ। তুইই গ্যাসীয় দানব, এবং অপেক্ষাকৃত হালকা। অনেকের অনুমান শনির কেন্দ্রেও আছে ভীষণ চাপে ঠাসা কঠিন হাইড্রোজেনের অষ্ঠি। অন্যরা বলেন ছোট পাথুরে আঁটিকে ফিরে আছে প্রায় ২০,০০০ মাইল পুরু বরফের ভারী স্তর। হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হিলিয়ামের ঘন বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল, এই মিশ্রিত বস্তুগুলির বিক্ষুব্ধ মেঘ ক্রমাগত স্রোতে স্রোতে বয়ে চলেছে। এই স্রোতগুলি কখনও কয়েক শো মাইল গভীর, বিভিন্ন অঞ্চলে বা অক্ষাংশে তাদের বিভিন্ন বেগ, কটি দেশে সবচেয়ে দ্রুত। মনে হয় শনির বায়ুতে বৃহস্পতির চেয়ে হালকা গ্যাস কিছু বেশী, এবং অ্যামোনিয়া জমে গিয়েছে বলে তার পরিমাণ কম। তুই গ্রহেরই বহির্দিক অতিশয় শীতল, শূন্যের নিচে ১৩০ ডিগ্রি কি তারও কম; তুইয়েরই সঙ্গে আছে বহু পারিষদ উপগ্রহ, এবং এক বা একাধিক চাঁদ গ্রহের পাক অনুসরণ করে তাকে প্রদক্ষিণ করে না, উলটো দিকে চলে।

প্রাচীন কালে যে ক'টি গ্রহ জানা ছিল এবং খালি চোখে যা ধরা পড়ে তাদের মধ্যে শনিই শেষ। এ দেশেও পরবর্তী গ্রহগুলির কোনও ভারতীয় নাম নেই। এদের মধ্যে প্রথমটি ইউরেনাস, ১৭৮১ সালে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী উইলিয়াম হার্শেল যখন তা আবিষ্কার করেন তখন সারা বিশ্ব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সূর্য থেকে শনির যতখানি দূরত্ব, শনি আর ইউরেনাসের মধ্যে ফাঁক তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৯০ কোটি মাইল। গ্রহটি পৃথিবীর ১৪·৫ গুণ ভারী, তাপ প্রায় -১৭০ ডিগ্রি, বছর আমাদের ৮৪ বছরের সমান, দিন

আমাদের দশ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট দীর্ঘ। বর্ণালীর পরীক্ষায় দেখা যায় যে এখানেও বায়ু বৃহস্পতি ও শনির গ্যাসগুলি দিয়ে তৈরি।

কিন্তু সৌর পরিবারের অন্যান্যদের মত ইউরেনাসেরও বিশেষত্ব আছে। গ্রহ কুলে শুক্র ছাড়া এক সেই প্রদক্ষিণের উলটো দিকে পাক খায়। কক্ষ পথের সমক্ষেত্র থেকে তার নিরক্ষ রেখা হেলে আছে ৯৮ ডিগ্রি; এর তুলনায় পৃথিবীর নতি (inclination) মাত্র ২৩'৫ ডিগ্রি, এবং অধিকাংশ অন্য গ্রহের অনুরূপ কিংবা আরও কম নতি। এর ফলে দাঁড়ায় এই যে সূর্যের যেটুকু তাপ এসে পৌঁছায় এখানে তার সবটাই পায় ইউরেনাসের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল কক্ষের এক প্রান্তে; ৪২ বছর পরে অপর প্রান্তে উত্তর মেরুর ভাগ্যে জোটে এই দান। আঁধার মেরুর কাছে গ্রাহিক পাকের অনুসরণে সন্ধ্যা সকাল বলে কিছু দেখা দেয় না, নিরন্তর রাত্রির আকাশে শুধু তারার মিছিল চলে। এই অসহ জগতে মানুষ গিয়েছে যদি আমরা কল্পনা করি তো একটা দৃশ্যে সে কিছুটা চমৎকৃত হবে—প্রায় অর্ধশতাব্দব্যাপী রাত্রিতে একই সঙ্গে আকাশে তার পাঁচ পাঁচটি চাঁদ দিগন্তের কাছাকাছি অতি দ্রুত ছুটে চলেছে।

মার্কিন বিজ্ঞানী ড্যানিয়েলসন ও সহকর্মীরা আকাশের ১৯ মাইল উঁচুতে বেলুনে চড়িয়ে ৩৬ ইঞ্চি দূরবিন পাঠিয়ে ইউরেনাসকে পরীক্ষা করেছেন, তাতে মনে হয় হাইড্রোজেন অণুর আধা-স্বচ্ছ আবহের নিচে আছে মিথেন গ্যাসের সমবিস্তৃত পুরু পরদা। নিরক্ষ রেখায় গ্রহের ব্যাস ৩২,১০০ মাইল, গড় ঘনতা পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ। সম্প্রতি ইউরেনাসের ষষ্ঠ চাঁদ সন্দেহ করা হয়েছে মিরান্ডা ও এরিয়েল উপগ্রহের মধ্যে। সম্ভবত দূর গ্রহদের সব চাঁদ এখনও ধরা পড়ে নি—শনির বলয়ের এক ক্ষীণ বিন্দু হয়তো তাই এবং বৃহস্পতির আমাল্‌থিয়া ও আইয়ো-র মধ্যে হয়তো আছে একাদশ উপগ্রহ।

এর পরে নেপ্‌চুন সূর্যের প্রায় ৩০০ কোটি মাইল দূরে, তাকে আবিষ্কার করা হয় নিউটনীয় গণিতের সূত্র ধরে। ইউরেনাস আত্মপ্রকাশ না করলে সেও ধরা পড়ত না, কারণ ঐ গ্রহ আবিষ্কারের ৬০ বছরের মধ্যে জ্যোতিষীরা তার কক্ষে কতগুলি অসঙ্গতি পান; চ্যুতির পরিমাণ প্রায় চাপের (arc) দু মিনিট (অর্থাৎ এক ডিগ্রির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ), সেটা এত বেশী যে

অগ্রাহ্য করা যায় না। এর থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে ইউরেনাসের ও পারে আর একটি অদৃষ্ট গ্রহ আছে যার মহাকর্ষীয় প্রভাব এই গোলমালটার সৃষ্টি করেছে।

১৮৪০ সালে ইংরেজ গাণিতিক অ্যাডাম্স ও ফরাসী গাণিতিক লেভেরিয়ে পৃথক ভাবে হিসাব করলেন এই গ্রহটির কোথায় থাকা উচিত। লেভেরিয়ের ছক অনুযায়ী দূরবিন লক্ষ করে ১৮৪৬ সালে জারমেনির এক জ্যোতিষী আধ ঘণ্টার মধ্যে নেপ্‌চুনকে দেখতে পান। তার চেহারা হালকা সবুজ এক থালার মত, উজ্জ্বলতা আট মানের তারার বেশী নয়: সূর্য প্রদক্ষিণ করতে এই গ্রহের লাগে ১৬৬ দিন। সঙ্গে চলে দুই উপগ্রহ, তাদের মধ্যে ট্রাইটন আমাদের চাঁদের চেয়েও বড় ও নিকট। তা ছাড়া, শনির যেমন ফিবি, তেমনি নেপ্‌চুনের ট্রাইটনও গ্রহের স্বাবর্তন গতির বিপরীত মুখে তাকে প্রদক্ষিণ করে। তার কক্ষ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে, ফলে এক থেকে ১০০ কোটি বছরের মধ্যে সে সম্ভবত নেপ্‌চুনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, অথবা তাকে ঘিরে এক বলয় সৃষ্টি করবে শনির মত; মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস ম্যাকর্ড কম্পিউটারের হিসাবে এই তথ্য পেয়েছেন। নেপ্‌চুনের বায়ুমণ্ডল আগের তিনটি গ্রহের উপাদানেই তৈরি।

বৃহস্পতি থেকে নেপ্‌চুন পর্যন্ত যদি এক দলে পড়ে তো নবম গ্রহ প্লুটো আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন, বরং আপাত দৃষ্টিতে প্রথম গ্রহ বুধের সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে। প্লুটো আমাদের এত দূরে যে নেপ্‌চুনের চেয়ে ৬০০ গুণ ক্ষীণ দেখায়, তার প্রতি বর্গ গজ পৃথিবীর ১৬০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সৌর শক্তি লাভ করে। গাত্র তাপ প্রায় -২২০ ডিগ্রি। সে বিচরণ করে সূর্যের ২৭০ কোটি থেকে ৪৬০ কোটি মাইলের মধ্যে, অর্থাৎ তার কক্ষের উপবৃত্ত অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অনেকটা চাপা; এ বিষয়েও বুধের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। এই পথে এক বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগে আমাদের ২৪৮ বছর।

প্লুটোর চাপা কক্ষ পথ কখনও কখনও তাকে নেপ্‌চুনের ভিতর দিকে নিয়ে আসে, তখন ঐ গ্রহের থেকে সে প্রায় ৩.৫ কোটি মাইল এগিয়ে আসে সূর্যের দিকে। এই কারণে অনেকে মনে করেন সে নেপ্‌চুনের লুপ্ত উপগ্রহ, সৌর লোক সৃষ্টির অল্প পরে নেপ্‌চুন তাকে হারায়। এই তত্ত্বের ভিত্তি

খুব দৃঢ় নয়, কিন্তু তদনুসারে সূর্য প্রথম উজ্জ্বল হয়ে নেপ্‌চুনের সদ্যোজাত আবহ থেকে কিছু গ্যাস তাড়িয়ে দেয়, তার ফলে গ্রহটির ভর ও অভিকর্ষ এত কমে যে প্লুটো তার টান ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। নেপ্‌চুনের অন্য উপগ্রহ ট্রাইটনও এই রকম মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু পরে কাছে এসে আবার বাঁধা পড়েছে, যদিও এ বার তার প্রদক্ষিণ গতির দিক উলটে গিয়েছে পাকের তুলনায়। প্লুটো এখনও স্বাধীন, যদিও এক দিন যে আবার নেপ্‌চুনের আওতায় ধরা পড়তে পারে। এখানে মনে পড়বে যে বুধকে কেউ কেউ শুক্র গ্রহের বিচ্ছিন্ন উপগ্রহ মনে করেন। এও লক্ষণীয় যে বুধের (ও শুক্রের) মত প্লুটোরও নিজের কোনও উপগ্রহ জানা নেই।

কিন্তু প্লুটো এখনও রহস্যময়, এক মস্ত হেঁয়ালি। ইউরেনাসের গতির ব্যতিক্রম থেকে যেমন নেপ্‌চুন ধরা পড়েছিল তেমনি এই দুই গ্রহের নিয়মছাড়া ব্যবহার থেকে জ্যোতিষীরা এক নবম গ্রহের প্রভাব সন্দেহ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে ক্লাইভ টম্‌বো যখন তাকে আবিষ্কার করলেন তখন দেখা গেল সে এত ক্ষুদ্র যে তার দ্বারা বিশাল প্রতিবেশীদের উপর এতখানি মহাকর্ষীয় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়, সুতরাং হয়তো ভবিষ্যদ্‌বাণী ভুল এবং আবিষ্কার আকস্মিক। নেপ্‌চুনের কক্ষ ও গতি সম্বন্ধে এখনও কিছু সন্দেহ আছে বলে তার থেকে প্লুটোর ভর সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়, শ্রেষ্ঠ অনুমান পৃথিবীর ১১ শতাংশ মাত্র। তা ছাড়া, আপাত দৃষ্টিতে আকারেও সে ক্ষুদ্র, কুইপারের মাপ অনুসারে ব্যাস ৩৭০০ মাইল মাত্র। সুতরাং নেপ্‌চুনের গতির বিচ্যুতি ঘটাবার মত ভর তাকে আরোপ করতে হলে ঘনতা অসম্ভব রকম বেশী বলে মানতে হয়।

এ দিকে ১৯৫৫ সালে ওআকার ও হার্ডি দেখেন যে তার উজ্জ্বলতা নিয়মিত বাড়ে কমে, তার থেকে এঁরা বার করেন যে আপন অক্ষ ঘিরে এক পাক ঘুরতে তার লাগে আমাদের ছ দিন ন ঘণ্টা। ১৯৬৪ সালে হার্ডি নতুন তথ্য প্রকাশ করেন, দিনের দৈর্ঘ্য আরও সূক্ষ্ম ভাবে মেপে তা দাঁড়ায় আমাদের ছ দিন ন ঘণ্টা ১৬ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড। তিনি এও লক্ষ করেন যে তার উজ্জ্বলতা চার দিন ধরে বাড়ে, তার পর দু দিনে সবচেয়ে কমে যায়, যার ইঙ্গিত সম্ভবত এই যে থালাটা কেন্দ্রে উজ্জ্বলতম, ধারের দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তা হলে কুইপার যে ব্যাস নির্ধারণ করেছেন তা হয়তো

শুধু কেন্দ্রীয় অংশের এবং আসলে গ্রহটি হয়তো অনেক বড়। ইউরেনাস ও নেপ্‌চুনের তুল্য না হলেও হয়তো পৃথিবীর চেয়ে সে অনেক বৃহৎ, তা যদি হয় তো সে ঐ গ্রহদুটির গতিতে ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে, যেমন প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল। অবশ্য এই সম্ভাবনা গ্রহণ করলে প্লুটো যে নেপ্‌চুনের প্রাক্তন গ্রহ হতে পারে সেই সম্ভাবনা দুর্বল হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে প্লুটো যদি সত্যিই ক্ষুদ্রকায় হয় তা হলে প্রতিবেশী গ্রহদের খাপছাড়া গতির জন্য দায়ী হয়তো অন্য এক দশম গ্রহ, অনেকের মনে এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্লুটো আবিষ্কারের পর থেকে বিজ্ঞানীরা সৌর লোকের দূরবর্তী অঞ্চলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন, তাতে তার মাপের গ্রহ দ্বিগুণ দূর পর্যন্ত ধরা পড়ত, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি। (তত্ত্ব বলে যে সূর্যের মহাকর্ষীয় প্রভাব প্লুটোর ১০০০ গুণ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, এর পরে অন্যান্য তারার আকর্ষণ তাকে হার মানায়।) চাক্ষুষ সাক্ষ্য না থাকায় কেউ কেউ গণিতের প্রমাণ খুঁজছেন। লেলিনগ্রাডে চেবোটারেভ দূর গ্রহগুলির গতি পরীক্ষা করে বলেন আর একটি নিশ্চয় আছে, সম্ভবত তা মঙ্গলের থেকে বড় নয় এবং প্লুটোর থেকে বহু দূরে। ১৯৭২ সালে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ ব্রেডি হ্যালি-র ধূমকেতুর আবির্ভাবের অনিয়ম পরীক্ষা করে দেখান যে প্রায় ১৭০০ বছরে সে সূর্যের কাছে কখনও কখনও হিসাবের চার দিন আগে পরে এসে পৌঁছেছে, যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে। তাঁর মতে এই শক্তি দশম গ্রহের মহাকর্ষ, এবং কম্‌পিউটারের সাহায্যে তিনি তার সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা হল: ভর শনির তিন গুণ, সূর্য থেকে দূরত্ব প্রায় ৬০০ কোটি মাইল (গড়ে প্লুটোর দেড় গুণ), প্রদক্ষিণ কাল অর্থাৎ বছর আমাদের ৪৬৪ বছর, এবং প্রদক্ষিণের সমক্ষেত্র সাধারণ সমক্ষেত্রের থেকে প্রায় ৬০ ডিগ্রি হেলানো। সবচেয়ে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে প্রদক্ষিণ ঘড়ির কাঁটার দিকে—যদিও আর সব গ্রহ চলে বিপরীত পথে। ব্রেডির এই গ্রহ গ্রাহ্য হবে না যত দিন না তা ছবিতে ধরা পড়ে, এবং অত দূর গ্রহ থেকে সূর্যালোক প্রতিফলিত হবে সামান্য।

সৌর লোকের হিমশীতল প্রান্ত দেশ তা বলে বস্তুহীন নয়, সেখানে

১০,০০০ কোটি কি তারও বেশী ধূমকেতুর অস্থির চলাচল—সৌর পরিবারের সব রকম জ্যোতিষ্কের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সংখ্যাধিক। গ্রহদের মত এরাও উপবৃত্তের পথ অনুসরণ করে, তবে সেই উপবৃত্ত অনেক চাপা, সুতরাং সূর্যের থেকে তারা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে, হয়তো কোনও যাযাবর তারার টানে ; এক বার ঘুরে আসতে কারও লাগে কয়েক লক্ষ বছর, কারও মাত্র কয়েক বছর। দ্বিতীয়ত, যদিও গ্রহ কুলের কক্ষ মোটামুটি একই সমক্ষেত্রে, ধূমকেতুর দল সূর্যের উপর নিচেও ঘোরাঘুরি করে ; তাদের কক্ষের সীমা ও ক্ষেত্র অনুমান করতে হলে এক ফাঁপা গোলকের কথা ভাবতে হয় যার কেন্দ্রে সূর্য এবং যার আভ্যন্তর গাত্র অন্তত ১২০০ কোটি মাইল দূরে, এবং বহির্গাত্র প্রতিবেশী তারার দিকে দশ লক্ষ কোটি মাইল কি আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে তারা পথভ্রান্ত হয়, তখন হয় প্রকাণ্ড লাফ মেরে আবার ফিরে আসে, নয়তো সংকীর্ণতর পথ গ্রহণ করে, নয়তো সৌর লোকের অতি গভীরে ঢুকে অবিলম্বে চূর্ণ হয়।

কি শক্তির ফলে যে তারা চিরাগত পথ থেকে ভিতর দিকে বিক্ষিপ্ত হয় তা ভাল করে জানা নেই, তবে সেই অবস্থায় তারা বৃহস্পতির মত বৃহৎ গ্রহের কবলে ধরা পড়তে পারে, এবং নতুন কক্ষ যদি তাদের সূর্যের কাছে নিয়ে আসে তখন তারা দৃশ্যগোচর হয়। এত কোটি ধূমকেতুর মধ্যে মাত্র কয়েকটি এই উষ্ণ কেন্দ্রের এত কাছে আসে যাতে তাদের ভাল করে পরীক্ষা করা যায়, যদিও এদের মধ্যে কোনও কোনওটা প্রায় সূর্যের গা ঘষাঘষি করে। হয়তো মানুষ একদা এদের ঘাড়ে চাপিয়ে যন্ত্র পাঠাবে সৌর লোকের দূরাঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় করতে।

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে ধূমকেতুর উপাদান বরফ, জমে-যাওয়া গ্যাস (মিথেন, অ্যামোনিয়া, আঙ্গারিক গ্যাস) ও কিছুটা উলকা বস্তুর কাঁকর বা পাথর, যার ওজন কয়েক টন পর্যন্ত হতে পারে। সূর্যের কাছাকাছি এসে সে মূর্তি পায় যখন জমানো গ্যাস সৌর তাপে উবে যেতে আরম্ভ করে ; তখন দেহ স্ফীত হয় এবং সূর্য কিরণ ও সৌর বায়ু (solar wind) গ্যাস ও বস্তু কণাকে পিছন দিকে ঠেলে দেয় বলে এক বা একাধিক পুচ্ছ দেখা দেয় যার দৈর্ঘ্য হতে পারে ছ কোটি মাইল ; সূর্য শক্তির এই চাপ অতি সামান্য, সুতরাং বোঝা যায় পুচ্ছে বস্তু কত হালকা। এও বোঝা যায়

ধূমকেতু যখন আমাদের থেকে দূরে সরে যায় তখনও কেন তার লেজটা থাকে দূরের দিকে। লেজের বস্তু শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং যে সব ধূমকেতু সূর্য থেকে খুব বেশী দূরে যায় না তাদের অনেকে এখন পুচ্ছহীন। সূর্যের বেশী দূরে অবশ্য কোনও ধূমকেতুরই লেজ থাকে না। এদের দীপ্তি কিছুটা আসে প্রতিফলিত সূর্যালোক থেকে, আর কিছুটা উজ্জ্বল গ্যাস থেকে। সব সুদ্ধ ধূমকেতু অত্যন্ত হালকা হলেও সূর্যের কাছাকাছি এলে তার জ্যোতি তাকে এত ফাঁপিয়ে তোলে যে আয়তনে তা সূর্যের চেয়েও বড় হয়ে উঠতে পারে। দূরবিনে তার দেহে তখন অনেকখানি খালি জায়গা দেখা যায়। ধূমকেতু যে এত শীতল তার কারণ তারা সাধারণত সূর্যের থেকে অনেক দূরে থাকে, এবং দ্বিতীয়ত তাদের ক্ষুদ্র দেহে গ্রহদের মত আভ্যন্তর তাপ গড়ে উঠতে পারে নি; এই হিসাবে তাদের মধ্যে আমরা গ্রহদের আদি অবস্থা দেখতে পাই।

ধূমকেতুর দেহে একটি অপেক্ষাকৃত কঠিন কেন্দ্র ঘিরে আছে ধূলি ও গ্যাসের এক অনির্দিষ্ট হালকা আবরণ যার ব্যাস লক্ষ মাইল ছাড়িয়ে যেতে পারে এই রকমই সাধারণ ধারণা। এই আবরণকে বলা হয় কোমা (coma), যার থেকে কমেট কথাটির উৎপত্তি। ১৯৬৯-৭০ সালে এক পৃথিবী-প্রদক্ষিণরত মার্কিন মানমন্দির আবিষ্কার করে যে কোমাকে ঘিরে আছে হাইড্রোজেনের পাতলা গোলক যার আয়তন সৌর ব্যাসের (৮৬০,০০০ মাইল) চেয়েও অনেক বড় হতে পারে। কোমা মানে চুল, অর্থাৎ কঠিন মাথাকে ঘিরে হালকা চুল কল্পনা করা হয়েছে; বাংলায় আমরা এই জিনিসটিকেই ধূম আখ্যা দিয়েছি। মার্কিন জ্যোতিষী ফ্রেড হুইপ্‌ল ঘন কেন্দ্র বস্তুটির বর্ণনা করেছিলেন "নোংরা বরফ পিণ্ড", তাঁর মতে তা বরফ, জমে-যাওয়া গ্যাস মিথেন ও অ্যামোনিয়া এবং ধূলি কণা দিয়ে জোড়া অসংহত উলকা বস্তু। তিনি বলেছেন কাল ও তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ার প্রভাবে তার ভিতরটা পচে বাইরের খোলসটা কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়, সেই কারণেই সূর্যের কাছাকাছি এলে অতিরিক্ত তাপে কতগুলি ধূমকেতু ভেঙে ধূলি হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে রুশ রসায়নবিৎ ভি কেসারেভ প্রস্তাবিত আর এক নতুন ধারণা অনুসারে ধূমকেতুরা বামন গ্রহ, তারা চূর্ণ হয় গায়ে অতিরিক্ত তাপ

জনিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। এক দল জ্যোতিষী ঘন কেন্দ্রের প্রচলিত ধারণা মানেন না। ইংরেজ জ্যোতিষী আর এ লিট্‌লটন মনে করেন আঁটি ধূলি কণার ঢিলে পুঞ্জ মাত্র, বরফ বিশেষ নেই। তিনি বলেন ধূমকেতু নিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে সৌর লোকে; সৌর অভিকর্ষের প্রভাবে গ্রহমধ্যবর্তী ধূলি এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে সেই সমষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় প্রদক্ষিণী কক্ষ পথে। পোল্যান্ড ও আমেরিকার দুই জ্যোতিষী বলেছেন সৌর লোকের জন্মের সময়েই ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু দূর প্রান্ত দেশে নয়, পৃথিবীরই কাছাকাছি, অর্থাৎ তারা এই বসুন্ধরারই সহোদর। এঁদের প্রমাণ এই যে বর্ণালী যন্ত্রে ইকেআ ধূমকেতু পরীক্ষা করে কারবনের দুটি আইসোটোপ যে আপেক্ষিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে তা পৃথিবীর সঙ্গে মিলে যায় (১২ আণবিক ভারের কারবন আছে ১৩ আণবিক ভারের কারবনের ৭০ গুণ)। এর সঙ্গে তুল্য আর একটি তত্ত্ব যাতে বলে ধূমকেতু আসলে সৌর লোকের অংশই নয়, তারা তারাদের ভিতরে ঘুরে বেড়ায়, হঠাৎ কখনও সূর্যের জগতে ধরা পড়ে এই সব ভবঘুরে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধূমকেতুর উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আকাশের গায়ে যখনই ধূমকেতু উদয় হয়ে জ্বলন্ত পথে প্রকাণ্ড পুচ্ছ সঞ্চালন করে চলেছে তখন সর্ব দেশে সর্ব কালে তা লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে, এখনও কিছুটা করে, যদিও এক তাল জমা জল আর গ্যাসের থেকে নিরীহ বস্তু কল্পনা করা দুরূহ, এবং যদিও দৃশ্যটি খুবই সুন্দর। ধূমকেতুর আগমনে লোকে মহামারী, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রাজার মৃত্যু, ইত্যাদি নানা দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছে; এর কিছু যে ফলে নি তা নয়, যেমন ১০৬৬ সালে নর্মানদের ইংলন্ড আক্রমণের অল্প আগে সুপ্রসিদ্ধ হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল; এটি আবিষ্কার করেন এডমান্ড হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২)। কিন্তু দুর্ঘটনা সর্বদাই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ঘটছে, তার জন্য যে কোনও দুর্নিমিত্তকে দায়ী করলে কিছু না কিছু ফলবে।

ধূমকেতু উলকার মত ক্ষণস্থায়ী নয়, আকাশের গায়ে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত তা দৃশ্যগোচর থাকতে পারে। দূরবিনের সাহায্যে জ্যোতিষীরা বছরে গোটা পাঁচ ছয় দেখতে পান, যদিও বড় জাতের ধূমকেতু দীর্ঘায়ু ব্যক্তির সারা জীবনে দেখা দেয় মাত্র দু তিনটি। অধিকাংশই এত দূরে চলে যায় যে

ঘুরে আসতে লাগে কয়েক শো, কয়েক হাজার এমন কি কয়েক লক্ষ বছর। এংকে-র ধূমকেতু তার ছোট কক্ষ পথে প্রতি ৩·৩ বছরে ঘুরে আসে। বড়দের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু প্রতি ৭৫ বা ৭৬ বছরে পৃথিবীর কাছে আসে, এক মাত্র একেই লোকে খালি চোখে এক জীবনে দু বার দেখবার আশা করতে পারে।

এই জ্যোতিষ্কটি এত বড় ও উজ্জ্বল যে খৃষ্টপূর্ব ২৪০ সাল থেকে যত বার সে দেখা দিয়েছে তার শুধু এক বার ছাড়া আর সব আবির্ভাবের খবরই চৈনিক ও জাপানী দলিলে পাওয়া যায়। আবার সে আসবে ১৯৮৬ সালে। শেষ আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯১০ সালের ১৩ মে তারিখে, তখন পৃথিবী তার পাঁচ কোটি মাইল লম্বা লেজের মধ্যে ঢুকে পড়েও অক্ষত ও অবিচলিত থেকেছে, যদিও পৃথিবীর মানুষ বিচলিত হয় নি বলা যায় না। ধূমকেতুরা যদি আরও ভারী হত, ধরা যাক যদি পৃথিবীর সমান হত, তবে তাদের নিকট আগন্তুকরা পৃথিবীকে টলিয়ে আমাদের বর্ষ কালের পরিবর্তন ঘটাত। কিন্তু আসলে এই লঘুভর জ্যোতিষ্করা গ্রহ এমন কি উপগ্রহের দ্বারা নিজেরাই বিক্ষিপ্ত হয়; ১৮৮৬ সালে ব্রুক্‌স ধূমকেতু বৃহস্পতির চন্দ্র কুলের ভিতর দিয়ে চলে যায়, এতে এরা অবিচলিত থাকলেও ধূমকেতু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে—সূর্য প্রদক্ষিণ করতে আগে তার লাগত ২৯ বছর, এখন লাগে মাত্র সাত। তেমন তেমন টান পড়লে কখনও তারা ভেঙেও যায়, যেমন বিয়েলা-র ধূমকেতু প্রসঙ্গে একটু পরেই আমরা দেখব। ১৯৬৫ সালের ২১ অকটোবর নাগাদ ইকেআ-সেকি ধূমকেতু যখন সূর্যের তিন লক্ষ মাইলের মধ্যে আসে তখন তা নিজের কিছুটা অংশ হারায়। তখন বর্ণালী পরীক্ষা করে তার মধ্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়নিত ক্যালসিয়াম, লোহা, তামা ও নিকেল ধাতুগুলি পাওয়া গিয়েছে। মার্কিন কর্মীরা অবলোহিত রশ্মি মেপে সূর্যের ৪·৫ কোটি মাইল দূরে তার তাপ পেয়েছেন ৩৭০ ডিগ্রি, দু কোটি মাইল দূরে ৬৫০ ডিগ্রি—তাঁদের ধারণা ধূমকেতু প্রধানত বরফ ও ধূলি হলে এতটা তাপ সম্ভব নয়, বেশী পরিমাণ ধাতব বস্তু আছে। এই ধূমকেতু ঐ সময়েই প্রথম আবিষ্কার হয়, জাপানের কাওরু ইকেয়া ও সোটোমু সেকি পৃথক ভাবে তাদের দেখতে পান ঘরে তৈরি দূরবিন দিয়ে। এঁদের বয়স কম (ইকেয়ার তখন ২২), কেউই পেশাদার জ্যোতিষী নন, দিনে সাধারণ জীবিকায় যা

উপার্জন করেন তার অনেকটা খরচ হয় রাত জেগে আকাশ দেখার যন্ত্রপাতি বানাতে। ১৯৬৭ সালের ফেবরুআরিতে আরও এক ধূমকেতু পৃথক ভাবে আবিষ্কার করে এখন এঁরা জগতের সেরা ধূমকেতু আবিষ্কর্তা বলে স্বীকৃত; এটি সেকির চতুর্থ এবং ঐ বছরের চতুর্দশ নতুন ধূমকেতু। সাধারণত বছরে গোটা বারো নতুন ধূমকেতু ধরা পড়ে।

সাম্প্রতিক আবিষ্কার কোহোটেক ধূমকেতু জগৎ জুড়ে যে মাতলামির সৃষ্টি করেছিল বোধ হয় হ্যালির পরে এমন আর দেখা যায় নি। জারমেনির হাম্বুর্গ মানমন্দির থেকে বিয়েলার ধূমকেতুর ভগ্নাংশ খুঁজছিলেন লূবশ কোহোটেক (এঁর জন্ম চেকোস্লোভাকিয়ায়), তার বদলে ফোটোর প্লেটে যে ক্ষীণ ছোপটি দেখলেন তা এক নতুন আগন্তুক। বিশ্বের জ্যোতিষীরা উৎসুক পরীক্ষার পর বললেন 'শতাব্দীর সেরা' এই ধূমকেতু ১৯৭৩ ডিসেমবরে প্রত্যূষের আগে হবে আকাশের উজ্জ্বলতম বস্তু (হয়তো হ্যালির ধূমকেতুর ৫০ গুণ দীপ্ত), জানুআরির প্রথমে তার লেজ আকাশের ষষ্ঠাংশ জুড়ে তাক লাগাবে মানুষকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোহোটেক সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে প্রমাণ করল যে ধূমকেতুর ব্যবহার এখনও দুর্বোধ্য। কিন্তু কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে; সূর্যের দিকে আসতে আসতে তিন মাসের মধ্যে তার তাপ বেড়ে গিয়েছিল -৩৫ ডিগ্রি থেকে ৪৮২ ডিগ্রি পর্যন্ত, দুটি পুচ্ছ দেখা দিয়েছিল—একটি ধূলির, একটি জাজ্বল্যমান গ্যাসের। মহাকাশচারী স্কাইলাব যানের নাবিকরা তাকে দেখে সূর্যের ১˙৩ কোটি মাইল কাছ পর্যন্ত আসতে, তার পর হঠাৎ তা হয়ে পড়ল আশ্চর্য রকম ক্ষীণ। সরমরঞ্জিত বিজ্ঞানীরা এই অভাবিত প্রতারণার নানা ব্যাখ্যা দিলেন, তার একটি হল কোহোটেক এ যাবৎ ছিল অসূর্যম্পশ্য, তাই কাছে আসবার আগেই সৌর তেজে তার হালকা বস্তু অধিকাংশ উবে গিয়েছিল, তা পরে আর জলবার সুযোগ পায় নি।

এঁরা দাবি করেন কোহোটেক বিশাল আকাশ পটে নৈসর্গিক সার্কাসের খেলা না দেখালেও মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছে, যথা রেডিও জ্যোতিষীরা তার মধ্যে মিথাইল সায়ানাইড ও হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের অণু সনাক্ত করেছেন, এগুলি আগে পাওয়া গিয়েছে তারামধ্যবর্তী ধূলি ও গ্যাসে। এর

থেকে সমর্থন মেলে এই তত্ত্বের যে সৌর লোকের উপাদান ও ধূমকেতুর বস্তু একই। দ্বিতীয়ত, ঐ অণু দুটি হিম ঠাণ্ডায় না রাখলে ভেঙে যায় ভিন্ন পদার্থে, সুতরাং মনে হয় ধূমকেতু সত্যিই জমে-যাওয়া গ্যাস ও ধূলি জড়িত বিরাট তুষার খণ্ড।

যারা সূর্যের আগুন নিয়ে বেশী রকম খেলা করে তাদের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে বিয়েলার ধূমকেতুর সংক্ষিপ্ত, অস্থির জীবন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৭৭২ সালে একে প্রথম দূর শূন্য থেকে তেড়ে আসতে দেখা যায়। এক বার সূর্যের গা ঘেঁষে গিয়ে প্রতি সাড়ে ছয় বছর অন্তর সে দেখা দিতে আরম্ভ করল, তার পর ১৮৪৬ সালে মানুষের দৃষ্টির সামনে যা ছিল এক তা ভেঙে হল দুই, জোড়া ধূমকেতু চলতে থাকল পাশাপাশি। ১৮৫২ সালে আবার যখন দেখা দিল তখন তাদের মধ্যে ফাঁক ১৫ লক্ষ মাইল, তার পর তারা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেল। ২০ বছর পরে জ্যোতিষীরা তখনও বিয়েলার ধূমকেতু খুঁজে চলেছেন এমন সময়ে হঠাৎ একদা সমগ্র ইয়োরোপে হাউইয়ের মত উলকার বর্ষণ দেখা দিল। পশ্চিম দিকে সরতে সরতে নৈসর্গিক স্ফুলিঙ্গের এই ক্ষরণ বেড়ে চলল, যখন ইংলন্ডে পৌঁছাল তখন লোকে দেখতে পেল প্রতি মিনিটে ১০০ জলন্ত উলকা। অতলান্তিকের উপর এই ফুলঝুরি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল এবং মধ্যরাত্রে নিউ ইয়র্কের লোকে দেখলে শুধু খানিকটা ক্ষীণপ্রভ ঝরনা।

বলা বাহুল্য, বিয়েলার যুগল ধূমকেতু পরে আবার বিপদের এলাকায় পড়ে আরও চূর্ণ হয়ে এই অসংখ্য উলকায় পরিণত হয়েছে। এদের পথ পৃথিবীর কক্ষ অতিক্রম করার ফলে উলকা বৃষ্টি ঘটেছিল। তারও আগে যখন ধূমকেতু অবস্থাটা ছিল তখনও নিশ্চয় সে পৃথিবীকে প্রায় ধাক্কা মারার মত কাছাকাছি এসেছে। এখনও মাঝে মাঝে (সাধারণত ২৭ নভেমবরের কাছাকাছি) এই উলকা স্রোত পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায় চমৎকার বাজির খেলা দেখিয়ে। উলকার ঝাঁকের কথা আমরা আগে বলেছি, ধূমকেতু ভেঙে এই রকম ঝাঁক সৃষ্টির খবর আরও জানা আছে, যদিও অনেকে বলেন যে ধূমকেতুর বস্তু এত সামান্য যে তাদের থেকে কঠিন উলকা পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

কিন্তু কোনও কোনও ধূমকেতু হয়তো পৃথিবীকে আঘাত করেছে।

এই প্রসঙ্গে সাধারণত ১৯০৮ সালের ৩০ জুন সাইবেরিয়ার টুংগুস্‌কা নদীর ধারে বনের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার উদাহরণ দেওয়া হয়। বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে ৩০ মাইল দূরে গাছ উৎপাটিত হয়ে পড়েছিল; ৪০ মাইল দূর পর্যন্ত সমস্ত বন মাটিতে শুয়ে পড়েছিল, চাষীদের গা পুড়ে গিয়েছিল; ১০০ মাইল দূরে মানুষ ও পশু ধরাশায়ী হয়েছিল, জানলার কাঁচ চূর্ণ হয়েছিল; ৪০০ মাইল দূরে এক রেলগাড়ির চালক রেল লাইনকে ফুলতে কাঁপতে দেখে গাড়ি থামিয়ে দিল; শব্দ শোনা গিয়েছিল আরও দূরে। লন্‌ডনের যন্ত্রে ধরা পড়ল বায়ু তরঙ্গের চাপ। পরে সম্পূর্ণ এক সপ্তাহ সমগ্র উত্তর ইয়োরোপ জুড়ে সূর্যাস্ত অদ্ভুত রকম দীর্ঘ ও মনোরম মনে হল, বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে যে ধূম্র জাল উঠেছিল তার ফলে।

এই বিস্ফোরণ সম্বন্ধে অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ আছে যে তা ধূমকেতু, উলকা না অন্য কিছুর কাজ। উলকা-দলীয়রা কেউ কেউ বলেন যে এই উলকা পৃথিবীর উলটো মুখে সূর্য প্রদক্ষিণ করছিল, বিপরীত দিক থেকে ঠোকাঠুকি লাগে বলে সংঘর্ষটা জোর হয়। বিস্ফোরণের পরে সর্বপ্রথম এই জায়গাটির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয় ১৯২৭ সালে, তখন সেখানে কিন্তু খাদের চিহ্ন পাওয়া যায় নি, মাটি খুঁড়েও উলকার বস্তু কিছু মেলে নি।

১৯৬০ সালে সরকারী সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের অনুষ্ঠিত এক সম্পূর্ণ তদন্তের পরে স্থির সিদ্ধান্ত জানানো হয় যে বিস্ফোরণ ধূমকেতু জাত। এঁরা বলেন তার দেহের ব্যাস ছিল কয়েক মাইল এবং ওজন প্রায় দশ লক্ষ টন। এই ওজন বেশী মনে হলেও আসলে তা অন্যান্য আর দশটা ধূমকেতুর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত ক্ষুদ্র বস্তুর এত শক্তি কি করে হল তা বুঝতে হলে জানা দরকার যে আঘাতের তেজ শুধু ওজনের উপর নির্ভর করে না, বেগের উপরেও করে। এই বামন ধূমকেতু পৃথিবীকে পিছন থেকে বা পাশ থেকে ধাক্কা মারে নি, দুইয়ের মধ্যে সামনাসামনি মাথা ঠোকাঠুকি হয়েছে, ফলে সংঘর্ষের যুক্ত বেগ দাঁড়িয়েছে সেকেন্‌ডে প্রায় ২৫ মাইল। মাটি স্পর্শ করবার ঠিক আগেও সে ফেটে পড়ে থাকতে পারে।

কিন্তু এই বিস্ফোরণের কারণ সম্বন্ধে এখনও অনেকের সন্দেহ আছে।

এক অনুমান হল যে সংঘাতটা যারই হক সেই সময়ে পারমাণবিক প্রক্রিয়া ঘটে বস্তুটি ভেঙে যায়। রুশ বিজ্ঞানী জোলোটভ এই মত সমর্থন করেন। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি আমেরিকার থেকে নোবেল পুরস্কার বিজেতা রসায়নবিৎ উইলার্ড লিবি এবং আরও দু জন বলেন যদি উলকা হবে তবে খাদ কোথায়, যদি ধূমকেতু হবে তবে তাকে আসতে দেখে নি কেন কেউ? তাঁদের মতে কোনও দূর নীহারিকার থেকে এক খণ্ড প্রতিবস্তু সৌর লোকের মধ্যে এসে পড়েছিল, বস্তুর সঙ্গে প্রতিবস্তুর সংযোগ হলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে তা জানা আছে। এই রকম বিস্ফোরণে তেজস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, ১৯০৯ সালে ঐ অঞ্চলে এক গাছের যে অংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা পরীক্ষা করে এঁরা অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়ার সাক্ষ্য পেয়েছেন। (পৃথিবীতে এ পর্যন্ত মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিবস্তুর কণা তৈরি হয়েছে বিশাল সাইক্লোট্রন যন্ত্রে। প্রতিবস্তু আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।) রুশ বিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যা মানেন নি—তাঁরা বলেন ধূমকেতু সূর্যের দিক থেকে এসেছিল বলে তাকে দেখা যায় নি, অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়ারও কোনও চিহ্ন নেই।

১৯৭৩ সালে নবতম জল্পনা পেশ করেছেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থবিজ্ঞানী জ্যাকসন ও রায়ান। এঁরা বলেন যে মাঝামাঝি আয়তনের গ্রহাণুর মত বড় এক অন্ধকূপ এখানে পৃথিবীকে আঘাত করে ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে যার ফলে দশ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের তুল্য তেজ বিচ্ছুরিত হয়; এই রকম আঘাত টুংগুস্কার অনুরূপ কম্পন-তরঙ্গ সৃষ্টি করবে এবং বায়ুমণ্ডলের কণা আয়নিত হয়ে এই আগন্তুকের পথ নীলাভ হয়ে উঠবে; প্রত্যক্ষদর্শীরা নাকি এমন আভা সত্যিই দেখেছিল এবং এও বলেছিল যে এই পথ মাটির গায়ে ৩০ ডিগ্রি হেলানো ছিল। অন্ধকূপ যদি এ ভাবে আসে তবে সোজাসুজি পৃথিবী ভেদ করে আট মিনিট পরে উলটো দিকে অতলান্তিক সাগর থেকে তা বার হবে (নোভা স্কোশার হাজার মাইল পুবে), তার ফলে জলের নিচে এবং বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ-তাণ্ডব ঘটবে। এ তত্ত্বের প্রস্তাবকরা বলেন তখনকার দলিল পত্রে এমন ঘটনার খবর আছে কিনা তা খুঁজে দেখা যেতে পারে। এমন প্রস্তাবও শোনা গিয়েছে যে অতিতেজী লেজ়ার রশ্মি দিয়ে পৃথিবীকে আঘাত

করে কেউ এই বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছে। এর চেয়েও আজব সম্ভাবনাটি হল দূর জগতের মানুষ পৃথিবীতে নামবার বা ছেড়ে যাবার সময়ে তাদের রথের পারমাণবিক এন্‌জিনে বিস্ফেরণ ঘটে।

আকাশে পৃথিবীর যাত্রা পথে এই রকম বিরল ও ভয়ংকর আকস্মিক সংঘর্ষই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অবিরাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সে সংঘর্ষ ঘটছে তার খোঁজও কেউ রাখে না, অথচ সব জানলে তার বিস্ময়ও কিছু কম না। ধূমকেতু বা উলকা বায়ুমণ্ডলের প্রচণ্ড ঘর্ষণ পেরিয়ে পৃথিবীর মাটি পর্যন্ত এসে পৌঁছায় খুবই কম, কিন্তু প্রতি দিন বসুন্ধরার গায়ে মহাকাশ থেকে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম নৈসর্গিক ধূলি কণা বা উলকাণুর বৃষ্টি চলছে, তাদের মাপ এক ইঞ্চির ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ থেকে ১০০ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। এই ধূলি সৃষ্টি করছে ধূমকেতু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে, সৃষ্টি করছে সহস্র সহস্র গ্রহাণু নিজেদের মধ্যে ঘষাঘষি করে। এদের থেকে পৃথিবী বস্তু সংগ্রহ করে প্রতি বছর সম্ভবত লক্ষ টনেরও বেশী, যার তুলনায় দৃশ্যগোচর উলকার ওজন নগণ্য। পৃথিবীর জন্ম থেকে এই অদৃশ্য, নিঃশব্দ বর্ষণ চলে এসেছে অবিরাম, সব যোগ করে গ্রহের গায়ে তার উচ্চতা দাঁড়ায় দশ ফুট। আমরা যে ভূমিতে হাঁটছি, যে মাটি চাষ করে খাদ্য উৎপন্ন করছি তার অনেকটা পৃথিবীর মাটি মোটেই না, মহাকাশের দান—কবির ভাষায় 'তারকা চূর্ণ'।

৯। চাঁদ ও পৃথিবী

সৌর পরিবারের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে অন্যান্য গ্রহ ও পার্শ্বচর উপগ্রহের মত আমাদের পৃথিবী ও নিকটতম জ্যোতিষ্ক চাঁদ এই দুইয়ে মিলে ক্ষুদ্রতর এক পরিবার। অবশ্য এই পরিবারে আরও ছোট ছোট চাঁদ আছে এমন দাবি মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ১৭৭২ সাল থেকে যখন এক ফরাসী গাণিতিক বলেন যে পৃথিবীর আরও দুটি উপগ্রহ ধরা পড়বে। ১৯৬১ সালে পোল্যান্ড থেকে এক জ্যোতিষী চাঁদের কক্ষ পথে ৬০ ডিগ্রি আগে পরে দুই বস্তু-মেঘের সংবাদ দেন। আরও সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এক জন বলেন ছবি ও দূরবিনের নজির অনুসারে ১৯৫৫ সালে এক উপগ্রহ ভেঙে গিয়ে ক্ষুদ্রতর দশটি চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের ব্যাস প্রায় ১০০ ফুট। এও শোনা যায় যে অন্তত দুটি ছোট্ট চাঁদ ঘুরছে ৪৭২০ মাইল দূরে। এ সব দাবি ভিত্তিহীন হলেও পৃথিবীকে ঘিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু কণা বা পিণ্ড সম্ভবত ঘুরছে।

গ্রহদের মত চাঁদের কক্ষ উপবৃত্তিক এবং যখন সে পৃথিবীর কাছে আসে তখন গতি বেশী দ্রুত। আমাদের থেকে তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দূরত্ব যথাক্রমে ২২১,৪৬২ ও ২৫২,৭১০ মাইল, গড়ে ২৩৮,৮৫৭ মাইল। এই ঘন সান্নিধ্য ও চাঁদের বৃহৎ দেহের ফল প্রত্যক্ষ হয় তার প্রচণ্ড আকর্ষণে। এই টানে দিনে দু বার সাগর ফেঁপে ওঠে জোয়ারে, এমন কি স্থল পর্যন্ত বাদ যায় না ; চাঁদ যখন ঠিক মাথার উপরে তখন আমেরিকার মাটি ছ ইঞ্চি ফোলে।

অধিকাংশ উপগ্রহের মত চাঁদের একই মুখ সর্বদা গ্রহের দিকে ফেরানো, তার কারণ ২৭ দিন আট ঘণ্টায় কক্ষ প্রদক্ষিণ করতে সে আপন অক্ষ ঘিরে এক বার মাত্র পাক খায়। তাই তার দিন বা রাত্রি আমাদের প্রায় ১৪ দিন। পৃথিবীর ও তার প্রদক্ষিণের সমক্ষেত্র এক নয় এবং তার অক্ষ

কিছুটা হেলে আছে, সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অনেকটা আমাদের চোখে পড়ে। তা ছাড়া চাঁদের আকৃতি ও গতি সম্পূর্ণ নিয়ম-সংগত না হওয়াতে অক্ষ অল্প অল্প কাঁপে ও দোলে বলে এবং কক্ষ উপবৃত্তিক বলে দুই পাশেও তার বিপরীত দিক কিছুটা উঁকি মারে। সব নিয়ে পৃথিবীর থেকে তার প্রায় ৫৯ শতাংশের ছবি তোলা হয়েছে।

চাঁদের অবশ্য স্বকীয় কোনও প্রভা নেই, সূর্যের থেকে ধার করা তার আলো; আকাশ যখন সবচেয়ে পরিষ্কার তখনও মধ্যাহ্ন সূর্যের ৪৫০,০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র চাঁদের উজ্জ্বলতা। দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর আলোয় তারাদের মত সেও ঢাকা পড়ে। আপাত দৃষ্টিতে তার যে বৃদ্ধি ও ক্ষয় আমরা দেখি তা নির্ধারিত হয় চাঁদের যে পরিমাণ অংশ দৃষ্টি পথে সূর্যালোক প্রতিফলিত করছে তার দ্বারা। এই ভগ্নাংশের পরিমাণ অবশ্য নির্ভর করে কক্ষ পথে তার অবস্থানের উপর। মানুষের দৃষ্টিকোণের কথা ছেড়ে দিলে চাঁদের পুরো এক অর্ধ অবশ্য সর্বদা সম্পূর্ণ অন্ধকার।

চাঁদ যে ক্ষয় হতে হতে মরে যায়, আবার নতুন জন্ম নিয়ে কলায় কলায় বাড়ে এর থেকে প্রাচীন মানুষ সহজেই ভেবেছে যে সে সজীব, এবং পৃথিবীর প্রাণীদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। চাঁদ যখন বর্ধিষ্ণু সেই সময়ে বীজ বুনলে চারা হবে তেজী, যখন ক্ষয়িষ্ণু অর্থাৎ সবচেয়ে দুর্বল তখন গাছ কাটা কম শক্তিসাপেক্ষ। এ কালে কোনও কোনও বিজ্ঞানী কবিদের সঙ্গে একমত যে পূর্ণিমার দিন মানুষের হৃদয়াবেগ চরমে ওঠে, খুন ও অন্য অপরাধের সংখ্যাও বাড়ে; চাঁদ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় এই ধারণার থেকেই ইংরেজি lunatic শব্দের উৎপত্তি। স্ত্রীলোকের ঋতুচক্র চান্দ্র মাস অনুবর্তী। অনেক হীন প্রাণীর প্রজনন, খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি সম্ভব হয় জোয়ারের সময়ে।

এই প্রসঙ্গে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণও উল্লেখযোগ্য। যে আলো জল বাতাসের মত স্বাভাবিক, মানুষের এত বড় সহায় তা যে হঠাৎ নিভে গিয়ে চরাচর নিমজ্জিত হল অন্ধকারে, আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করল কোন অদৃশ্য দানব, পুরামানবের অভিজ্ঞতায় এর চেয়ে আশ্চর্য ও ভয়াবহ দৃশ্য ছিল কমই। আজ আমরা জানি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে

এসে চাঁদ যখন সূর্যকে ঢাকে তখন সূর্য গ্রহণ, এবং পৃথিবী যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝে পড়ে চাঁদের গায়ে ছায়া ফেলে তখন চন্দ্র গ্রহণ হয়। মধ্যবর্তী জ্যোতিষ্ক যখন ঠিক একই সরল রেখায় অবস্থিত হয় তখন ঘটে পূর্ণ গ্রহণ, অল্প এ দিক ও দিক হলে আংশিক গ্রহণ। প্রতি বছর দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ ঘটে, যদিও তার অধিকাংশই আংশিক। চন্দ্র গ্রহণের সংখ্যাও অনুরূপ, তবে তার কতগুলি এত ক্ষীণ যে শুধু যন্ত্রেই ধরা পড়ে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ চার ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে, যদিও ঘন আঁধারের মেয়াদ ন মিনিট হলেই খুব বেশী।

চাঁদের গায়ে যে দাগ দেখা যায় তার থেকেও অনেক আজগুবী কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য জগতে লোকে তার মধ্যে দেখেছে যেন লাফিয়ে বেড়া পার হচ্ছে গরু, অথবা এক বুড়ী চরকায় সুতো কাটছে। আমরাও দেখতে পাই এক চাঁদের মা বুড়ী। চীনেরা নাকি কল্পনা করে লাফানো খরগোশ। এ সব রূপকথা ছাড়া অনেকে সত্যিই বিশ্বাস করেছে যে চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে ঝুলন্ত বস্তুকেই আমরা চাঁদের কলঙ্ক রূপে দেখি; অথবা চাঁদ এক প্রকাণ্ড দর্পণ, তার মধ্যে পৃথিবীর প্রতিবিম্ব আমরা দেখছি —উজ্জ্বল অংশগুলি স্থলের ও কালো অংশগুলি জলের ছায়া।

১৬০৯ সালে গ্যালিলিও তাঁর রুক্ষ দুর্বল দূরবিন দিয়ে যখন চাঁদের রহস্য ভেদ করলেন তখন এই ধারণার সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া গেল। তিনি বললেন আমাদের পৃথিবীর মতই চান্দ্র জগতেও আছে সাগর ও পাহাড়—যা আমরা কলঙ্ক বলি তা সাগর। এদের নানা রকম কাব্যিক নামও দেওয়া হল, যথা শান্তি সাগর, বর্ষণ সাগর—আসলে তা সাগরও না, সেখানে বর্ষণও নেই। এই 'সাগরগুলি' জলহীন সমতল নিম্নভূমি যার তুলনায় পার্বত্য অঞ্চল বেশী উজ্জ্বল দেখায়। তা সত্ত্বেও সুবিধাজনক বলে বিজ্ঞানের ভাষায় সাগর আখ্যাটি টিঁকে গিয়েছে। সব মিলিয়ে এরা চাঁদের ২০ শতাংশের কম। এখন আমরা জানি এগুলি পরবর্তী কালের সৃষ্টি, চাঁদের আদি অংশ তার উচ্চভূমি।

চাঁদ আবহহীন, গ্যাস যা ছিল তা দুর্বল অভিকর্ষ কাটিয়ে শূন্যে পালিয়ে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডল নেই বলেই গ্রহণের শেষ দিকে সূর্য তার পিছন থেকে নিজের পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, পৃথিবীতে সূর্যোদয় ও

সূর্যাস্তের সময়ে আলোর কিরণ বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হয়ে যে অস্পষ্টতা ও বর্ণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে সে রকম কিছু দেখা যায় না। এখানে বাতাস ও জলের প্রভাবে অবিরত ভূমির ক্ষয় ঘটছে, এ সবের অভাবে চাঁদে পরিবর্তনী প্রভাব খুবই কম। পৃথিবীতে মাটির টানে সর্বদা পাহাড়ের গা থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে নিচে, কিন্তু চাঁদের অভিকর্ষীয় আকর্ষণ এই গ্রহের মাত্র এক ষষ্ঠাংশ। অবশ্য মেঘ বৃষ্টি ঝড় ঝাপটা না থাকলেও কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবর্তন হয়তো ঘটে তাপের পার্থক্য জনিত সম্প্রসারণ এ সংকোচনের ফলে; আবহের আবরণ না থাকায় দিনে তাপ চড়ে যায় ১১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি, রাত্রে নামে শূন্যের ১৭৩ ডিগ্রি নিচে। তা ছাড়া অবিরাম উলকা বৃষ্টিতেও অবশ্য চেহারার বদল হয়েছে।

দূরবিনে দেখলে চাঁদের যে বিশেষত্ব সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা তার গায়ে অসংখ্য গোলাকার খাদ, তালিকাভুক্ত হয়েছে ত্রিশ হাজারের বেশী। তাদের ব্যাস এক থেকে ১৮০ মাইল পর্যন্ত। খাদগুলিকে ঘিরে আছে দেয়াল, তারা প্রায়ই কয়েক হাজার ফুট উঁচু; এই উচ্চতা হল বাইরের ভূমির তুলনায়, খাদের মেঝে অবশ্য এই ভূমির চেয়ে অনেকটা গভীর। খাদের কারণ সম্বন্ধে দুটি তত্ত্ব আছে। এক দল জ্যোতিষী বলেন তাদের অধিকাংশ আগ্নেয় গিরির মুখ; বস্তুত এরা অনেক বিষয়ে তার সঙ্গে মেলে, যেমন বৃত্তের কেন্দ্রে ছোট আর একটি মুখ প্রায়ই দেখা যায়, গলিত লাভার বুদ্‌বুদ থেকে যেমন হয়। বিরুদ্ধ পক্ষের বিশ্বাস যে অধিকাংশের উৎপত্তি উলকার আঘাতে—চাঁদ যখন বয়সে শিশু ছিল তখন বিশাল উলকার গোলা বর্ষণে তার দেহ হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। এই দ্বিতীয় দলটি ভারী, তাতে আছেন হ্যারল্‌ড উরে এবং এঁরা এমন কি এও দাবি করেন যে চাঁদের প্রকাণ্ড সাগরগুলি পর্যন্ত (যেমন ৭০০ মাইল দীর্ঘ বর্ষণ সাগর) বৃহত্তর উলকার সৃষ্টি। পৃথিবীর বাতাসে ঘষে অধিকাংশ উলকা পুড়ে যায়, চাঁদে তা হতে পারে না বলে পতিত উলকার সংখ্যা ও ওজন বেশী। তাদের দ্রুতি গড়ে প্রতি সেকেন্‌ডে ৩০ মাইল, অর্থাৎ রাইফেল গুলির দশ গুণ। ক্ষুদ্র কণাও এত দ্রুত আঘাত করলে ফল হয় যথেষ্ট; অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা খাদের সৃষ্টি দুই কারণেই; কেউ বলেছে যাদের দেয়ালের মাথাটা তীক্ষ্ণ তারা উলকা-জাত, যাদেরটা গোল করা তারা আগ্নেয় গিরির অবশিষ্ট।

দূরবিনে দেখা যায় কোনও কোনও বড় খাদ থেকে সাদা সাদা সোজা দাগ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এদের বলা হয় রশ্মি (ray)। বিস্ফোরণে বস্তু ছিটিয়ে পড়লে এই রকম সরল রেখার সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া আর এক রকম আঁকাবাঁকা গভীর দাগও চাঁদের গায়ে দেখা যায়, যেন এই সব জায়গায় মাটিতে ফাটল ধরেছে, এদের নাম রিল (rille)।

এই পর্যন্ত জানা ছিল মহাকাশ পাড়ির আগে। নতুন যুগের সূচনা করল রাশিয়া পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক দিয়ে (৪.১০.১৯৫৭), তাদের ইউরি গাগারিন মহাকাশের প্রথম অভিযাত্রী (১২.৪.১৯৬১)। চাঁদের গবেষণায়ও তাদের রকেট যান অগ্রণী হয়েছে। এই কাজ শুরু করে লুনা-১ (জানুআরি ১৯৫৯), তা সূর্যের প্রথম কৃত্রিম গ্রহ। লুনা-২ (সেপটেমবর ১৯৫৯) প্রথম চাঁদের গায়ে পড়ে। লুনা-৩ (অকটোবর ১৯৫৯) প্রথম আমাদের কাছে চাঁদের অজ্ঞাত মুখটি খুলে ধরে পিছন দিকের ছবি পাঠিয়ে, যার থেকে মনে হয়েছে চেহারাটা পরিচিত মুখের মতই, যদিও অনুজ্জ্বল অর্থাৎ সাগর অংশ কিছুটা কম। জন্‌ড-৩ (জুলাই ১৯৬৫) এই দিকের মানচিত্র তৈরির কাজে আরও সাহায্য করে ৭২০০-৬২০০ মাইল উপর থেকে ছবি তুলে, তাতে তিন মাইল চওড়া বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে। এ বার সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা দুই পিঠের মধ্যে অনেক বৈষম্য লক্ষ করলেন, পিছন দিকের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ, শত শত খাদ ও দুই সাগরের মধ্যে এক গিরি শ্রেণীর বর্ণনা করলেন। লুনা-৯ (ফেব্রুআরি ১৯৬৬) প্রথম চাঁদের গায়ে ধীরে নামবার কৌশলটি আয়ত্ত করে। লুনা-১০ (এপ্রিল ১৯৬৬) চাঁদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। ছবি ছাড়াও এদের যন্ত্র অবশ্য চাঁদের পরিমণ্ডল ও গা থেকে নানা তথ্য পাঠায়।

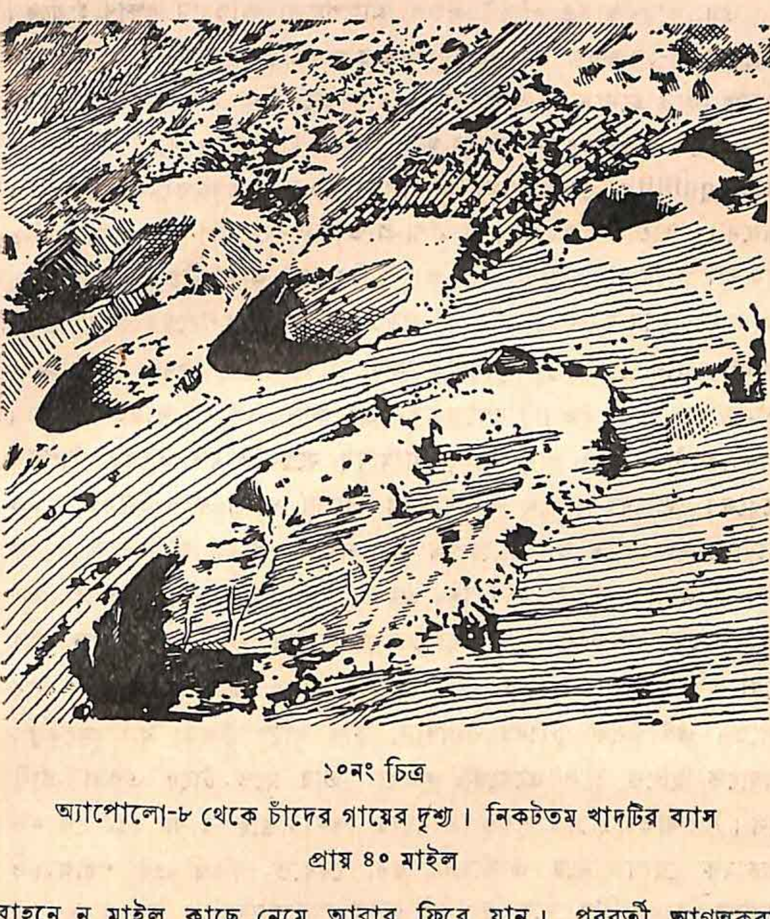
যুক্তরাষ্ট্র অনুসন্ধান শুরু করে রেন্‌জার শ্রেণীর যান দিয়ে ১৯৬৪ সালে। এরা চাঁদের গায়ে আছড়ে পড়বার আগে ছবি তোলে, পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবিনে তোলা ছবির তুলনায় তাতে চাঁদের স্থানীয় চেহারা আরও বড় ও স্পষ্ট হল। পরে অরবিটার তাকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে কাজ করবার সময় পেয়েছে আরও বেশী। সারভেআর আরম্ভ করে ধীর অবতরণ। এই সব দূত অবশ্য ছবি তোলা ছাড়া অন্য কাজও করেছে। অরবিটারদের প্রদক্ষিণ বিচ্যুতি থেকে ধরা পড়েছে যে চাঁদের স্থানে স্থানে বস্তু বেশী

ঘন, ফলে সেখানে অভিকর্ষের শক্তি বেশী ; এই সব অংশের নাম হয়েছে ম্যাস্‌কন (mascon), এই ঘনতার কারণ এখনও অজানা। আমেরিকার বরাবরই ইচ্ছা ছিল চাঁদে মানুষ নামানো, উপরোক্ত অগ্রদূতরা সূক্ষ্ম, স্পষ্ট মানচিত্র তৈরি করে দেখিয়েছে কোথায় নামবার মত সমতল ক্ষেত্র আছে, আশ্বাস দিয়েছে চাঁদের ভূমি মানুষ বা তার নামার বাহনের ভার সইতে পারবে। টমাস গোল্ড তো বলতেন চাঁদের উপরে পুরু ধূলির স্তর তাকে গ্রাস করবে।

কিন্তু মানুষবাহী যান যন্ত্রবাহী যানের চেয়ে অনেক জটিল ও ভারী। তাকে তুলতে উপযুক্ত রকেট বানাতে হবে, তা ছাড়া প্রাণ ধারণের সব রকম ব্যবস্থা দরকার। মহাকাশে মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় কিনা, তার সহন শক্তি কতখানি তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ধাপে ধাপে প্রথমে এই সব পরীক্ষা হয়েছে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী মার্কারি ও জেমিনি শ্রেণীর যান দিয়ে ; ১৯৬০ দশকের শুরুতে মার্কারি তা আরম্ভ করে একটি যাত্রী নিয়ে (অ্যালান শেপার্ড সর্বপ্রথম), পরে জেমিনির ছিল দুই।

১৯৬৬ থেকে অনুসন্ধান এগিয়ে নিয়ে যায় তিন যাত্রীর অ্যাপোলো যানগুলি। পৃথিবীর আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে বিভিন্ন রকেটের ঠেলা দরকার, চাঁদ থেকে ফিরে এসে দ্রুত বেগে পৃথিবীর আবহে ঢুকলে তার ঘষায় যে ভীষণ তাপ সৃষ্টি হবে তা সহ্য করতে উপযুক্ত আবরণ দরকার—এ সবের পরীক্ষা হল (অ্যাপোলো-৭, অকটোবর ১৯৬৮)। অতঃপর অ্যাপোলো-৮ (ডিসেমবর ১৯৬৮) প্রথম মানুষ নিয়ে চাঁদকে কয়েক পাক ঘুরে আবার ফিরে আসে। অভিযাত্রী উইলিয়াম অ্যান্‌ডার্স অদৃশ্য দিকটার যে বর্ণনা দেন তার সঙ্গে পূর্বোক্ত সোভিয়েট তথ্যাবলীর কিছু বৈষম্য আছে : যুদ্ধ ক্ষেত্রের মত ক্ষত বিক্ষত ভূমি, অসংখ্য গর্ত ও খাদ, কিন্তু পাহাড় পর্বত প্রায় কিছুই নেই। এর আগে অরবিটার-৫ প্রেরিত ছবি অনুসারে পরিচিত দিকের চেয়ে উলটো পিঠে খাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

প্রধান যান থেকে বেরিয়ে যে ক্ষুদ্র বাহনটি চাঁদে নামবে অ্যাপোলো-৯ তার পরীক্ষা করে পৃথিবীর আওতায়, অ্যাপোলো-১০ (মে ১৯৬৯) চাঁদ প্রদক্ষিণের পথে তার ৬৯ মাইল কাছাকাছি আসে, দুই অভিযাত্রী অবতরণের



১০নং চিত্র

অ্যাপোলো-৮ থেকে চাঁদের গায়ের দৃশ্য। নিকটতম খাদটির ব্যাস প্রায় ৪০ মাইল

বাহনে ন মাইল কাছে নেমে আবার ফিরে যান। পরবর্তী আগন্তুকরা অ্যাপোলো-১১ থেকে যেখানে নামবেন সে জায়গায় তাদের ত্রিপদ বাহন যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হলেন। এর পরে অবশ্য সেই স্মরণীয় তারিখ (২০. ৭. ১৯৬৯) যে দিন নীল আর্মস্ট্রং এই যান থেকে প্রথম চাঁদের মাটিতে পা ফেললেন ; মানুষের ইতিহাসে কোনও কীর্তির থেকে এর তাৎপর্য কম নয়। এর ঠিক আগে রাশিয়ার যাত্রীহীন লুনা-১৫ ছোটে চাঁদের দিকে, অ্যাপোলোর আগেই তা চান্দ্র বস্তু সংগ্রহ করে আনবে ভেবে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ; কিন্তু সম্ভবত সে মুখ থুবড়ে পড়ে মরেছে, এ ক্ষেত্রে আমেরিকা হারে নি।

এর পরে আরও পাঁচটি সফল অ্যাপোলো অভিযান সম্পূর্ণ হয়েছে। অ্যাপোলো-১৩ অবশ্য যান্ত্রিক বিকলতার জন্য চাঁদে নামতে পারে নি, মরতে মরতে ফিরে এসেছে। অ্যাপোলো-১১ সেখানে ছিল মাত্র ২২ ঘণ্টা, অভিযাত্রীরা থেকেছেন ৫০ ফুট সীমার মধ্যে। এই যান শান্তি সাগরে (Sea of Tranquillity) নেমে পাথর ও ধূলি সংগ্রহ করে এবং কয়েকটি যন্ত্র রেখে আসে। তাদের একটি লেজার রশ্মি প্রতিফলন করে, তা দিয়ে চাঁদের দূরত্ব খুব সূক্ষ ভাবে মাপা সম্ভব ; চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে অভিকর্ষীয় টান দুর্বল হয়ে তারা দূরে সরে যাচ্ছে কিনা, আমাদের মহাদেশগুলি নিচের স্তরের উপর কতটা ভেসে বেড়াচ্ছে, পৃথিবীর অক্ষ মাঝে মাঝে কেমন কাঁপে এবং ভূমিকম্পের কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে নতুন তথ্য জানা এই সব যন্ত্রের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর কাঁপন ধরা পড়ে সাইজ়মোমিটার যন্ত্রে, ঐ যন্ত্র চাঁদের কাঁপনও ধরেছে। প্রাণের সন্ধানে অভিযাত্রীরা বিশেষ পাত্রে করে চাঁদের মাটিও এনেছিলেন, এখানে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করেও জীবিত বা ফসিল কোনও জীবাণু পাওয়া যায় নি, এমন কি অ্যামিনো অ্যাসিড বা অন্য কোনও জৈব বস্তুও না। (পৃথিবীতে যে পাথুরে উলকা এসে পড়ে তার মধ্যে এই ধরনের বস্তু পাওয়া গিয়েছে তা আমরা জানি ; হ্যারল্ড উরে বলতেন এই উলকা চাঁদের উপাদান, তার গায়ে উলকা বা ধূমকেতুর আঘাতে ছিটকে চলে এসেছে ; সুতরাং তাঁর মতে চাঁদে একদা প্রাণী ছিল।) অভিযাত্রীদের পৃথক কামরায় তিন সপ্তাহ রাখা হয়, কোনও সংক্রামক রোগ নিয়ে এসেছেন কিনা দেখতে, কিন্তু এই পরীক্ষায়ও জীবাণুর কোনও চিহ্ন মেলে নি ; এই ব্যবস্থা অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের পর বাতিল করা হয়।

অ্যাপোলো-১২ (নভেমবর ১৯৬৯) নামল ঝটিকা সাগরের (Sea of Storms) ধারে। সারভেআর-৩ আগে চাঁদে নেমেছিল, অভিযাত্রীরা পাথর, মাটি ইত্যাদির সঙ্গে তার অংশও নিয়ে আসেন পৃথিবীতে পরীক্ষার জন্য। ফিরবার আগে ৪৫ মাইল উপর থেকে নামা ওঠার বাহনটি চাঁদের গায়ে নিক্ষেপ করা হয়, এক টন টি. এন. টি-র বিস্ফোরণের তুল্য এই আঘাতে চাঁদ কাঁপে ৫৫ মিনিট ধরে ; পরে এক বিজ্ঞানী বলেন ঘা খেয়ে চাঁদ বাজে ঘণ্টার মত, এই প্রলম্বিত 'ঝংকারের' থেকে মনে হয় আমাদের উপগ্রহটি শুধু

এক পিণ্ড জমাট পাথর নয়। পরবর্তী অভিযানগুলিতেও বর্জিত বাহনটিকে এই কাজে লাগানো হয়। এর পর উচ্চভূমির ফ্রা মোরো খাদে নেমে অনুসন্ধান চালায় অ্যাপোলো-১৪ (ফেব্রুআরি ১৯৭১)। পাথর, যন্ত্র ইত্যাদি বইবার জন্য অভিযাত্রীরা সঙ্গে নেন রিকশার মত গাড়ি। অল্প দিন পরে চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল, তখন এঁদের রাখা যন্ত্রে ধরা পড়ে যে পৃথিবীর ছায়া পড়ে এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় মাটির তাপ নেমে যায় ৬৮ ডিগ্রি থেকে শূন্যের নিচে প্রায় ১২৮ ডিগ্রিতে।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার যন্ত্রবাহী লুনা-১৬ (সেপটেমবর ১৯৭০) ও লুনা-১৭ (নভেমবর ১৯৭০) আবার সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমাগত সাফল্যের থেকে কিছুটা সম্ভ্রম ও মনোযোগ কেড়ে নিল। প্রথমটি নামে অতি প্রাচীন উর্বরতা সাগরে (Sea of Fertility), পৃথিবীর সংকেতে তার যান্ত্রিক হাত প্রায় ১৪ ইঞ্চি খুঁড়ে মাটি সংগ্রহ করে, তা বিশেষ পাত্রে ভরে লুনা-১৬ পৃথিবীতে ফিরে আসে। ব্যর্থ লুনা-১৫ সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল। আশ্চর্যতর কীর্তি প্রকাশ পায় যখন লুনা-১৭ যানের গর্ভ থেকে প্রাচীন বর্ষণ সাগরে (Sea of Rains) বেরিয়ে আসে টবের মত এক গাড়ি, তার নাম লুনোখড-১, অর্থাৎ চাঁদে যে হাঁটে; সে চলত আট চাকার উপর পৃথিবীর রেডিও বার্তার হুকুমে আর টেলি-ভিশনে পাঠাত চলার পথের ছবি। উঁচু নিচু বা ঢালু জায়গায় যাতে সে অচল না হয়ে পড়ে তার জন্য চাকায় বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া মাটি খুঁড়ে সে নিজেরই বর্ণালী যন্ত্রে পরীক্ষা করেছে, মহাজাগতিক রশ্মি ধরেছে এবং অন্যান্য পরীক্ষারও খবর পাঠিয়েছে। এই যান ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু সাড়ে দশ মাস সে কাজ করেছে, যা ছিল নির্মাতাদের আশার অতীত। অবশ্য আমাদের প্রায় ১৪ দিন পর পর রাত্রি বেলা ঐ ক'টা দিন ঘুমিয়েছে এই রোবট, কারণ সূর্যের অভাবে তার ব্যাটারি শক্তি সংগ্রহ করতে পারে নি। চান্দ্র রাত্রির ভীষণ শীতেও তার কোনও ক্ষতি হয় নি।

এর পর লুনা-২০ (ফেব্রুআরি ১৯৭২) সর্বপ্রথম চাঁদের পার্বত্য উচ্চ-ভূমিতে নামবার দাবি করে, তা 'সাগর' অংশের চেয়ে প্রাচীন বলে চাঁদের আদি ইতিহাস জানতে হলে এই অঞ্চলের পরীক্ষা অপরিহার্য; লুনা-২০

উচ্চভূমির পাথর নিয়ে ফিরে এসেছে। ১৯৭৩ জানুআরিতে লুনা-২১ চাঁদে নামে এবং তার গর্ভ থেকে বার হয় লুনোখড-২ প্রশান্তি সাগর (Sea of Serenity) প্রান্তে পার্বত্য এলাকায়। এই লুনোখড প্রথমটির থেকে ২০০ পাউন্ড ভারী, কিন্তু তাদের নির্মাণে ও কর্মসূচীতে বিশেষ পার্থক্য নেই। চাঁদ বা গ্রহে অনুসন্ধানের কাজ শুধু যন্ত্র পাঠিয়ে সম্ভব কিনা এ নিয়ে অনেক দিন ধরে তর্ক চলছিল, এই সব সাফল্য যেন প্রমাণ করল মানুষ পাঠাবার দরকার নেই। মার্কিন উদ্যোক্তারা বলে কার্য ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনার অনেক দাম, সোভিয়েটরা বলে যন্ত্র পাঠাতে খরচ মানুষবাহী যানের ২০-৫০ ভাগের এক ভাগ, তা ছাড়া প্রাণের আশঙ্কা নেই। উন্নততর লুনা ও লুনোখড তৈরি হচ্ছে, অনেকের ধারণা মঙ্গলেও এরা চাঁদের মত অনেক কাজ করবে মানুষ যাবার আগেই।

যাই হক, আমেরিকার কর্মসূচী এগিয়ে চলল। অ্যাপোলো-১৫ (জুলাই ১৯৭১) নামল বর্ষণ সাগর প্রান্তে ১২০০ ফুট গভীর বিসর্পিল হ্যাডলি রিল অঞ্চলে, এই খানার উত্তর-পুবে ও দক্ষিণে দুই পাহাড়ের চূড়া আকাশে ১৫,০০০ (হ্যাডলি গিরি) ও ১২,০০০ ফুট উঠেছে। অভিযাত্রীরা বলেন মাটি ছ ইঞ্চি পুরু তুষারের মত কোমল, আগে তার তুলনা করা হয়েছে ভিজে বালির সঙ্গে। রিকশার বদলে এঁরা সঙ্গে আনেন যন্ত্রচালিত গাড়ি, তাতে নিজেরাও চড়ে বসেন। সংগৃহীত নজির থেকে মনে হয় চাঁদের খানাগুলি তৈরি হয়েছে লাভার স্রোতে। ফিরবার আগে অভিযাত্রীরা একটি কৃত্রিম উপ-উপগ্রহ ছাড়েন, বৎসরাধিক কাল তা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে করে তথ্য পাঠাবে। ফেরার পথে এক জন বাইরে এসে অভিকর্ষহীন মহাকাশে ভেসে বেড়ান কয়েক মিনিট ; এর আগে এ কাজটি হয়েছে পৃথিবীর আওতায়, প্রদক্ষিণরত যান থেকে। অ্যাপোলো-১৬ (এপ্রিল ১৯৭২) দেকার্ৎ অঞ্চলের প্রাচীন পার্বত্য ভূমিতে নামে, তা চাঁদের দৃশ্য দিকটার উচ্চতম জায়গা, পাহাড়ের চূড়া হ্যাডলি গিরিকেও আধ মাইল ছাড়িয়ে যায়, সাগর অঞ্চল চার মাইল নিচে। অভিযাত্রীরা নর্থ রে নামক এক গোল খাদের গা বেয়ে অনেকটা নামেন, কেলি সমভূমিতে স্ফটিক, মাটি ইত্যাদি মিশ্রিত বস্তু ব্রেচা সংগ্রহ করেন যার থেকে মনে হয় এই স্থানের সৃষ্টিতে আগ্নেয় গিরি বা উলকা-ঘাত সম্পর্কিত জটিল প্রক্রিয়া কাজ

করেছে। ফিরবার পথে নানা জীবাণু সূর্যের অতিবেগনি রশ্মিতে খুলে ধরে নিয়ে আসেন গবেষণাগারে ফলাফল পরীক্ষার জন্য। অ্যাপোলো-১৭ (ডিসেমবর ১৯৭২) নামে টরাস-লিট্রভ নামক প্রশস্ত উপত্যকায়, তাকে ঘিরে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু তিনটি পাহাড়। এই যান সর্বপ্রথম রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী ত্যাগ করে এবং সর্বপ্রথম অভিযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন এক বিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক জ্যাক শ্‌মিট। ইনি ও এঁর সঙ্গী ২২ ঘণ্টা চাঁদের গায়ে কাজ করেন, তার মধ্যে তাঁদের গাড়িতে করে অভিযান করেন ২২½ মাইল। এঁদের প্রেরিত রঙীন টেলিভিশনের ছবি পৃথিবীতে আশ্চর্য পরিষ্কার দেখা যায়, এবং এই প্রথম পৃথিবীতে মানুষ চাঁদের উলটো পিঠের চেহারাও টিভিতে দেখে। এঁরা কয়েকটি নতুন যন্ত্র নিয়ে যান এবং তা দিয়ে চাঁদের গায়ে পঞ্চম গবেষণাগার স্থাপন করে আসেন। চাঁদের ক্ষীণ আবহ, তার গায়ে মহাকাশের ধূলি ও উলকাণুর বর্ষণ, ভূগর্ভের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে এই সব যন্ত্র তথ্য পাঠাবে। ভ্রমণ কালে কাজের মধ্যে ছিল এক মাইল গভীরে পর্যন্ত জলের খোঁজ। একটি পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে এঁরা পাথর কুড়িয়ে এনেছেন, তা উচ্চভূমির থেকে ধ্বসে নেমে এসেছে কয়েক শো কোটি বছর আগে, সুতরাং উপত্যকার বস্তুর থেকে অনেক প্রাচীন।

অ্যাপোলো উদ্যোগ সমাপ্ত হয়েছে, এই শতাব্দে হয়তো আর চাঁদে মানুষের পা পড়বে না। আমেরিকার মনোযোগ এখন অন্য দিকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে স্কাইলাব যান তিন যাত্রী নিয়ে তিন দফায় ২৮, ৫৯ এবং ৮৪ দিন ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সূর্য, মহাকাশ, পৃথিবী, মনুষ্য দেহের উপর মহাকাশের ভারশূন্য অবস্থার প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। রাশিয়ার সঙ্গে মহাকাশে সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, প্রথমে তাদের সয়ুজ় পোতের সঙ্গে শূন্যে মার্কিন মহাকাশ যান জুড়বার পরীক্ষা হবে ১৯৭৫ সালে, এর ফলে বিপদে আপদে এক দেশের অভিযাত্রীদের অন্য দেশ উদ্ধার করতে পারবে। তা ছাড়া মহাকাশ যান ও রকেট বিমান মিলিয়ে এক বাহন তৈরি হচ্ছে, মানুষ ও মাল নিয়ে তা খেয়া পারাপার করবে এক প্রদক্ষিণরত স্থায়ী স্টেশনের সঙ্গে ; সেই ঘাঁটি থেকে অভিযান হবে চাঁদ ছাড়িয়ে দূর মহাকাশে, অ্যাপোলোর চেয়ে বৃহত্তর, উন্নততর রথে চড়ে।

অ্যাপোলোর বাহনে এ পর্যন্ত চব্বিশটি মানুষ চাঁদের অঞ্চলে গিয়েছে, সবাই ফিরে আসতে পেরেছে, তার মধ্যে ১২ জন তার মাটিতে নেমেছে। অভিযানগুলিতে ক্রমশ যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য বেড়েছে, পাথর, ধূলি ইত্যাদি বস্তুও আনা হয়েছে বেশী, ছ'টি অ্যাপোলোর আমদানি সব সুদ্ধ ৮৪৪ পাউন্ড। এগুলির সম্পূর্ণ পরীক্ষা বহু দিনের কাজ, পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে তা এখনও চলছে। চান্দ্র শিলার বৈচিত্র্য দেখে ভূতাত্ত্বিকরা উৎফুল্ল হয়েছেন—কোথাও নীল পাথর রোদে জ্বলছে মণির মত, কোথাও বা পাথরের গায়ে নীল কাঁচ বসানো, অ্যাপোলো-১১ সোনা ও চুনির চিহ্ন পেয়েছে। অবশ্য এ সবের তুলনায় মামুলী পাথরই বেশী যার থেকে এক বিশেষজ্ঞরাই রস সংগ্রহ করতে পারেন। তবে অন্তত তিনটি আকরিক বস্তু পাওয়া গিয়েছে যার সঙ্গে পৃথিবীতে তাঁরা অপরিচিত, এবং পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের উপাদানে নিকেল ও সোনা কম, কিন্তু টাইটেনিয়াম ধাতু বেশী। এ ছাড়া আছে কাঁচের দানা, কোনওটা অতি ক্ষুদ্র, এক ধারণা অনুসারে উলকার আঘাতে ও তাপে যে বস্তু ছিটকে উঠেছে তা ঠাণ্ডা হয়ে জমে কাঁচ বনে গিয়েছে। উলকা-ঘাতের উত্তাপ পাথর গলিয়ে লাভারও সৃষ্টি করে থাকতে পারে, সর্বদা তা হয়তো আগ্নেয় গিরির উদ্‌গিরণ নয়।

চাঁদের গায়ে রাখা যন্ত্রে প্রায়ই যে কাঁপুনি ধরা পড়ে তার কিছু নিশ্চয় উলকা-ঘাতে, কিছু হয়তো আভ্যন্তর কারণে। অ্যাপোলো-১০ অভিযানের অধিনায়ক বলেন চাঁদের গায়ে হাজার হাজার আগ্নেয় গিরি দেখেছেন। অ্যাপোলো-১৫ ছাই জাতীয় পদার্থে আগ্নেয় গিরি বিস্ফোরণের চিহ্ন পেয়েছে ; এই অভিযান এও প্রমাণ করেছে যে অন্তর্নির্গত উত্তাপ প্রাক্তন অনুমানের দ্বিগুণ। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে যন্ত্রে মাঝে মাঝে আয়নিত গ্যাসের প্রবাহও ধরা পড়েছে, চাঁদের কম্পনে হয়তো ভিতর থেকে তা মুক্তি পেয়েছে। অ্যাপোলো-১৭ সংগৃহীত কয়েকটি পাথরের খোবলে খোবলে গ্যাস আটকে আছে, হয়তো তা একদা আগ্নেয় গিরির উদ্‌গিরণ ; তা ছাড়া প্রদক্ষিণরত যানটি থেকে অভিযাত্রী এভান্‌স দুটি রহস্যময় আলোর চমক দেখেন (একটি এক বড় খাদের কাছে), তা হয়তো জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরির থেকে এসেছে। উপরন্তু চাঁদের দৃশ্য ও অদৃশ্য দিকে তিনি

কয়েকটি আকৃতি দেখেন যা সম্ভবত আগ্নেয় গিরির সৃষ্টি। ১৯৫৮ সালে রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কজিরেভ দূরবিনে বিখ্যাত আল্‌ফন্‌সাস খাদের কেন্দ্রীয় মুখের কাছে কিছুটা লাল আভা লক্ষ করেন, ধোঁয়া বার হলে যেমন হতে পারে। পরে আরিস্টার্কাস খাদ থেকে হাইড্রোজেনের নির্গমন নাকি ধরা পড়ে তাঁর বর্ণালী যন্ত্রে; এই খাদ সম্বন্ধে এই ধরনের দাবি আরও হয়েছে। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী জানান যে চাঁদে স্থাপিত যন্ত্রের সাহায্যে অন্তত তিন বার তাঁরা আয়নিত জল বাষ্প সনাক্ত করেছেন এবং তা পরিমাণে সবচেয়ে প্রচুর যখন চাঁদ কেঁপেছে বেশী, সুতরাং হয়তো ভিতরে জল আছে এবং কিছুর ঠেলায় বেরিয়ে এসেছে। অভিযাত্রীরা চাঁদে বর্তমানে বা অতীতে জলের কোনও প্রত্যক্ষ নজির না পেলেও আগ্নেয় গিরির সাক্ষ্য যা সংগ্রহ করেছেন (বিশেষত অ্যাপোলো-১৭ থেকে) তা পার্থিব পরীক্ষার তুলনায় অনেক স্পষ্ট। তা হলে অন্তত কিছু খাদ আগ্নেয় গিরির সৃষ্টি।

চাঁদের যে চুম্বকী ক্ষেত্র আছে অ্যাপোলো অভিযানের এই আবিষ্কারও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে; যদিও এই চুম্বক পৃথিবীর তুলনায় অনেক দুর্বল, তা এই সম্ভাবনারই সমর্থক যে আজ না হলেও একদা তার গর্ভে গলিত লোহা ছিল এবং সে দ্রুত পাক খেত। দূর অতীতের চুম্বকী শক্তির সাক্ষ্য থেকে মনে হয় একদা চাঁদ খুব প্রবল চুম্বক ছিল, অর্থাৎ তার গর্ভে ছিল অনেকটা গলিত লোহা; যদিও অন্যান্য নজির এর বিপরীত তা হলেও চাঁদকে আর শুধু মঙ্গলের উপগ্রহগুলির মত জড় বস্তুর পিণ্ড ভাবা চলে না, সে বরং গ্রহের সঙ্গে তুলনীয়, পৃথিবীর মত সেও পরিবর্তনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তারও হয়তো বস্তু গলে ভারী পদার্থগুলি নিচে নেমেছে, হালকাগুলি ভেসে উঠেছে, স্তর ভাগ হয়েছে। এও জানা গিয়েছে যে তরুণ বয়সে মহাকাশ থেকে প্রকাণ্ড বস্তু পিণ্ডের অবিরাম বর্ষণ তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে (সম্ভবত পৃথিবীকেও), এবং গত ৩১০ কোটি বছর ধরে তার ত্বক প্রায় অপরিবর্তিত।

কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমের থেকে আমরা চাঁদ সম্বন্ধে যা জেনেছি (অধিকাংশই আমেরিকা থেকে) তা প্রায়ই আভাষে ইঙ্গিতে, তার অনেক কিছুই সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। তবে মনে হয় চাঁদ যে শীতল শিলা খণ্ড বা অসাড় জগৎ এই প্রাক্তন ধারণা এখন অচল। চাঁদে প্রাণী নেই, সম্ভবত কোনও

দিন ছিল না। তা ধূলি বা ভস্মের উপাদানে তৈরি এমন জল্পনাও দূর হয়েছে। দেখা গেল যে চাঁদের বস্তু অনেকাংশে পৃথিবীর মত হলেও পাথরের বয়সে এবং চরিত্রে পার্থক্য আছে। কিন্তু বড় বড় প্রশ্নগুলি থেকে গেল, অনেকে যে ভেবেছিল যে মানুষের একটি দুটি অভিযান সব সমস্যা মেটাবে তা হয় নি। চাঁদের অভ্যন্তর এখনও কি তপ্ত, সেখানে কি সত্যিই পৃথিবীর মত স্তর ভেদ আছে? সাগর ও খানা কিসের সৃষ্টি, খাদগুলির কোনটা আগ্নেয় গিরির মুখ, কোনটা উলকা-ঘাতের চিহ্ন? প্রাচীনতম শিলার নজির বলে প্রায় ৩৯০ কোটি বছর আগে চাঁদের গায়ে কোনও এক সাংঘাতিক প্রাকৃতিক ঘটনায় তারা গলে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ঘটনা যে কি বিজ্ঞানীরা এখনও তার জবাব খুঁজে পান নি।

সবচেয়ে বড় সমস্যা চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে। এক ধারণা অনুসারে আদি যুগে দ্রুত-ঘুরন্ত পৃথিবীর থেকে এক খণ্ড ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীরই কন্যা। জর্জ গ্যামো একদা লিখেছিলেন যে মাতা বসুন্ধরার গায়ে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর ক্ষত তার প্রথম এবং একমাত্র কন্যার জন্মের স্মৃতি চিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। দ্বিতীয় প্রকল্প হল অন্যান্য উপগ্রহের মত চাঁদও সৌর লোক সৃষ্টির সময়ে গ্রহের কাছাকাছি ধূলি ও মেঘ থেকে দানা বেঁধেছে। এ দুটি সম্ভাবনা নিয়ে মুশকিল এই যে পৃথিবীর সঙ্গে চান্দ্র বস্তুর উপাদানে কিছু কিছু পার্থক্য আমরা দেখেছি এবং চাঁদের ঘনতা পৃথিবীর মাত্র ৬০ শতাংশ ; তা ছাড়া পরিমাণে চাঁদ পৃথিবীর ৮০ ভাগের এক ভাগ, যদিও সৌর পরিবারের অন্যান্য উপগ্রহের ভর তাদের গ্রহের সহস্রাংশেরও কম। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের বেশী।

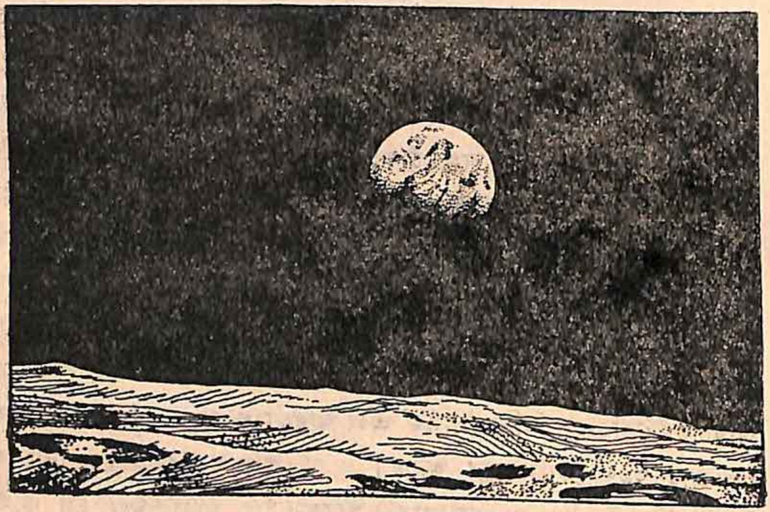
এও হতে পারে যে ছোট ছোট বস্তু পিণ্ড পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে করতে জুড়ে গিয়েছে, কিংবা দুই নিকটবর্তী প্রাক্‌গ্রহ পরস্পরের টানে বাঁধা পড়েছে। দূরাগত পথভ্রান্ত এক গ্রহ পৃথিবীর কাছাকাছি এসে তার আকর্ষণ এড়াতে পারে নি এও বলা হয়েছে ; এক মত অনুসারে তা ঘটেছে ১৭০ কোটি বছর আগে এবং এখন আবার চাঁদ অতি ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। (এখানে মনে পড়ে যে বুধ ও প্লুটো সম্বন্ধে সম্প্রতি বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীত ধারণা—সম্ভবত উপগ্রহ থেকে গ্রহে পরিণত হয়েছে তারা।) অনেকে বলেন চাঁদ যদি পৃথিবীরই ভগ্নাংশ হয় অথবা বন্দী দূরাগত গ্রহ হয় তা হলে প্রদক্ষিণের

কক্ষ প্রলম্বিত হওয়া উচিত, আসলে তা প্রায় বৃত্তাকার। হ্যারল্ড উরে ঠিকই বলেছেন যে চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি সবই দুঃসম্ভব।

সুতরাং ছ'টি অ্যাপোলো অভিযানে চাঁদের প্রত্যক্ষ মানবিক অনুসন্ধান সমাপ্ত করেও হেঁয়ালি রয়ে গেল তার উৎপত্তি ও আদি ইতিহাস সম্বন্ধে। তবে অ্যাপোলো-সংগৃহীত পাথর এবং বিবিধ তথ্যের পরীক্ষা থেকে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তুলেছেন। শেষ অভিযান অ্যাপোলো-১৭ এক শিলা খণ্ড এনেছে যার বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর, সোভিয়েট লুনা-১৬ ও ২০ কুড়িয়েছে সমান প্রাচীন রিগোলাইট পাথর, সুতরাং মনে হয় পৃথিবীর সঙ্গে চাঁদও সৌর লোকের সৃষ্টির সময়ে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশের ধারণা এই যে পৃথিবীকে ঘিরে যে সব বস্তু খণ্ড ঘুরছিল তাই জুড়ে তৈরি হয়েছে চাঁদের দেহ। গড়ন্ত চাঁদের টানে তার উপরে ছোট বড় পাথরের অবিরাম বর্ষণ চলতে থাকল, সেই ঘর্ষণে এত তাপ সৃষ্টি হল যে বহির্গাত্র পরিণত হল লাভার সাগরে। ক্রমশ এই আবরণ জুড়িয়ে কঠিন হল, যেমন কমল শিলা বৃষ্টি, যদিও পরবর্তী বড় বড় উলকার আঘাতেই তৈরি হল বিভিন্ন 'সাগর' এবং অধিকাংশ খাদ। শিলা বর্ষণ শেষ হল প্রায় ৩৯০ কোটি বছর আগে। পরে আভ্যন্তর তেজস্ক্রিয় পদার্থের (যেমন ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম) অবক্ষয়ে চাঁদ আবার তপ্ত হল, ফলে ৪০০-৩০০ কোটি বছর আগে ভিতরের লাভা ঠেলে বেরিয়ে সৃষ্টি করল আগ্নেয় গিরি, এদের মুখগুলিও হয়তো পরিণত হল খাদে, উদ্গীর্ণ লাভা গিয়ে জমল 'সাগরের' নিম্নভূমিতে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সব কৌশল ও উদ্যোগ সত্ত্বেও চাঁদ যে এখনও অধিকাংশে রহস্যময় এতে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট না হলেও কবিরা নিশ্চয় খুশী। অভিযাত্রীরা চাঁদের প্রত্যক্ষ দৃশ্যের যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও কবির মন সাড়া দেবে, এই প্রাণহীন বায়ুহীন উপগ্রহের সৌন্দর্য পৃথিবীর অভিজ্ঞতায় নাকি অতুলনীয়। ভোরের আলো বিশাল গিরি শ্রেণীতে যেন সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে, অন্যত্র দীর্ঘ গভীর গহ্বর এঁকেবেঁকে চলেছে দূর দূরান্তরে, দিগন্ত-বিস্তৃত নিথর নিস্তব্ধ প্রান্তর—এই দৃশ্যের মুখোমুখি এসে তাঁরা শুধু মুগ্ধ হন নি, নিজেকে মনে হয়েছে ক্ষুদ্র, মানুষের হানাহানি তুচ্ছতর, হীনতর প্রতিপন্ন

হয়েছে। দূর আকাশে ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকে ভালবাসতে, তার সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে ইচ্ছা হয়েছে। ফিরে এসে এক অভিযাত্রী বলেছেন, "আমি আর সেই মানুষটি নেই—আমাদের কেউ না।" কেউ কাজ ছেড়ে দিয়ে ধর্ম প্রচারে মন দিয়েছেন, কেউ জীবনে প্রথম কবিতা রচনা করেছেন, কেউ বা অতীন্দ্রিয় বোধ শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।···



১১নং চিত্র

অ্যাপোলো-৮ থেকে চাঁদের গা ও দূরে পৃথিবীর দৃশ্য

যেমন জন্ম তেমনি চাঁদের মৃত্যু সম্বন্ধেও একাধিক ধারণা। শেষ পরিণতি সম্বন্ধে এক সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে শনির বলয় প্রসঙ্গে। এই ধারণা অনুসারে সূর্যের মরণ দশা শুরু হলে চাঁদ সম্ভবত ক্রমে পৃথিবীর দিকে সরে আসবে যত দিন সূর্য উষ্ণ থাকে। হয়তো চাঁদ এত কাছে আসবে যে তার দুই পিঠে পৃথিবীর অভিকর্ষীয় টানের পার্থক্যের ফলে সে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যাবে। খণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে ঘা খেতে খেতে আরও ছোট হবে এবং শেষ পর্যন্ত শনির মত কয়েকটি পাতলা বলয়ের সৃষ্টি হবে পৃথিবীর নিরক্ষ রেখাকে ঘিরে।

কিন্তু আধুনিক তাত্ত্বিকরা এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ

করেছেন, তাঁদের ধারণা এই পরিণতি ঘটতে সূর্যের যত কাল উষ্ণ থাকা দরকার তা সে নাও থাকতে পারে। হয়তো সে তার অন্তিম অবস্থাগুলি এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে আসবে যে তার তাপ চাঁদকে ফেটে যাওয়ার মত কাছে আনতে পারবে না পৃথিবীর। তার পরিবর্তে চাঁদ আবার পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাবে। ক্রমে তার আলো কমবে, রাত্রির আঁধার বেড়ে চলবে, অবশেষে তাকে আর দেখাই যাবে না। সে যুগের দিনও খুব আনন্দজনক হবে না, সূর্য তখন দ্রুত ক্ষীণ হতে থাকবে, ফলে তখনকার ফ্যাকাশে ভূতুড়ে রোদ আজকের পূর্ণিমার তুলনায় বেশী উজ্জ্বল হবে না। তবে এই দুর্ভোগ পোহাতে মানুষ টিঁকে থাকবে কিনা সন্দেহ, কারণ ৫০০ কোটি বছরের আগে সূর্যের কোনও পরিবর্তনই হবে না।

দূর মহাকাশের নীহারিকা থেকে আরম্ভ করে আমরা একে একে অনেক জ্যোতিষ্কের সঙ্গে পরিচয় করেছি, আমাদের শেষ আলোচ্য মানুষের ধাত্রী এই ধরিত্রী। আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার মত এই পৃথিবীর উৎপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধেও আদি কাল থেকে জল্পনা কল্পনা চলেছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক যুগের তত্ত্বাবলীও আজ অচল। এ বিষয়ে পশ্চিম জগতে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের উপর টেক্কা দিয়েছেন ধর্মযাজক আশার (Ussher), তাঁর মত টিঁকে ছিল প্রায় তিন শতাব্দ। ১৬৫০ সালে তিনি ফতোয়া দেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অকটোবর রবি বার সকাল ন'টায়। বাইবেলে আদমের বংশধরদের যে তালিকা আছে তাদের আয়ু কাল থেকেই এই হিসাব তৈরি হয়েছে। আজ বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বয়স ধরা হয় ৪৬০ কোটি বছর।

১৬৪৪ সালে দার্শনিক দেকার্ৎ পৃথিবীকে কল্পনা করেন সূর্যের মত প্রজ্বলিত জ্যোতিষ্ক রূপে। পরবর্তী শতকে কান্ট ও লাপ্লাস মনে করেন সূর্য-আবরণী এক গ্যাসীয় নেবুলা দানা বেঁধে পৃথিবীর সৃষ্টি—বলা বাহুল্য এই ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনেকটা কাছাকাছি। তাঁদের পরে বিবিধ প্রকল্পে পৃথিবীকে সূর্যের সন্তান রূপে ভাবা হয়েছে, হয় এক বিস্ফোরণের পরে সে তার গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, নতুবা কাছে এসে পড়া অন্য তারার সংঘর্ষে বা আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই দ্বিতীয় ধারণা অল্প

দিন আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল, এবং দুই তারার সাক্ষাতের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ বলে লোকের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে অধিকাংশ তারাই গ্রহহীন, গ্রহ সৃষ্টি অতি দুঃসম্ভব ও আকস্মিক ঘটনা, সুতরাং আমাদের পৃথিবী এবং তার এই প্রাণ এক বিশেষ গৌরবের অধিকারী।

এই সব তত্ত্বে নানা অসঙ্গতি যে ছিল এবং তার ফলে এ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা যে সম্পূর্ণ নতুন পথে চলেছে সৌর লোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে সেই আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাশে শীতল গ্যাস ও বস্তু কণা জমে কি করে তারাকে ঘিরে গ্রহ পরিবারের সৃষ্টি হতে পারে কুইপারের তত্ত্বে তা আমরা দেখেছি। সৌর লোকে এখনকার তুলনায় সদ্যোজাত গ্রহগুলি অনেক গুণ ভারী ছিল, এই প্রাক্‌পৃথিবীর ওজন ছিল সম্ভবত ৫০০ গুণ বেশী, ব্যাস ২০০০ গুণ। বহু লক্ষ বছর ধরে ভারী মৌলিক পদার্থগুলি তার কেন্দ্রের দিকে ডুবতে ডুবতে গুরুভার অষ্ঠি সৃষ্টি করল, তাকে ঘিরে থাকল হালকা গ্যাস, প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। ইতিমধ্যে সংকোচনরত সূর্যের ঘনতা বাড়তে বাড়তে এমন এক সন্ধি ক্ষণ এল যখন ভিতরের অবপারমাণবিক প্রক্রিয়ার ফলে তাপ নির্গমন শুরু হল, সূর্য জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল, তার গা থেকে উষ্ণ আয়নের স্রোত বেরিয়ে এসে নিকটবর্তী গ্রহগুলিতে যেটুকু গ্যাস তখনও জড়িয়ে ছিল তা দূর করে দিল ; তা ছাড়া গ্রহগুলি নিজেরাও গরম হয়ে ওঠার ফলে গ্যাস উবে গেল। কয়েক হাজার লক্ষ বছর পরে অধিকাংশ গ্যাস চলে গিয়ে থাকল সংকুচিত, সূর্যতপ্ত প্রায় নগ্ন কতগুলি নিকট গ্রহ এবং গ্যাস-ঢাকা দূর গ্রহ—যে অবস্থা বর্তমানে আমরা দেখছি।

এর মধ্যে প্রাক্‌পৃথিবীর কেন্দ্র ঘন হয়ে যখন এক অষ্ঠি গড়ে উঠল তখন সংকোচনের ফলে এবং তাপবিতরণী তেজস্ক্রিয় পদার্থের থেকে তার উষ্ণতা বাড়তে থাকল, এক সময়ে গলে গেল এই পৃথিবী। পরে সংকোচনী শক্তি যখন ফুরিয়ে গেল, তেজস্ক্রিয় বস্তু ক্ষয়ে গেল, তখন পৃথিবী আবার জুড়াতে আরম্ভ করল—এই ঠাণ্ডা হওয়া হয়তো এখনও চলছে।

সুইডেনের হানেস আল্‌ফভেন ও ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গুস্‌টাফ আরেনিয়াস সূর্যের দূর গ্রহগুলির ভর ও তাদের উপগ্রহগুলির আয়তন ও ভরের সম্পর্ক থেকে হিসাব করেছেন যে একদা পৃথিবীর হয় দু তিনটি নয় আট

ন'টি চাঁদ ছিল, তাদের সম্মিলিত ভর বর্তমান চাঁদের সহস্রাংশের বেশী নয়। তারা কোথায় গেল? এঁরা বলেন আমাদের পরিচিত চাঁদ যখন পৃথিবীর বাঁধনে ধরা পড়ল তখন এই খুদে চাঁদরা হয় তার গায়ে আছড়ে পড়ে তারই দেহে লীন হল, অথবা এক বা একাধিক চন্দ্রাণু কক্ষভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল; টোরা নামক গ্রহাণুর কক্ষ পথ থেকে মনে হয় সে হয়তো এই দলের।

আগে ধারণা ছিল এক অক্সিজেন ছাড়া পৃথিবীর বর্তমান আবহ আদি গ্যাসেরই অবশিষ্টাংশ। এখন অনেকের মত এই যে সূর্য জ্বলতে শুরু করার পর প্রাথমিক আবহ শূন্যে হারিয়ে যায়, পৃথিবীকে নতুন গ্যাসীয় আবরণ দেয় আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণ, যার উত্তাপ আসে অভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় থেকে। বিস্ফোরণের ফলে জল বাষ্প, আঙ্গারিক গ্যাস, নাইট্রোজেন ইত্যাদি নির্গত হল ভিতর থেকে; এ ছাড়া কারবন ও নাইট্রোজেন হয়তো ছিল মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস রূপে; জল বাষ্প জুড়িয়ে সাগর সৃষ্টি করল। আগ্নেয় গিরির উত্তাপ, অতিবেগনি রশ্মি ইত্যাদির প্রভাবে গ্যাসগুলির পরস্পরের সঙ্গে এবং পাথরের সঙ্গে প্রক্রিয়ার ফলে নানা রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। উদ্ভিদের দান অক্সিজেন যখন পাওয়া গেল তখন সম্পূর্ণ হল বর্তমান আবহ। সৌর জগতে একমাত্র পৃথিবীরই আবহে অক্সিজেন এক প্রধান উপাদান।

চাঁদেরই মত তরুণ পৃথিবীকেও সম্ভবত উলকার গোলাবর্ষণ এবং আগ্নেয় গিরির উদ্‌গিরণ জর্জরিত করেছিল, কিন্তু বৃহত্তর পৃথিবী এই উদ্‌গীর্ণ গ্যাস এবং আভ্যন্তর তাপ চাঁদের তুলনায় অনেক বেশী ধরে রেখেছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে বায়ুমণ্ডল ও সাগর, অর্থাৎ প্রাণ আবির্ভাবের ক্ষেত্র। বাতাসের বেগ, জলের স্রোত, পর্বত সৃষ্টি ইত্যাদি পৃথিবীতে এই বৈপ্লবিক সূচনার চিহ্ন ক্রমশ মুছে দিয়েছে, বায়ুহীন জলহীন চাঁদ থেকে গিয়েছে অপরিবর্তিত।

১৭৫৪ সালে নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র ব্যবহার করে ক্যাভেন্‌ডিশ পৃথিবীর ওজন মোটামুটি সঠিক নির্ধারণ করেছিলেন ৬·৬ কোটি কোটি কোটি টন (৬৬-র পরে কুড়িটা শূন্য)। এই গ্রহের আয়তন প্রায় ২৬,০০০ কোটি ঘন মাইল, গড় ঘনতা ৫·৫, অর্থাৎ সব মিলিয়ে তার বস্তু জলের অত গুণ ভারী। আয়তন অনুপাতে সৌর গ্রহদের মধ্যে পৃথিবী সবচেয়ে ভারী—শনি যে সবচেয়ে হালকা, সে যে জলে ভাসবে তা আমরা আগে

দেখেছি। অবশ্য পৃথিবীর বস্তু সর্বত্র সমান ঘন নয়, তার খোসার ঘনতা গড় ঘনতার অর্ধেকের কাছাকাছি মাত্র, সুতরাং ভিতরটা অপেক্ষাকৃত ভারী।

ভূপদার্থবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বস্তু বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। এক দলের মতে উপরের কয়েক মাইল পুরু খোলসটার নিচে আছে ১৮০০ মাইল গভীর এক স্তর, তার নিচে ১৩৭৫ মাইল গভীর বহির-অষ্ঠি এবং সব শেষে ৮০০ মাইলের ভিতর-অষ্ঠি। পৃথিবীর গর্ভে আছে নিকেল-মিশ্রিত লোহা। মানুষ আজ মহাকাশে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে যাচ্ছে, কিন্তু এই গ্রহের অন্তর্দেশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংগ্রহ করা আজও প্রায় স্বপ্নের রাজ্যে। পৃথিবীর ব্যাস যদি আমরা কল্পনা করি পাঁচ ফুট মাত্র, তবে তার গায়ে সামান্য কাঁটার খোঁচার সঙ্গে আমাদের গভীরতম খননও তুলনা করা চলে না। তবে উলকার উপাদানে যে পার্থক্য দেখা যায় তা আমরা জানি, উলকা যদি গ্রহের খণ্ড হয় তো এই পার্থক্যের থেকেও হয়তো পৃথিবীর স্তরের (এমন কি উৎপত্তিরও) কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ভূমিকম্পের থেকে আন্দাজ হয় তার অষ্ঠিতে আছে প্রধানত গলিত লোহা। তা ছাড়া, পৃথিবী যে প্রকাণ্ড চুম্বকের মত ব্যবহার করে তা সুবিদিত, স্বাবর্তন গতির ফলে তার ভিতরের তরল লোহার নড়াচড়া থেকে এই চুম্বকী ক্ষেত্রের উৎপত্তি এই রকমই সাধারণ বৈজ্ঞানিক ধারণা। উপরের দিকে আছে যে সব পাথর ভূবিজ্ঞানীরা তাদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপের পার্থক্যের জন্য পাথুরে খোলসে যে ফাটল ধরে তাতে ভূমিকম্প ঘটে এই এক সনাতন ধারণা। প্রতি বছর প্রায় কুড়িটা বড় ভূমিকম্প হয়, ছোটর সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, অর্থাৎ মিনিটে দুটি। গুরুতর কম্পন প্রায় সবই দুটি সরু লম্বা অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। সবচেয়ে ভীষণ দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৫৫৬ সালে চীনের শেন্‌সি প্রদেশে, হতর সংখ্যা ৮৩০,০০০; তার পরের বৃহত্তম ভূমিকম্পের স্থান কলকাতা, ১৭৩৭ সালে সে অঞ্চলে তিন লক্ষ লোক মরেছিল।

পৃথিবীর ভিতরের দিকটা ছেড়ে এ বার বাইরের দিকে চোখ ফেরানো দরকার। আমাদের সব মহাসাগরে যত জল তার চেয়েও বিশাল গ্যাসের সাগরে এ গ্রহ নিমজ্জিত। মাছ ও অন্যান্য কিছু প্রাণীর জন্য জল অত্যাবশ্যক, কিন্তু এই বায়ুমণ্ডল বিনা পৃথিবীতে প্রাণের মেলা কোনও দিনই জমত

না। তার অক্সিজেন নিশ্বাস যোগায়, বৃষ্টি ও আবহের প্রভাবে ভূমি ক্ষয় হয়ে উদ্ভিদের ক্ষেত্র মাটি সৃষ্টি হয়, এরা আঙ্গারিক গ্যাস থেকে চিনি জাতীয় বস্তু এবং তার থেকে জটিলতর কারবোহাইড্রেট তৈরি করে, তারই উপর নির্ভর করে সমগ্র পশু জগৎ। আবহের উচ্চ স্তরে ছাতার মত কাজ করে ওজোন, সূর্যপ্রেরিত মারাত্মক অতিবেগনি আলো আটকে দেয়। নানা রকম ক্ষতিকর রশ্মি ও উল্কার থেকে তো আবহ আমাদের রক্ষা করেই, উপরন্তু তা মহাকাশের শৈত্য ভিতরে ঢুকতে দেয় না এবং সূর্যের তাপকে ভিতরে ধরে রাখে।

প্রতি বছর ঘূর্ণবাত, মৌসুম, সূর্যতাপ ইত্যাদির প্রভাবে এক লক্ষ ঘন মাইল জল আবহে উঠে যায় সাগর ও মহাদেশ থেকে। এই আবহই আবহাওয়ার (weather) জন্য দায়ী। এরই কারণে থেকে থেকে আকাশে নানা বৈচিত্র্য নানা সৌন্দর্য—যেমন সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে, এমন কি ঝড় বাদলে পর্যন্ত।

এই সমগ্র গ্যাসীয় আবরণটার ভার পৃথিবীর বড়জোর দশ লক্ষের এক ভাগ। সমুদ্রপৃষ্ঠে (sea level) তার চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড। উপরের দিকে ক্রমশ অবশ্য গ্যাসের ঘনতা কমে যাচ্ছে। কোথাও এর সুনির্দিষ্ট সমাপ্তি বা বিভাগও নেই, তবে বিভিন্ন স্তরের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, সেই অনুসারে বিজ্ঞানীরা তার ভাগাভাগি করেছেন। এক আধুনিক রীতিতে প্রথম স্তরটিকে বলে ক্ষুব্ধ মণ্ডল (troposphere), তার উচ্চতা পাঁচ থেকে দশ মাইল; তার পরের দশ থেকে ১৫ মাইলের নাম স্তব্ধ মণ্ডল (stratosphere); তৃতীয় স্তর মধ্য মণ্ডল (mesosphere) শেষ হয়েছে ৫০ মাইল উর্ধ্বে; চতুর্থ স্তর আয়ন মণ্ডল (ionosphere) উঠেছে ৩৫০-৬০০ মাইল পর্যন্ত; সব শেষে বহির্মণ্ডল (exosphere) পাতলা হতে হতে ৪০,০০০ মাইল দূরে প্রায় শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

সমগ্র বায়ুমণ্ডলের তিন চতুর্থাংশ ওজন আছে ক্ষুব্ধ মণ্ডলে, এই স্তরে ধূলি মেঘ ঝড় ও সব রকম প্রাণী সীমাবদ্ধ। উপাদান ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২১ শতাংশ অক্সিজেন, ০'৯ শতাংশ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরগন, ০'০৩ শতাংশ আঙ্গারিক গ্যাস, এবং অতি সামান্য পরিমাণ অন্যান্য গ্যাস; এক মাত্র জলীয় বাষ্পের পরিমাণ স্থান ও ঋতু ভেদে অল্প

বিস্তর বদলায়। অবশ্য বড় শহর ও কারখানার অঞ্চলে আঙ্গারিক গ্যাসও বাড়ে।

তিন পরমাণু আক্সিজেন যুক্ত হয়ে যে ওজোন তৈরি হয় এবং যা আমাদের অতিবেগনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে তা আছে স্তব্ধ মণ্ডলে। মধ্য মণ্ডলও আমাদের রক্ষক, অধিকাংশ উলকা সেখানে পুড়ে ছাই হয়। আয়ন মণ্ডল সভ্য মানুষের এক মস্ত বড় সহায়, তা রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত করে বলে আজ আমরা ঘরে বসে দূরের গান বাজনা শুনতে পাই ; তা ছাড়া এই স্তরে দেখা দেয় আশ্চর্য সুন্দর মেরুজ্যোতি।

১৯৫৮ সালে আমেরিকার জেম্‌স ভ্যান অ্যালেন এবং তাঁর সহকর্মীরা এক অতি গুরুতর ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার করেন। এক্‌স্‌প্লোরার ও পাইওনিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্য থেকে এঁরা জানতে পারেন যে পৃথিবীর অনেক উপরে এবং তার চুম্বকী ক্ষেত্রের মধ্যে বিকিরণের ছুটি প্রকাণ্ড বেষ্টনী আছে, অবিলম্বে তা আবিষ্কারকের নামে পরিচিত হয় (Van Allen radiation belts)। পরে দেখা গেল আসলে ছুটি বেষ্টনী নেই, আছে একটি লম্বা আবরণ ; এর আধুনিক নাম চুম্বক মণ্ডল (magnetosphere), ৬০০ মাইল উর্ধ্বে আরম্ভ হয়ে হঠাৎ শেষ হয়েছে ৪০,০০০ মাইল দূরে, অর্থাৎ তা পার্থিব আবহের বহির্মণ্ডলের অংশ।

এই চুম্বক মণ্ডলও আমাদের রক্ষকের কাজ করে, মারাত্মক বিকিরণের তা এক ফাঁদ। সূর্য থেকে প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন ক্রমাগত পৃথিবীর চুম্বকী ক্ষেত্রে এসে পড়ছে, তারা এই বেষ্টনী পার হতে পারে না, অবশ্য পৃথিবীর চুম্বকী মেরু অঞ্চলে ছাড়া ; সেখানে বিকিরণ প্রবেশের ফলে জলন্ত মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়। প্রবল মহাজাগতিক রশ্মিগুলি চুম্বক মণ্ডল ভেদ করে, কিন্তু ছুর্বলগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। দূরবিন ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্ব পর্যবেক্ষণের পথে আমাদের আবহ যে কত বড় বিরক্তিকর বাধা তা আগে বলেছি, এখন দেখা গেল নানা রকম মারাত্মক বিকিরণের বাধা হয়ে তা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে।

এই বার আমরা কল্পনা করব মহাকাশে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন এক পর্যবেক্ষক পৃথিবীকে লক্ষ করছে। প্রথমেই তার নজরে পড়বে গ্রহটি সম্পূর্ণ গোল নয়। নিরক্ষ রেখার কাছে পৃথিবীর ঘূর্ণি বেগ যে অন্যান্য

অঞ্চলের তুলনায় বেশী তার থেকে এবং বৃহস্পতি ও শনির দৃষ্টান্ত দেখে নিউটন বলেছিলেন যে পৃথিবীর পেটও বিস্ফারিত। বহির্মুখী গতি জাত এই বিস্তার ১৮ শতাব্দে পরীক্ষায় সমর্থিত হয়, দেখা যায় মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত যতটা দূর নিরক্ষ বৃত্তের ব্যাস তার ২৬·৭ মাইল বেশী; তার ফলে ভূগোলের বইতে সবাই পড়ে এসেছি যে এই ভূ ঠিক গোল নয়, "কমলা লেবুর মত ঈষৎ চ্যাপটা"। ভ্যাংগার্ড কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অনুষ্ঠিত গবেষণার এক আবিষ্কার এই যে কটি দেশের বিস্তার সর্বত্র সমান নয়, তার চারটি কোণ আছে; সবচেয়ে উঁচু ক্ষেত্রগুলি (তফাৎ প্রায় ২৫ ফুট) আছে নিরক্ষ রেখার অল্প দক্ষিণে এবং এই রেখা কিছুটা উপবৃত্তিক। পেটের এই স্ফীতি সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না, পৃথিবীর ব্যাস পাঁচ ফুটে পরিণত করলে তা দাঁড়াবে এক ইঞ্চির পঞ্চমাংশ মাত্র!

মহাকাশের সূক্ষ্মদর্শী পর্যবেক্ষক পৃথিবীর নানা গতির মধ্যে সবচেয়ে সহজে দেখতে পাবে তার আহ্নিক গতি বা ঘূর্ণি পাক, যার থেকে আমাদের দিন ও রাত্রির বিবর্তন। যে অক্ষকে ঘিরে এই আবর্তন তা ২৩·৫ ডিগ্রি হেলানো। পাকের বেগ সবচেয়ে বেশী অবশ্য নিরক্ষ রেখায়—ঘণ্টায় ১০৫০ মাইল।

এর পরেই উল্লেখ্য প্রদক্ষিণ গতি। ৩৬৫ দিন ছ ঘণ্টায় ৬০ কোটি মাইল দীর্ঘ পথে পৃথিবী এক বার সূর্যকে ঘুরে আসছে, মিনিটে ১১০০ মাইল বেগে। এই কক্ষ অবশ্য বৃত্ত নয়, উপবৃত্ত; গড়ে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯·২৯ কোটি মাইল, কিন্তু তার মধ্যে পার্থক্য ঘটে ৩১ লক্ষ মাইলের। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে পৃথিবী প্রতি বছর একই উপবৃত্তের পথে ঘোরে না, উত্তর মেরু থেকে দেখলে উপবৃত্তের অক্ষ প্রতি প্রদক্ষিণে অল্প একটু ঘুরে যায় ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে।

পৃথিবীর স্বাবর্তন ও প্রদক্ষিণ গতি দিন ও বছর নির্ধারণ করছে, আমাদের জীবনে তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু এ ছাড়া এ গ্রহের আরও অনেক গতি আছে যার খবর অনেকেরই অজানা। প্রদক্ষিণ কক্ষ উপবৃত্ত হলেও এই পথটা পৃথিবীর নয়, পৃথিবী ও চাঁদের মহাকর্ষীয় কেন্দ্রের। পৃথিবী চাঁদের থেকে ৮০ গুণের বেশী ভারী, ফলে এই দুইয়ের কেন্দ্র যোগ করে এক দাগ টানলে যৌথ মহাকর্ষীয় কেন্দ্রের অবস্থান

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০০ মাইল দূরে। এই কেন্দ্রই শূন্যে উপবৃত্ত সৃষ্টি করে চলেছে, এবং যেহেতু চাঁদ এক বার পৃথিবীর এ দিকে আর এক বার ও দিকে যাচ্ছে সেহেতু পৃথিবীর স্বকীয় পথটি হচ্ছে সাপের মত আঁকাবাঁকা যার এক পাশ থেকে অন্য পাশের দূরত্ব প্রায় ৬০০০ মাইল।

চাঁদের মত গ্রহরাও অবশ্য পৃথিবীর উপর মহাকর্ষীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে তার কক্ষে অনুরূপ ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু তারা চাঁদের চেয়ে বড় হলেও এত দূরে যে এই ব্যতিক্রম অতীব সূক্ষ্ম।

পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতির মত তার স্বাবর্তনও নিখুঁত নয়, এবং তারও কারণ চাঁদ। চাঁদের টানে আমাদের সমুদ্রে যে জোয়ার ভাটা দেখা দেয় তার ওজনে পৃথিবীর পাক অল্প একটু অস্থির হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, চাঁদ যখন এক বার নিরক্ষ রেখার দক্ষিণে ও পরে উপরে যায় তখন সম্ভবত পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্ফীতির উপর তার মহাকর্ষীয় প্রভাবও অক্ষটিকে টলমলিয়ে দেয়। লাট্টুর বেগ যখন মন্দ হয়ে আসে তখন তা যেমন প্রাক্তন অক্ষটির চতুর্দিকে একটু হেলে ঘোরে পৃথিবীরও সেই দশা। সুতরাং তার অক্ষের দুই মাথা অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একই দিকে নির্দেশ না করে এক ছোট বৃত্তের পথে ঘোরে—অবশ্য এই গতি এতই মন্থর যে ২৫,৮০০ বছর কেটে যায় বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে। একই রকম দুটি শঙ্কুর (cone) সরু মুখদুটি জুড়ে দিলে যা হয় পৃথিবীর অক্ষ এই দীর্ঘ কালে তাই রচনা করে। এই গতিকে বলা হয় অয়নচলন (precession)।

পৃথিবীর স্ফীত কটির খবর জানবার অনেক আগেই মানুষ এই অস্থিরতা মেপেছে। খৃষ্টপূর্ব ১৩০ সালে গ্রীসীয় জ্যোতিষী হিপার্কাস লক্ষ করেন যে প্রতি বছর যখন মহাবিষুব আসে (বসন্ত কালে যে তারিখে দিন ও রাত্রি সমান) তখন সূর্যের অবস্থান একটু করে পুবে সরে যায়। এই বার্ষিক পার্থক্যকে বলা হয় বিষুবের (equinox) অয়নচলন।

পৃথিবীর অক্ষ যে চির কাল একই দিকে নির্দেশ করে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও বহু প্রাচীন। আজ শিশুমার (Ursa Minor) তারামণ্ডলের লেজে অবস্থিত ধ্রুবতারা উত্তর মেরুর ঠিক মাথার উপরে ; কিন্তু ৫০০০ বছর আগে মিশরী পুরোহিত-জ্যোতিষীরা লক্ষ করেন প্রকৃত উত্তরে আছে আল্‌ফা

ড্রেকোনিস নামে অন্য এক তারা। বর্তমানে উত্তর মেরু ধ্রুবতারার আরও কাছে যাচ্ছে, কিন্তু ২১০০ সালে তা আবার সরে যেতে আরম্ভ করবে, এবং ১৪,০০০ সালে অভিজিৎ (Vega) হবে নতুন 'ধ্রুবতারা'। উত্তর আকাশে এই তারা সবচেয়ে উজ্জ্বল, সুতরাং পৃথিবীর সমুদ্রে তখনও যদি নাবিকদের আনাগোনা থাকে তবে এতে তাদের সুবিধাই হবে। ধ্রুবতারা তা হলে ধ্রুব নয়, বর্তমান ধ্রুবতারা আবার সেই পদে অধিষ্ঠিত হবে ২৮,০০০ সালে, অয়নচলনের আর এক চক্র সম্পূর্ণ হলে। সুতরাং এই প্রত্যাবর্তন দেখতে আকাশের গায়ে আমাদের সূক্ষ্মদর্শী পর্যবেক্ষককে অতি দীর্ঘজীবীও হতে হবে।

কিন্তু এই অয়নচলনেও খুঁত আছে। সূর্য প্রদক্ষিণের উপবৃত্ত পথে পৃথিবীর গতি যেমন সর্পিল, তেমনি এই বৃত্ত পথে তার মেরুর চলনটা মসৃণ নয়, ঢেউখেলানো। তার এই কারণ যে পৃথিবীর সম্পর্কে সূর্য ও চন্দ্রের স্থান সর্বদা পরিবর্তনশীল, সুতরাং তাদের যে সব প্রভাব অয়নচলন সৃষ্টি করে তাও স্থির নয়। বৃত্ত পথের দু পাশে পৃথিবীর এই আক্ষিক দোলনের পরিমাণ এক ডিগ্রির ৪০০ ভাগের এক ভাগ, তা সম্পূর্ণ হতে লাগে ১৮'৬ বছর। এই দোলনের নাম অক্ষবিচলন (nutation)।

এত রকম অস্থিরতার পরেও তালিকা সম্পূর্ণ হয় না। সৌর পরিবারের সন্তান হিসাবে মহাকাশে তার আর দুটি গতি আছে। প্রথমত, স্থানীয় নক্ষত্র মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য সেকেন্ডে ১২ মাইল বেগে ছুটে চলেছে (মোটামুটি হারকিউলিস তারামণ্ডলের দিকে), আমরাও সেই গতির অংশীদার। দ্বিতীয়ত, ছায়াপথ নীহারিকার চক্র গতির সঙ্গে সঙ্গে তার নাভিকে ঘিরে গ্রহ পুঞ্জকে নিয়ে সূর্যও ঘুরছে। সূর্যের এই 'বার্ষিক' প্রদক্ষিণের দ্রুতি সেকেন্ডে ১৫০ মাইল, এক চক্র শেষ হতে লাগে ২০ কোটি বছর তা আগে বলেছি, লক্ষ্য আপাত দৃষ্টিতে সিগ্‌নাস তারামণ্ডল।

এর পরেও অবশ্য বিবেচ্য প্রসারণী বিশ্বে ছায়াপথ নীহারিকার নিজের গতি। এই মহাসমুদ্রে হিসাবের খেই হারিয়ে যায়, আমরা শুধু জানি অন্যান্য বহু কোটি নীহারিকার সম্পর্কে আমাদের নীহারিকা মহাকাশে ক্ষিপ্র বেগে সরে পড়ছে—কিন্তু কোন দিকে বা কত দ্রুত তা কেউ বলতে পারে না।

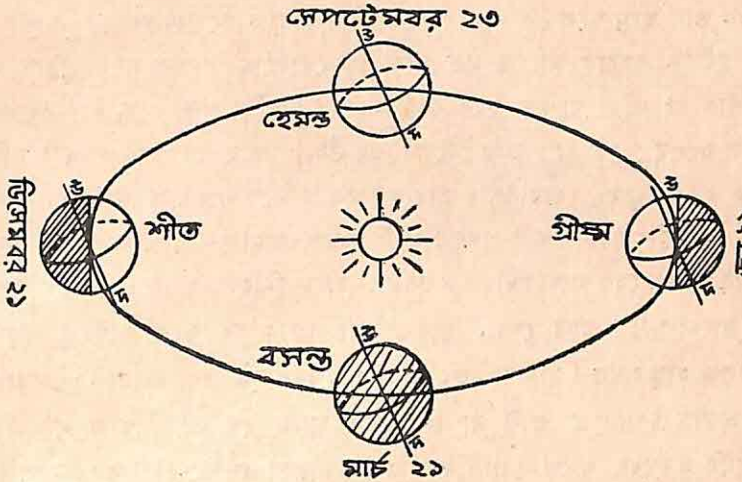
এত রকম গতির অধিকাংশ অবশ্য অন্যান্য গ্রহেরও আছে যদিও সব ছোট খাটো দোলন কাঁপনের হয়তো আমরা খোঁজ রাখি না। যাদের উপগ্রহ নেই তারা পৃথিবীর থেকে বেশী সুস্থির, যাদের বহু চাঁদ তাদের গতি সেই অনুপাতে জটিল।

আবহাওয়া সৃষ্টিতে বায়ুমণ্ডলের প্রভাব আমরা এর আগে আলোচনা করেছি, এ সম্বন্ধে পৃথিবীর দুই প্রধান গতির অংশ বোঝা দরকার। স্বাবর্তনী পৃথিবীর গায়ে এক এক জায়গায় এক এক রকম বেগ—নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ১০৫০ মাইল, নরওএ দেশের কাছে তার প্রায় অর্ধেক। তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় বাতাসে বিভিন্ন রকম টান পড়ে, নিরক্ষ বৃত্তের দিকে পুব থেকে পশ্চিমে অবিরাম হাওয়ার স্রোত বয়, যার নাম নিয়ত বায়ু (trade wind) ; এর দ্বারা জলবায়ু (climate) অনেকটা নির্ধারিত হয়।

অনেকের ধারণা ঋতু চক্র নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতির দ্বারা—সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৩১ লক্ষ মাইল বাড়ে কমে, যখন তারা কাছাকাছি তখন গ্রীষ্ম, যখন দূরে তখন শীত। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, আসলে উত্তর গোলার্ধের শীতে ও দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মে সূর্য ও পৃথিবীর সান্নিধ্য সবচেয়ে ঘন। দূরত্বের এই পার্থকের জন্য সূর্য তাপের যেটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে তা অতি সামান্য, কিন্তু সূর্য কিরণ কতখানি কোণাকুণি পড়ছে তার উপর উষ্ণতা অনেকখানি নির্ভর করে। যেহেতু পৃথিবীর অক্ষ এক পাশে ২৩'৫ ডিগ্রি হেলানো সেহেতু সূর্য কিরণের কোণ বছর কালের সঙ্গে বদলায়, সুতরাং ঋতু ভেদের প্রকৃত কারণটা পৃথিবীর এই আক্ষিক গতি।

উত্তর গোলার্ধে ২২ জুনের কাছাকাছি দিন সবচেয়ে বড় এবং ২২ ডিসেমবরের কাছাকাছি সবচেয়ে ছোট হয়, যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি (summer solstice) ও মকরক্রান্তি (winter solstice)। ঐ ভরা গ্রীষ্মের দিনে উত্তর মেরু সবচেয়ে বেশী হেলে সূর্যের দিকে, উত্তর গোলার্ধে তখন সূর্যের আলো পড়ে সবচেয়ে কম তির্যক হয়ে, মকরক্রান্তির দিনে রোদ পড়ে সবচেয়ে বেশী তেরছা হয়ে। (আসলে উষ্ণতম ও শীতলতম দিন আসে অগাসট এবং জানুআরিতে, তার কারণ পৃথিবী গরম ও ঠাণ্ডা হতে সময় নেয়।) দক্ষিণ গোলার্ধের অবস্থাটা অবশ্য সব বিষয়ে ঠিক বিপরীত।

একই পরিমাণ রশ্মি যখন মাথার উপর থেকে সোজাসুজি পড়ে তখন



১২নং চিত্র

পৃথিবীর হেলানো কক্ষ ও বার্ষিক ঋতু চক্র (উত্তর গোলার্ধ)

মাটিতে সে সবচেয়ে কম জায়গা নেয়, যত বেশী তেরছা হয়ে পড়ে তত বেশী ছড়িয়ে যায়, সুতরাং এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি কম তাপ লাভ করে। শীত কালে যে শীত তার আর একটা কারণ তির্যক রশ্মিকে অনেকখানি বেশী বায়ু স্তর পার হতে হয়, বাতাস বেশী তাপ নিয়ে নেয়, যেমন ঘটে সূর্যাস্তের আগে। বস্তুত, যে যে কারণে প্রতি দিন দুপুর থেকে বিকালে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে ঠিক সেই কারণেই ছ মাস পরে গ্রীষ্ম ও শীত আসে। বলা বাহুল্য, মেরু অঞ্চলে যে শীত সবচেয়ে প্রবল তার কারণ সেখানে সূর্যালোক সবচেয়ে তির্যক। শীত গ্রীষ্মে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য যে বদলায় তারও কারণ অবশ্য আক্ষিক নতি।

তবে ঋতু বিবর্তনে প্রদক্ষিণ গতিরও এক পরোক্ষ প্রভাব আছে এই যে সূর্যের সম্পর্কে পৃথিবীর স্থান পরিবর্তন হয় বলেই প্রতি বছর দুই বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য গ্রহেও ঋতুর কারণ আক্ষিক নতি, নতির পরিমাণ যার যার অবস্থা নির্দেশ করে।

এ বার শূন্যে আমাদের এই গ্রহের চাল চলন ছেড়ে আবার মাটিতে নেমে এসে তার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। আজ আমরা জানি যে পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল (৭১ শতাংশ),

এক ভাগ স্থল, স্থলে কোথাও পর্বত শ্রেণী, কোথাও অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। পৃথিবীকে আবার আগের মত পাঁচ ফুট গোলকে পরিণত করে যদি এক পোঁছ রং লাগানো হয় তবে সেই আবরণ যতটুকু পুরু হবে, এই গ্রহের স্থল জলের থেকে গড়ে তার চেয়েও কম উঁচু। আর আয়তনে পৃথিবী যদি হয় একটি ডিমের সমান, তবে তার সব জল মিলিয়ে হবে এক ফোঁটা।

পৃথিবীর সাগর অংশ এখনও অধিকাংশে অনাবিষ্কৃত, বৈজ্ঞানিক রহস্য ছাড়াও মানুষের প্রয়োজনীয় বহু রসদ সেখানে নিহিত আছে; মাটির নিচে লুকানো আছে প্রচুর তেল, অনেক জায়গায় সাগর তলে ছড়িয়ে আছে বিশুদ্ধ ধাতুর খণ্ড (ম্যাংগানিজ, নিকেল, কোবাল্ট এবং তামা); সমুদ্রে এত মাছ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী বা প্ল্যাংকৃটন আছে যে তার থেকে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের খাদ্যে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা মেটানো চলে। সম্প্রতি নানা দেশ সমুদ্রের গবেষণায় মন দিয়েছে, বিশেষ করে এই সম্পদ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আজ পৃথিবীর যে মানচিত্র আমাদের পরিচিত তা চির কালের নয়, যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটেছে। জারমেনির ভূবিজ্ঞানী ভেগেনার অনেক দিন আগে প্রস্তাব করেন যে বর্তমান মহাদেশগুলি একদা জোড়া ছিল, ক্রমে ভাগ হয়ে সরে গিয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ ইনি দেখিয়েছেন যে এগুলি পরস্পরের সঙ্গে বেশ ভাল খাপ খায়, যেমন দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকা। এই তত্ত্ব প্রথমে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ পাত্তা পায় নি, কিন্তু এখন তা সর্বজনস্বীকৃত। গড়নের মিল ছাড়া একদা-যুক্ত মহাদেশগুলির প্রাণীদের মধ্যেও আত্মীয় সম্পর্ক লক্ষিত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর বহিরাবরণ যে এক ও অখণ্ড এই প্রচলিত ধারণা সম্প্রতি বদলেছে, ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন তা গোটা ছয় বিশাল প্লেট দিয়ে তৈরি, মহাদেশগুলিকে পিঠে নিয়ে সেগুলি অতীব ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্লেটগুলির ঘষাঘষিতে হয়তো স্থানে স্থানে মাটি কেঁপে ওঠে, ভূমিকম্প হয়। অবশ্য বহু গবেষণা সত্ত্বেও ভূমিকম্পের কারণ এখনও অনেকটা রহস্যময়। কারও কারও সন্দেহ যে তার সঙ্গে পৃথিবীর অয়নচলনের যোগ থাকতে পারে, তবে এর কোনটার ফলে যে কোনটা হয় তাই এখনও জানা নেই, এবং অয়নচলনের কারণ খুব সুনির্দিষ্ট নয়।

এই হল জল স্থল বিন্যাসে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথা। পৃথিবী শক্ত হয়ে জমার পর থেকে আজ পর্যন্ত তার উপর অনেকগুলি ছোট বড় ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছে। স্থল তলিয়ে গিয়েছে জলের নিচে, আবার জল ফুঁড়ে পাহাড় মাথা তুলেছে; মাত্র সাত কোটি বছর আগেও এই আকাশচুম্বী হিমালয় ছিল সাগর গর্ভে। পৃথিবীর গর্ভে যেন আছে এক বন্দী দানব, কিছু কাল পর পর সে লাফালাফি আরম্ভ করে, বসুন্ধরার ত্বক জায়গায় জায়গায় ফুলে ওঠে তার দাপটে, স্থল মাথা তোলার ফলে জল গিয়ে জমে শুধু গভীর সমুদ্রে। এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ারও নানা রকম অদল বদল হয়। তার পর ব্যর্থ দানব আবার বসে বসে দম নেয়—ক্রমশ, কয়েক কোটি বছর ধরে আবার পৃথিবীর গা সমতল হয়ে আসে, বৃষ্টিতে পাহাড় ক্ষয়ে যায়, সেই পলি এসে জমে সমুদ্র গর্ভে, ঠেলে তোলে জল, তা আবার গ্রাস করে স্থল—আবহাওয়া নরম হয়ে আসে, যত দিন না জেগে ওঠে দানব। বিগত ৫০ কোটি বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত এই রকম বড় বিপ্লব পৃথিবীকে গ্রাস করেছে তিন বার—সব শেষেরটি মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে, তার আগের দুটি যথাক্রমে ২৫ ও ৫০ কোটি বছর আগে। এই তিনটি মহাবিপ্লবের মধ্যে ভূতত্ত্বজ্ঞানীরা আবার দশ এগারোটি ছোট বিপ্লবের নির্দেশ পেয়েছেন।

এই সব ভৌগোলিক ও আবহাওয়া সম্পর্কিত পরিবর্তন তাদের ছাপ রেখে গিয়েছে শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর পাথরের মধ্যেই নয়, প্রাণী কুলের অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যেও। মোটামুটি উপরোক্ত তিনটি ভৌগোলিক বিপ্লবের কালকে জীবতাত্ত্বিকরা তিনটি অধিকল্পে (era) ভাগ করেছেন—পুরাজীবীয় (palaeozoic), মধ্যজীবীয় (mesozoic), এবং নবজীবীয় (cenozoic)। আধুনিকতম নবজীবীয় অধিকল্পকে ভূতত্ত্বের ভিত্তিতে আরও সাতটি অধিযুগে (epoch) ভাগ করা হয়—পেলিওসিন থেকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্লাইস্‌টোসিন ও হলোসিন পর্যন্ত। মোটামুটি এই দুটির সঙ্গেই শুরু মানুষের প্রাগিতিহাস যাঁরা অনুশীলন করেন সেই প্রত্নবিৎদের দুই যুগ (age)—পুরাপ্রস্তর (palaeolithic) ও নবপ্রস্তর (neolithic)। পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনায় এই দুই যুগের দৈর্ঘ্য নগণ্য।

মোটামুটি বলা চলে পুরাজীবীয় অধিকল্পের স্থান উপরোক্ত তিন

ভৌগোলিক বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে, মধ্যজীবীয় ও নবজীবীয়ের স্থান দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে। পুরাজীবীয়ের আগেও দুটি অধিকল্প আছে—অজীবীয় (azoic) বা প্রত্নজীবীয় (archaeozoic), এবং আদি-জীবীয় (proterozoic)। এই দুটিতে মিলে প্রায় ৪০০ কোটি বছর। এর মধ্যে কোনও এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল প্রাণ, কারও কারও অনুমান ৩০০ কোটি বছর কি তারও আগে।

প্রাণ সৃষ্টির অলৌকিক ঘটনা কি করে যে সম্ভব হয়েছিল তা আজও জানা নেই। এই আশ্চর্য রহস্যের মুখোমুখি হয়ে কেউ কেউ ভেবেছে যে প্রাণবীজ প্রথমে এখানে এসেছে মহাকাশ থেকে, উলকাকে বাহন করে। কল্পনাপ্রবণ লোকেরা এমন কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছে যে আজ পৃথিবীবাসীরা যেমন দিক বিদিকে রকেট পাঠাচ্ছে এই রকম কোনও বাহন যোগে গ্রহান্তর থেকে জীবাণু প্রথম পৌঁছে থাকতে পারে পৃথিবীতে। আমাদের খোঁজের ফলে যদি কোনও দিন অন্যত্র এমন প্রাণ বস্তুর সন্ধান মেলে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তবে এ সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে হবে। এখন পর্যন্ত মনে হয় প্রাণের উন্মেষ এই পৃথিবীতেই—সেই যেখানে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল আদিম অগভীর সাগরের উষ্ণ নোনা জলে।

জীববিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন যে নিউক্লিইক অ্যাসিড নামক এক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেই প্রাণের চাবিকাঠি, কারণ এর এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে নিজেকে বহুগুণিত করবার বা বাড়িয়ে চলবার—যা প্রাণী মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এই নিউক্লিইক অ্যাসিড আছে সব প্রাণীর প্রতি দেহকোষের কেন্দ্রে, সেখানে যে বংশকণা (gene) প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতির অনেক কিছু নির্ধারিত করে নিউক্লিইক অ্যাসিড তারই উপাদান।

প্রাণের আর একটি আবশ্যিক বস্তু প্রোটিন। প্রোটিনের অনেক রূপ, দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করে—কোথাও তারা দেহ গঠনের উপাদান, কোথাও এন্‌জাইম রূপে সাহায্য করছে প্রাণ ধারণের জন্য যে নানাবিধ পদার্থের প্রয়োজন তা বানাতে। প্রোটিনের দীর্ঘ অণু ক্ষুদ্রতর বস্তু অ্যামিনো অ্যাসিড গেঁথে গেঁথে তৈরি হয়, এই রকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে কুড়িটা। সুতরাং বিভিন্ন রূপে তাদের সাজিয়ে

প্রকৃতি বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রোটিন সৃষ্টি করতে পারে।

প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিডের প্রধান উপাদান চারটি মৌলিক পদার্থ কারবন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন যা তরুণ পৃথিবীর গ্যাসগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, জলে ছিল বিবিধ লবণ। আর ছিল আকাশের বিদ্যুৎ, বিকিরণ ও অতিবেগনি রশ্মি, ছিল আগ্নেয় গিরির উত্তাপ। পরীক্ষাগারে প্রমাণ হয়েছে যে এদের প্রভাবে জল বাষ্প, আঙ্গারিক গ্যাস, অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি সরল পদার্থের থেকে জটিলতর বস্তু যেমন নিউক্লিইক অ্যাসিডের অংশ ও অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি সম্ভব। প্রকৃতির বৃহত্তর কর্মশালায় একদা আদিম বন্ধ্যা পৃথিবীর অগভীর উষ্ণ সাগর জলে এরা মিশল, হয়তো স্থলের কাছাকাছি আলো বাতাসের সান্নিধ্যে, এই উপযুক্ত পরিমণ্ডলে জুড়ে জুড়ে বানাল আরও জটিল প্রোটিন ও নিউক্লিইক অ্যাসিড। এই ভাবে হয়তো প্রাণের প্রাথমিক ইশারা রূপে মুক্ত বংশকণা দেখা দিয়েছে, তা নিজেকে বহুগুণিত করেছে। ক্রমে দেখা দিয়েছে আরও জটিল, কোষযুক্ত প্রাণী—প্রথমে এককোষ, পরে বহুকোষ।

প্রাথমিক জীবাণু জাতীয় প্রাণীর সূক্ষ্ম দেহ অণুবীক্ষণে ছাড়া দেখা যায় না। এই কোমল, অস্থিহীন দেহের অবশিষ্ট খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তাই প্রাণ আবির্ভাবের তারিখটা সঠিক জানা নেই। ১৯৬৫ সালে নাকি ক্যানাডার মেরু অঞ্চলে আধ ইঞ্চি বড় ঝিনুকের মত প্রাণীর ফসিল পাওয়া গিয়েছে যার বয়স ৭২ কোটি বছর, কিন্তু প্রাণ সৃষ্টি যে তার অনেক আগে তার নির্দেশ পাওয়া যায় ফসিল আবিষ্কারের নানা সাম্প্রতিক দাবি থেকে; যথা, দক্ষিণ আফ্রিকার পাথরে ব্যাকটিরিয়া জীবাণু —বয়স ৩১০ কোটি বছরের বেশী, এবং দক্ষিণ রোডিসিয়ায় ৩১০ কোটি বছর প্রাচীন জীবাণুর ফসিল। এগুলি সনাক্ত হয়েছে আধুনিকতম জোরালো অণুবীক্ষণে, এই আবিষ্কর্তাদের অন্যতম মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়াম শপ ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৭২ সালে আরও এক রকম প্রমাণ দাখিল করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার থেকেই। এঁরা পাথরের স্তরে মেপেছেন কারবনের দুই আইসোটোপ যাদের আণবিক ভার ১২ এবং ১৩। যে সব স্তর ৩৩০ কোটি বছরের মধ্যে গড়েছে তাতে কারবন-১২ অপেক্ষাকৃত বেশী এবং পরবর্তী কালে যে সব জায়গায় উদ্ভিদের স্পষ্ট চিহ্ন আছে অনুপাতটা তারই সমান। কিন্তু

প্রাচীনতর স্তরে হঠাৎ কারবন-১২ কমে যায়। এখন এর কারণটা বোঝা দরকার।

জল আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে আলোর সাহায্যে উদ্ভিদরা অক্সিজেন ও চিনি জাতীয় বস্তু বানায় যার থেকে তাদের পুষ্টি; এই প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিন্থেসিস। জানা আছে আঙ্গারিক গ্যাসের অংশ যে কারবন তার লঘু আইসোটোপটার দিকে তাদের ঝোঁক, তাই তাদের দেহে এর অনুপাত বেশী এবং ক্ষয়ের পরে পৃথিবীর গায়ে তারা এই অনুপাত বাড়িয়েছে। ক্ষুদ্র সামুদ্রিক উদ্ভিদের দেহ প্রথমে নিচে কাদায় জমেছে, পরে পাথরের অংশ হয়ে গিয়েছে; প্রথম অক্সিজেন-সৃজনী প্রাণী সম্ভবত সামুদ্রিক শেওলা। উপরোক্ত আবিষ্কারের ইঙ্গিত এই যে প্রায় ৩৩০ কোটি বছর আগে ফটো-সিন্থেসিস শুরু হয়। তার আগেও আদিম জীবাণু ছিল, সুতরাং প্রাণ সৃষ্টি ঐ তারিখের বেশ কিছু আগে।

প্রাচীন বস্তুর তারিখ নির্ণয়ের আধুনিক পদ্ধতি হল তার অন্তর্ভুক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্বাভাবিক ক্ষয় মাপা। পাথরের বয়স জানতে সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা রুবিডিয়াম-৮৭, আয়োডিন-১২৯ ইত্যাদি আইসোটোপের ক্ষয় মেপেছেন, এর আগে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ ব্যবহার হয়েছে। আপাতত প্রাচীনতম পাথর যা জানা আছে তার বয়স ৩৯৬-৩৬২ কোটি বছর (গ্রীনল্যান্ডে), তার পর ৩৬০ কোটি বছর (ট্যানজানিয়াতে), প্রাচীনতর-গুলি সম্ভবত প্রাকৃতিক প্রভাবে ক্ষয়ে গিয়েছে। সীসার তেজস্ক্রিয় আইসো-টোপের ক্ষয় মেপে পৃথিবীর বয়স দাঁড়িয়েছে ৪৫৬ কোটি বছর, কম বেশী তিন কোটি বছর। এই পদ্ধতি চাঁদের গবেষণায়ও কাজে লেগেছে। অপেক্ষাকৃত অল্পপ্রাচীন জিনিসের, যেমন ফসিলের, পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় কারবন মাপা হয়। এই পদার্থগুলি কি হারে ক্ষয়ে যাচ্ছে তা জানা আছে, সুতরাং কতটা বাকি আছে তা দেখে বয়স জানা যায়।

প্রাক্‌পুরাজীবীয় প্রাণীদের ধারাবাহিক ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা নেই, কিন্তু এই অধিকল্পের শুরু অর্থাৎ মোটামুটি ৬০ কোটি বছর থেকে ফসিলের সাক্ষ্য অনেক পরিষ্কার। সেই সময় থেকে প্রায় ৩৫ কোটি বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে নানাবিধ জলজ উদ্ভিদ, মেরুদণ্ডহীন জন্তু এবং অবশেষে মেরুদণ্ডী মাছের প্রভুত্ব। তার পর স্থলে দেখা দিল উদ্ভিদ, উভচর জন্তু,

ক্ষুদ্র সরীসৃপ থেকে আরম্ভ করে বিশাল ভয়ংকর ডাইনোসর, পাখি, স্তন্যপায়ী জীব এবং এদের চরম পরিণতি মানুষ মাত্র দশ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু এই রোমাঞ্চকর ইতিহাস বর্ণনার জায়গা এখানে নয়, বিভিন্ন প্রাণীর সম্বন্ধে মানুষের স্থান কোথায়, কি করে পাশবিক আদি মানবের থেকে সভ্য মানুষ বিবর্তিত হল সেই কাহিনী আছে এই লেখকেরই 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' বইতে। তবে ভগ্নাংশ হিসাব করে বলা যায় পৃথিবীর ইতিহাসের এক অষ্টমাংশ অধিকার করে আছে প্রাচীনতম প্রাণী ফসিলে যার সাক্ষ্য আছে, মেরুদণ্ডী প্রাণী অধিকার করে ১২ ভাগের এক ভাগ, স্তন্যপায়ীরা হয়তো ২৫ ভাগের এক ভাগ, মানুষ পাঁচ থেকে আড়াই হাজারের এক ভাগ, আর মানুষের সভ্যতা ন লক্ষ ভাগের এক ভাগ! এক ইংরেজ ভূতাত্ত্বিক বলেছেন শুরু থেকে পৃথিবীর ইতিহাস যদি ৫০০০ পৃষ্ঠার এক বইতে লেখা হয় তবে সুসংলগ্ন কাহিনী পাওয়া যাবে মাত্র শেষ ৫০০ পৃষ্ঠায় এবং মানুষের কথা উঠবে একেবারে শেষ দু পৃষ্ঠায়।

মানুষের এই বিবর্তন ঘটেছে চারটি তুষার যুগের মধ্য দিয়ে। প্রথমটির শুরু প্লাইস্টোসিন অধিযুগের গোড়ার দিকে, দশ থেকে ছ লক্ষ বছর আগে, শেষ ৫৬০,০০০ বছর আগে; তার পর আরও তিন বার উত্তরী হিম নেমে এসে দক্ষিণে তাড়িয়ে নিয়েছে বন বনানী পশু পাখি, তিন বার আবার সরে গিয়েছে উত্তরে। বর্তমানে চতুর্থ তুষার যুগ থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণতর হয়ে উঠছে। বরফের এই ওঠা নামার কারণ খুব স্পষ্ট নয়, পৃথিবীর জলে স্থলে যে বৈপ্লবিক উত্থান পতন ঘটেছে কয়েক কোটি বছর পরে পরে তারই মত এর হেতুও রহস্যে আবৃত।

অতীত ও বর্তমানের কথা শেষ হল, এখন প্রশ্ন ভবিষ্যতের। পৃথিবীর অদৃষ্ট অবশ্য চন্দ্র সূর্যের পরিণতির সঙ্গে জড়িত, প্রথম ও ক্ষুদ্রতর বিপদটা আসবে চাঁদের থেকে। পৃথিবীর স্থল, জল ও বাতাসে তার যে জোয়ারী টান তার ফলে আমাদের এই গ্রহের পাক ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে, বর্তমানে এক পাক ঘুরতে প্রতি দিন তার সেকেন্ডের ২৫০০ কোটি ভাগের এক ভাগ বেশী লাগে। এই সামান্য অতিরিক্ত সময়টুকু জুড়ে জুড়ে ৫০০ কোটি বছরে পৃথিবীর দিন হয়ে পড়বে প্রায় দেড় গুণ বড়। মানুষ এবং তার শস্যাদির

হয়তো একাদিক্রমে ১৮ ঘণ্টার সূর্য তাপ এবং অনুরূপ দীর্ঘ শীতল রাত্রি সয়ে যাবে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ঝড় বাত্যা সৃষ্টি হয়ে এর ফল হবে সাংঘাতিক।

পৃথিবীর পাক ধীর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রভাব দেখা দেবে। যে স্বাবর্তনী পাক সে হারাচ্ছে তা চাঁদ আত্মসাৎ করবে মহাকর্ষীয় সংযোগের মাধ্যমে, এবং তার ফলে পৃথিবীকে ঘিরে তার কক্ষ পথের পরিধি বাড়বে, চাঁদ ক্রমশ পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাবে, দেখাবে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। বর্তমানে প্রতি ৩০ বছরে প্রায় এক ফুট করে সে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এই অপসরণের মাত্রা কমবে সূর্যের প্রতিযোগিতায়। আমাদের বায়ুমণ্ডল যে পর পর ঠাণ্ডা গরম হয় সূর্যালোকের অভাবে ও প্রভাবে, তার দ্বারা পৃথিবীর পাক আরও দ্রুত হয়। অপসৃয়মান চাঁদের টান যখন পৃথিবীতে দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তার আবর্তনী বেগের উপর সূর্যের দ্রুতঘূর্ণি প্রভাব চাঁদের বিপরীত প্রভাবকে হার মানাবে। বেশী জোরে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী আবার চাঁদকে কাছে টেনে নেবে। সম্ভবত তা ঘটবে ৫০০ কোটি বছরে, যখন চাঁদ থাকবে প্রায় আজকের দেড় গুণ দূরে।

আমরা জানি এই সন্ধি ক্ষণে আকাশে আর একটি বড় প্রভাব দেখা দেবে যার সঙ্গে সমগ্র সৌর লোকের অদৃষ্ট বাঁধা। সূর্যের বর্তমান তেজের শুরু প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে, তার শেষও হবে প্রায় সমকাল পরে। মরণের আগে নির্বাপিতপ্রায় দীপের মত তখন তার যে তেজ বৃদ্ধি শুরু হবে তা চাঁদকে আরও দ্রুত টেনে আনবে পৃথিবীর কাছে এবং পৃথিবীর আবর্তনে এমন আকস্মিক ও গুরুতর পরিবর্তন আনবে যে তার তুলনায় চাঁদের পরিণতি হবে তুচ্ছ।

আমরা আগে দেখেছি তারার আদি হাইড্রোজেনের দশ থেকে ১৫ শতাংশ যখন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় তখন তা তার গর্ভে এক উষ্ণতর অবপারমাণবিক প্রক্রিয়ার সূচনা করে, তারকা তখন ক্রমবর্ধিষ্ণু মাত্রায় শক্তি ছড়াতে ছড়াতে ফুলে তেতে লাল হয়ে ওঠে। আজ থেকে ৫০০-৬০০ কোটি বছরের মধ্যে সূর্যেরও সেই দশা হয়ে স্ফীত দেহ প্রায় নিকটতম গ্রহ বুধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তেজের উচ্চতর শিখরে এই দানব সূর্য পৃথিবীর দুই দিগন্তের মধ্যে ১২ ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে থাকবে, এবং তার বিচ্ছুরিত তেজের বন্যা এই গ্রহের তাপ তুলে দেবে ৫০০ ডিগ্রিরও বেশ

ঊর্ধ্বে, যার অনেক আগেই টিন, সীসা ও দস্তা গলে যায়। তখন ফুটন্ত মহাসাগর থেকে বাষ্পের মেঘ উঠে সমস্ত গ্রহকে আবৃত করবে, গন্ধকও ফুটবে পৃথিবীর গায়ে।

সূর্য তার জীবনের মারাত্মক চরম মুহূর্ত পেরিয়ে আবার যখন ক্রমশ সংকুচিত হবে তখন আকাশ থেকে পৃথিবীর জল ফিরে এসে বন্যা বইয়ে দেবে। কয়েক হাজার লক্ষ বছর ধরে সূর্য তার শেষ পরমাণুকেন্দ্রিক ইন্ধন ধাতু পদার্থে পরিণত করতে করতে নীল হয়ে জ্বলবে। এই মরণ দশায় সে পরস্পর কয়েকটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাবে যে সময়ে তার বাইরের স্তর বিস্ফারিত হয়ে জ্বলন্ত গর্ভ উন্মুক্ত করবে, ফলে পৃথিবীর উপর ঝরবে প্রভূত পরিমাণ মারাত্মক রঞ্জন রশ্মি ও গামা রশ্মি। অবশেষে শেষ অবপার-মাণবিক শক্তি ক্ষয় করে সে চির কালের মত স্থবিরত্ব লাভ করলে পৃথিবীর জল জমে গিয়ে চিরস্থায়ী তুষার আবরণ ঢাকবে আজকের এই শস্যশ্যামলা বসুন্ধরাকে।

আরও জুড়িয়ে যেতে যেতে দেউলে সূর্য নিজেরই ভারে সংকুচিত হবে, তবু দীর্ঘ কাল জ্বলবে তার দুর্বল জ্যোতি। সূর্যের এই দৈহিক ক্ষীণতা কিন্তু বস্তুর ক্ষতির নির্দেশক নয়, তা ঘটবে বস্তুর অধিকতর ঘনতার ফলে; সুতরাং পৃথিবীর কক্ষের কোনও পরিবর্তন হবে না। সমস্ত আয়ু কালে সূর্য তার বস্তুর মাত্র এক সহস্রাংশ রূপান্তপিত করবে শক্তিতে এবং তার থেকে যে সামান্য ভর ক্ষয় হবে তাতে মহাকর্ষীয় বাঁধন বিশেষ কিছু ঢিলে হবে না। এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে শেষ পর্যন্ত, আরও পরে যখন ৬০০০ কোটি বর্ষ দীর্ঘ আয়ু কাটিয়ে আমাদের এই জ্যোতিষ্মান দিবাকর তার অন্তিম দশায় শেষ প্রভাটুকু হারিয়ে অন্ধের মত মহাকাশের পথে ছুটে চলবে তখনও। সম্পূর্ণ কালো তার শবটি আয়তনে হবে পৃথিবীরও ছোট, তবু হিমানীমণ্ডিত বন্ধ্যা ধরিত্রী তার বশে থাকবে আজকের মতই!

কিন্তু মানুষের ভাগ্যে কি আছে? অতি বড় আশাবাদী ছাড়া কেউ সন্দেহ করবে না যে এর অনেক আগেই সে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবে, এমন কি সূর্যের দানবীয় স্ফীতি বা চাঁদের আঁধার মৃত্যু পর্যন্তও সে টিঁকে থাকবে না। যে সব প্রাণী ইতিমধ্যেই পৃথিবীর পালা শেষ করেছে তাদের

ফসিলের দলিল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে প্রজাতির (species) আয়ু গড়ে দশ লক্ষ বছর ; ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্য যে দানবীয় আকার ধারণ করতে আরম্ভ করবে তার তুলনায় এই পরিমাণ কাল মুহূর্ত মাত্র। নৃতাত্ত্বিকরা বলেন মানুষের বর্তমান প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্স পৃথিবীতে এসেছে প্রায় দু লক্ষ বছর আগে এবং তার মধ্যে এ যুগের খাঁটি মানুষের বয়স বড় জোর হাজার পঞ্চাশেক বছর।

কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মানদণ্ডে মানুষের প্রজাতিগত আয়ু মাপা ভুল হবে, কারণ ক্রমবিকাশের দীর্ঘ মিছিলের শেষে মানুষের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যা তার সম্পূর্ণ স্বকীয়। অসাধারণ মনন শক্তির ফলে এক মাত্র এই প্রাণীটিই নিজের ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ যুক্তিপূর্ণ চিন্তার অধিকারী। এই কারণেই দার্শনিকরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার মধ্যে মানুষের ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায়, বিজ্ঞানী সব কিছুর অর্থ খোঁজে—এই কারণেই প্রগতির পথে মানুষ আজ এত দূর এগিয়েছে। যে বিচিত্র বিশ্ব আমরা বর্ণনা করেছি দেহে ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর মানুষই তার জটিল রহস্য অনেকখানি উদ্‌ঘাটন করেছে, সে পৃথিবীতে না এলে এই জ্ঞানও সৃষ্টি হত না।

চতুর্থ তুষার যুগের কৃচ্ছ্র সহ্য করেও আমাদের পূর্বপুরুষরা টিঁকে থেকেছে আগুন জ্বেলে, পশু চর্ম দিয়ে গা ঢেকে। আজ শীত নিবারণের আরও অনেক কার্যকরী উপায় সে আবিষ্কার করেছে। তেমনি প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করেছে, প্রতিবেশ বানিয়ে নিচ্ছে নিজের মত করে। সুতরাং যে কারণে অন্যান্য প্রাণী ইতিপূর্বে পৃথিবীর থেকে বিদায় নিয়েছে তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়, তারা খামখেয়ালী পরিবর্তনী প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি, মানুষ নিজের সুবিধা মত প্রকৃতিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। সুতরাং সভ্য মানুষের ক্রমবিবর্তন আর চিরাগত নিয়মে নির্ধারিত হবে না—বলা যেতে পারে তা নির্ধারণ করবে সে নিজে, তা হবে কৃত্রিম।

কিন্তু এই একান্ত মানবিক ধর্ম যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশক্তির একটা ক্ষতির দিকও আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন জন্মগত রোগ দোষ টিঁকে থাকছে, বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরিত হচ্ছে। মানুষের যেমন

আয়ু বৃদ্ধি হল, স্ত্রীলোকেরও সন্তান জন্ম দেবার সময় বাড়ল। এ ছাড়া প্রধানত জ্যামিতিক বৃদ্ধি ধারার অমোঘ নিয়মে জনস্ফীতির সংকট ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। খৃষ্টাব্দ এক সালের পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হয়েছে ১৬০০ সালে, কিন্তু তার পর তা হয়েছে ১৮০০, ১৯০০ এবং ১৯৬০ সালে। বর্তমানে ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা ৩৯০ কোটি (ভারতে প্রায় ৬০ কোটি), এই শতাব্দির শেষে ধরণী দ্বিগুণ লোকের ভার বহন করবে। এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন আর ৬৭৫ বছরে পৃথিবীর জল স্থল সমান ভাবে ভাগ করে দিলে দু জন লোককে জায়গা দিতে হবে প্রতি বর্গ মিটারে। এখন থেকে ৯০০ বছরে বর্তমানের দুই কোটি গুণ লোক বাড়বে।

বলা বাহুল্য, এই অসম্ভব অবস্থার আগেই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। স্থানসংকোচের আগে খাদ্যসংকোচ দলে দলে লোক মারবে। এখন বিশ্বে দিনে দু লক্ষ লোক বাড়ে, তার জন্য বছরে তিন কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্য দরকার (অর্থাৎ অন্তত আড়াই শতাংশ বেশী)। এ দিকে বারিপাত কমার ফলে সাহারা মরু দক্ষিণে নামছে, তাই গত কয়েক বছরে আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই খরা প্রকৃতির সাময়িক খেয়াল না হয়ে জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। ভারতও এই অল্প-বৃষ্টি অঞ্চলের অন্তর্গত।

এমন কথা শোনা যায় যে মানুষ ভিন্ন গ্রহে গিয়ে উপনিবেশ বানাবে, তাতে জনস্ফীতির সমস্যা মিটবে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বৈজ্ঞানিক দুরূহতার প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও এক মার্কিন বিজ্ঞানীর হিসাবে বর্তমান জনসংখ্যা বজায় রাখতে ঘণ্টায় সাত সহস্রাধিক লোক পৃথিবীর বাইরে পাঠাতে হবে এবং তাতে খরচ পড়বে দৈনিক প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকা।

ক্রমেই বেশী লোকের প্রয়োজন মেটাতে প্রাকৃতিক সম্পদও দ্রুত খরচ হয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু কল কারখানা, মোটর গাড়ি, এমন কি মানুষের ঘরে এদের ব্যবহারের থেকে যে ভাবে হাওয়া জল মাটি দূষিত হচ্ছে তা প্রায় সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিণামদর্শী। প্রায় সব দেশে শহরাঞ্চলে লোকে নিশ্বাসের সঙ্গে অল্প বিস্তর বিষ টেনে নিচ্ছে, তাতে নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পারমাণবিক অস্ত্র বানিয়ে মানুষ নিজের সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে,

পারিপার্শ্বিক কলুষের পরিণতিও তাই দাঁড়াতে পারে।

যন্ত্র সভ্যতা এই গ্রহের এক প্রাকৃতিক বিপদও ডেকে আনতে পারে। কল কারখানার থেকে ১০০ বছরে ৩৬,০০০ কোটি টন আঙ্গারিক গ্যাস বাতাসে জমেছে এবং প্রায় ঐ পরিমাণ এসেছে বন কেটে চাষের জমি সৃষ্টির ফলে। এর থেকে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ ১৩ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। শুক্র গ্রহের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে আঙ্গারিক গ্যাস কম্বলের মত তাপ আটকায়, সুতরাং এরই মধ্যে পৃথিবীর তাপ সম্ভবত আধ ডিগ্রির বেশী বেড়ে গিয়েছে। ২০০০ সালে কারখানাজাত গ্যাস এই তাপ বাড়িয়ে দিতে পারে দু ডিগ্রি, ৩০০০ সালে সাত ডিগ্রি। সেই সময়ে খুব সম্ভবত তুষার যুগও শেষ হবে এবং পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে জমা বরফ গলে যে বন্যার সৃষ্টি হবে তা ভীষণ আকার ধারণ করতে পারে।

তা ছাড়া, এর পরে আরও তুষার যুগ আসবে হয়তো, এবং তার শীত কত প্রবল হবে তা কেউ বলতে পারে না। যন্ত্র সভ্যতার উন্নত শিখরে উঠেও মানুষ তখন নির্দয় প্রকৃতির কাছে হার মানতে পারে।

নিজের খুনী ও প্রজননী প্রবৃত্তি জয় করেও, এবং অন্যান্য ভাবিত ও অভাবিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও মানুষ যদি এগিয়ে যায় তবু চন্দ্র সূর্যের পরিবর্তনী প্রভাব যখন কাজ করতে শুরু করবে সেই অতি দূর দূরধিগম্য ভবিষ্যতে সে কি করে টিঁকতে পারে? অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস এই অসামান্য সংকট সে জয় করতে পারে না, তবু যারা আশাবাদী যারা মানুষের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাদের চোখ দিয়ে আমরা প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে পারি, দুঃসম্ভব উদ্বর্তন কল্পনা করতে পারি।

পৃথিবীর পাক প্রথমে মন্থর পরে দ্রুত হয়ে যে সব পরিবর্তন আনবে তার তুলনায় ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের তেজ বৃদ্ধি অনেক বৃহত্তর ব্যাপার। দানব রূপ ধারণ করতে করতে সে যে তাপ ও মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ করবে হয়তো মানুষের বুদ্ধি তার বিরুদ্ধে কোনও বর্ম আবিষ্কার করবে। ভাবা যায় যে বৃহৎ-মস্তিষ্ক: ক্ষুদ্রাঙ্গ এক প্রকার মানুষ পৃথিবীর সারা গা ঢেকে দেবে তাপসহ আয়না দিয়ে যাতে অধিকাংশ সূর্য তেজ প্রতিফলিত হয়ে শূন্যে ফিরে যায়, তার পর মাটির নিচে গিয়ে আশ্রয় নেবে যথাসম্ভব বাতাস ও

জল সঙ্গে নিয়ে। যুগ যুগ পরে সূর্য যখন মরণের পথে পা বাড়িয়ে জুড়াতে শুরু করবে তখন মানুষ হয়তো তার কৃত্রিম গুহা থেকে আবার উঠে আসবে উপরে, প্রস্তুত হবে আসন্ন রাত্রি ও অনন্ত শীতের অপেক্ষায়। যদি বর্তমান পৃথিবীর অর্ধেক জলও সে তখন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে তবে তার থেকে যথেষ্ট হাইড্রোজেন ইন্ধন পাওয়া যাবে। পূর্বের ১০০০ কোটি বছরে পৃথিবী সূর্যের থেকে যে পরিমাণ শক্তি পেয়েছে; এই ইন্ধন থেকে পারমাণবিক চুলায় মানুষ ততখানি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। আজ অধিকাংশ সৌর শক্তি আমরা নষ্ট করি, সে কালের হিসাবী মানুষ হয়তো তার সঞ্চয় ব্যয় করবে দশ লক্ষ কোটি বছর ধরে, অর্থাৎ সে যাবৎ পৃথিবীর যা বয়স তার ১০০০ গুণ কাল ধরে।

কিন্তু সেই ক্ষণেও হয়তো শক্তির রসদ ফুরিয়ে যাবে না। বৃহস্পতি গ্রহে পৃথিবীর প্রায় ১০০০ গুণ হাইড্রোজেন আছে, মানুষ যদি সেখানে পারমাণবিক চুলা বানাতে সক্ষম হয় তবে প্রায় সবটা শক্তিই শূন্য পথে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই উদ্যমে যে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও শিল্প-কুশলতা দরকার হবে আজ তার ভাবনাও ধৃষ্টতা মনে হয়—যে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগে তার চোখে হয়তো এটা পরিকল্পনা নয়, কল্পনা। কিন্তু এরই মধ্যে মানুষ তো কত 'অসম্ভব'কেই সম্ভব করেছে!

তেমনি দানব সূর্যের তাপে পুড়ে মরবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ার আগেই মানুষ অথবা তার বীজ হয়তো অন্য কোনও শীতলতর গ্রহে আশ্রয় নেবে। এই আশ্রয় সৌর লোকের ভিতরে না হয়ে বাইরে এমন কোনও তারার পরিবারেও হতে পারে যার লাল দানব দশা আসতে অনেক দেরী। তারার বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের কাছাকাছি অনেক ক্ষীণ, শীতল M জাতীয় তারার আয়ু সূর্যের ১০,০০০ কোটি বছর বেশী হতে পারে, হয়তো ভাবী মানুষ এমনি কোনও তারার গ্রহে দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশের পূর্ণ ফল উপভোগ করবে, সংস্কৃতির চরম শিখরে উঠবে।

কিন্তু এই ছায়াপথ ছেড়ে কোথাও সে ঘাঁটি বানাতে পারবে বলে মনে হয় না। আলোর রশ্মিতে চড়ে যদি পাড়ি দেওয়া সম্ভব হত তা হলেও কাছাকাছি অ্যান্ড্রমিডা নীহারিকায় পৌঁছাতে কেটে যাবে ২০ লক্ষ বছর।

সুতরাং যে দিন ছায়াপথের ক্ষুদ্রতম তারার দীপ নিভবে সে দিন হয়তো এই প্রাণেরও সমাপ্তি হবে। কিন্তু মানুষ-অনুসৃত প্রাণের উপর এইখানে যবনিকা পড়লেও কিছুটা সান্ত্বনা হয়তো আমরা পেতে পারি এই ভেবে যে মহাকাশের মহাসাগরে ছায়াপথ এক ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র, অন্যান্য নীহারিকায় ভিন্নরূপী প্রাণের তখন হয়তো সবে শৈশব বা যৌবন। আরও বহু কল্প পরে প্রাণ যদি সর্বত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেখানেই এই মহাকাহিনীর শেষ কিনা কে বলতে পারে? একদা হয়তো সংকোচনী ব্রহ্মাণ্ড আবার অতিঘন আদি পরমাণুতে পরিণত হবে, তার বিস্ফোরণ থেকে নতুন বিশ্ব জন্ম নেবে—সাড়া দেবে প্রাণ, বুদ্ধি, দেখা দেবে নতুন মানুষ; এমনি করে চলবে জ্বলা নেভার অনন্ত পালা, প্রাণ হয়তো কোনও দিনই শেষ হবে না।…

১০। গ্রহান্তরের মানুষ

অন্য জগতে মানুষ আছে কিনা এই প্রশ্ন আজ সবার মনে। কিন্তু বিষয়টা নতুন নয়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দে রোমক কবি লুক্রেশিয়াস লিখেছিলেন, "আমরা মানতে বাধ্য যে অন্যান্য অঞ্চলে অন্যান্য পৃথিবী আছে, এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ ও পশুও আছে।" কোপার্নিকাসের শিষ্য সন্ন্যাসী জোর্ডানো ব্রুনো বললেন অসংখ্য পৃথিবী অসংখ্য সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে এবং এই সব জগতে প্রাণীও আছে। মধ্য যুগের ইয়োরোপে এই ধরনের ধর্মবিরোধী বিশ্বাসের ক্ষমা ছিল না, তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়।

আজ অনেকের বিশ্বাস দূর জগতের বুদ্ধিমান প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে, এখনও আসছে—কয়েক বছর আগে প্রায়ই গুজব শোনা যেত এদের বাহন উড়ন্ত চাকি বা উফো (UFO) দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এ সব খবর এত বেড়ে যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে এ নিয়ে এক বৈজ্ঞানিক তদন্ত হয়, কিন্তু দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা মেলে কোনও রকম প্রাকৃতিক ঘটনায় এবং কয়েকটি বিবরণ অমীমাংসিত হলেও তাদের সঙ্গে অপার্থিব জীবের সম্পর্ক নেই। অবশ্য গ্রহান্তরের আগন্তুক এ যাবৎ প্রমাণসাপেক্ষ থাকলেও বিজ্ঞানীরা অনেকেই দূর জগতে শুধু হীন প্রাণী নয় বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। শুক্র, মঙ্গল, গ্রহাণু ও বৃহস্পতি সম্বন্ধে আধুনিক তথ্য বিবেচনা করে তাঁরা যে সব জল্পনা করেছেন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এই সব গ্রহ এখন প্রাণশূন্য হলেও হয়তো অতীতে প্রাণের সাড়া পেয়েছে, বর্তমান কর্মসূচী অনুসারে ভবিষ্যতে রকেট যান (বা মানুষ) তার চিহ্ন খুঁজবে। বস্তুত বহির্জীববিদ্যা নামে এক নতুন বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সৌর জগতে কোনও রকম বুদ্ধিমান প্রাণীর সম্ভাবনা খুবই কম।

মহাকাশ পাড়ি সম্ভব হওয়াতে বহির্জগতে প্রাণ সম্বন্ধে এত কৌতূহল জেগেছে, কিন্তু বিজ্ঞানীর উৎসাহের বড় কারণ গ্রহ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন

ধারণার বর্জন। দূরচারী তারাদের মধ্যে সংঘর্ষ অতি বিরল ও আকস্মিক ঘটনা হতে বাধ্য, কিন্তু তারা সৃষ্টির সময়ে যদি একই আদি বস্তু জমে গ্রহ হয় তবে সাধারণ তারার গ্রহ না থাকাই অস্বাভাবিক। এবং গ্রহ যত বেশী তত বেশী প্রাণের সম্ভাবনা। ছায়াপথ নীহারিকায় ১০,০০০ কোটি তারা, এই রকম আরও ১০,০০০ কোটি নীহারিকা ছড়িয়ে আছে বিশ্বের জানা অংশটুকুর মধ্যেই। জ্যোতিষীদের সাধারণ হিসাব অনুসারে ছায়াপথেই অন্তত ৫০০০ কোটি গ্রহ আছে, এবং বছর কুড়ি আগে হার্লো শাপলি অনুমান করেছিলেন এই নীহারিকায় অন্তত দশ কোটি তারার উন্নত শ্রেণীর প্রাণের উপযুক্ত গ্রহ থাকতে পারে। আর এক বৈজ্ঞানিক লেখকের মতে সংখ্যাটা ৬০ কোটির কাছাকাছি, তার মধ্যে পঞ্চাশটি আছে আমাদের ১০০ আলোকবর্ষের মধ্যে। ১৯৭১ সালে সোভিয়েট আরমেনিয়ায় বিশ্বের জ্যোতিষীরা এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত হল যে ছায়াপথে এখন এক থেকে দশ লক্ষ উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতা আছে।

এই ধরনের হিসাব খুব সুনিশ্চিত হতে পারে না, তবে তা সম্পূর্ণ আন্দাজী নয়। প্রাণ থাকতে হলে যে অবস্থাগুলির যোগাযোগ দরকার তা অনুমান করা চলে। অধিকাংশ তারাকে ঘিরে কাছে বা দূরে এমন একটি মণ্ডল আছে যেখানে বিভিন্ন অবস্থার সংযোগ প্রাণের উপযোগী হতে পারে; অর্থাৎ সেই অঞ্চলের গ্রহে জল তরল অবস্থায় থাকা সম্ভব, গ্যাসের আবহ ধরে রাখা সম্ভব, তারার থেকে যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া সম্ভব, ইত্যাদি। গ্রহ খুব ছোট হলে তার সব আবহ উবে যাবে, আমাদের চাঁদের যা দশা; তারা খুব ছোট হলে প্রাণোপযোগী মণ্ডলটাও হবে সংকীর্ণ, আবার বড় হলে এত তাড়াতাড়ি সে তেজী লাল দানব রূপ ধারণ করবে যে গ্রহে প্রাণের অভিব্যক্তি শুরু হতে যে সময়টা দরকার তা পাওয়া যাবে না।

বৃহত্তম দূরবিনেও নিকটতম তারার গ্রহ দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু পরোক্ষ ইঙ্গিত কিছু পাওয়া গিয়েছে চলার পথে তারাদের বেহিসাবী নড়াচড়া দেখে। যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রাউল মানমন্দিরে পিটার ভ্যান দে কাম্প ১৯৭৩ সাল থেকে খোঁজ শুরু করেছিলেন, ১৯৬০ দশকের শেষে প্রমাণ পান যে আমাদের ৫·৯ আলোকবর্ষ দূরে বার্নাডের তারাকে ঘিরে ঘুরছে শনির সমান দুই গ্রহ। যেমন সৌর লোকে, তেমন এরও আরও ছোট গ্রহ হয়তো আছে, টান দুর্বল

বলে ধরা পড়ছে না। ১৯৬৯ সালের এক খবর অনুসারে একই পদ্ধতি ব্যবহার করে ইনি ষাটটি নিকটবর্তী তারার মধ্যে সাতটির অদৃশ্য তারা ধরতে পেরেছেন, কিন্তু কোনওটিই প্রাণের উপযোগী নয়। ১৯৭২ সালে ইনি এপ্‌সিলন এরিডানির (১০·৭ আলোক বর্ষ দূরে) একটি অদৃশ্য সঙ্গীর ইঙ্গিত পান। এরিডানি উজ্জ্বল হলুদ-কমলা রঙের তারা, অনেকটা আমাদের সূর্যের মত, ভর তার সাত দশমাংশ, দীপ্তি ৩০ শতাংশ; এর থেকে জল্পনা হয় যে হয়তো সেও প্রাণোপযোগী তেজ বিকিরণ করে, এবং কিছু কাল তার দিকে রেডিও দূরবিন লক্ষ করা হয়েছিল যদি কোনও বার্তা পাওয়া যায় এই আশায়। যাই হক, ভ্যান দে কাম্‌প এবং সহকর্মীরা আট শতাধিক ছবির সাহায্যে এরিডানির চলন বিচ্যুতি মেপে তার থেকে হিসাব করেন যে সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে যা দূরত্ব তার প্রায় আট গুণ দূরে একে প্রদক্ষিণ করছে এক সঙ্গী, ২৫ বছরে এক বার করে; এত দূরে সম্ভবত পার্থিব প্রাণের উপযোগী তাপ পৌঁছায় না। কিন্তু এই সঙ্গীটি হয়তো এক অভিনব বস্তু; বৃহস্পতির অন্তত ছ গুণ ভারী সে, এত বড় জ্যোতিষ্ককে ঠিক গ্রহ বলতে দ্বিধা হয়; তবু তার ভর সূর্যের শতাংশেরও কম, তাই সম্ভবত গর্ভে পারমানবিক চুলা জ্বলে নি। হয়তো এই 'তারা-গ্রহ'দের ব্যাখ্যার জন্য নতুন তত্ত্ব দরকার। এ সব ছাড়া জানা আছে ১১ আলোকবর্ষ দূরে ৬১ সিগ্‌নি তারার একটি গ্রহ আমাদের পাঁচ বছরে তাকে এক বার পাক খায়।

সম্প্রতি রেডিও দূরবিনের সাহায্যে মহাকাশে একের পর এক কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার হয়েছে, তাতে বিশ্ব জগতে প্রাণের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। তারায় তারায় যে অপরিমেয় দূরত্ব তা বস্তুশূন্য নয়, সেখানে হাইড্রোজেন ছাড়াও জল বাষ্প, কারবন মনক্‌সাইড, অ্যামোনিয়া, ফর্মিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল ইত্যাদি জটিল থেকে জটিলতর অণু ধরা পড়েছে। পৃথিবীর আবহে যে সব গ্যাস থেকে প্রাণের উদ্ভব আমরা আলোচনা করেছি তাদের সঙ্গে এগুলির মিল দেখা যায়, কারবন নাইট্রোজেন অক্‌সিজেন হাইড্রোজেন এই মৌলিক পদার্থগুলি সবই এদের মধ্যে বর্তমান। আমরা এও দেখেছি যে উলকাতে অস্বাভাবিক দক্ষিণপন্থী অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কারের থেকে সন্দেহ করা হয় এগুলির উৎপত্তি বহির্বিশ্বে। শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালে কলাম্‌বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কর্মী মহাকাশে আবিষ্কৃত চারটি বস্তু

(অ্যামোনিয়া, মিথাইল অ্যালকোহল, ফর্মাল্‌ডিহাইড ও ফর্মিক অ্যাসিড) মিশিয়ে তাদের উপর অতিবেগনি রশ্মি ফেলে কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড বানিয়েছেন যা আমাদের প্রোটিনে থাকা প্রাণ ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মিশ্র গ্যাসে জলের চিহ্ন মাত্র ছিল না, তার থেকে এই কথা উঠেছে যে অন্য গ্রহে হয়তো জলের বদলে তরল অ্যামোনিয়া কাজ করে। পার্থিব প্রাণী দেহে জৈব বস্তুগুলি জলে গুলে যায়, তাতে পারস্পরিক প্রক্রিয়া সহজ হয়, কিন্তু অ্যামোনিয়ার দ্রাবক শক্তি ও অন্যান্য গুণ অনেকটা জলেরই মত।

কথাটা নতুন নয়, ১৯৬৪ সালে বিখ্যাত জীববিৎ জে বি এস হল্‌ডেন বলেন জলের বদলে তরল অ্যামোনিয়ার উপরও জৈব রসায়ন গড়ে উঠতে পারে। রাসায়নিক সাদৃশ্যের সূত্র ধরে কারবনের বিকল্পে সিলিকন বা সেলিনিয়াম ধাতু প্রস্তাবিত হয়েছে। কেউ কেউ এমন দুঃস্বপ্নও কল্পনা করেছে যে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড জলের কাজ করছে অথবা গ্রহের বাতাস ফ্লুয়োরিন গ্যাসের তৈরি ; প্রথমটি আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক বিষ, দ্বিতীয়টির ছোঁয়া লাগলে গা পুড়ে যায়। অক্‌সিজেনশূন্য বাতাস কল্পনা করা অত কঠিন নয়, কারণ পৃথিবীরই প্রথম প্রাণীদের তা দরকার ছিল না, বরং তা ছিল মারাত্মক। যাই হক, এটা ঠিক যে ভিন্ন রাসায়নিক ভিত্তিতে গড়া প্রাণীরা হবে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, মহাকাশের অভিযাত্রী যদি কোথাও গিয়ে তাদের মুখোমুখি হয় তবে তাদের মনে হবে উদ্ভট, ভয়ংকর বা কদর্য ; কিন্তু এই সব পার্থিব সংস্কারের বশে পালিয়ে গেলে চলবে না, হয়তো তাদের বুদ্ধি বা স্বাভাবিক মিষ্টতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

কিন্তু এ রকম সাক্ষাতের সম্ভাবনা কতটুকু? পৃথিবীর থেকে মুক্তি পেতে যে বেগ দরকার (ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল) সেই বেগে আমাদের যান ছুটলেও নিকটতম প্রাণোপযোগী তারায় পৌঁছাতে লাগবে আড়াই লক্ষ বছরের বেশী। কিন্তু রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে বা দেহের তাপ খুব নিচে নামিয়ে শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি এত মৃদু মন্থর করে দেওয়া যায় যাতে মানুষ বার্ধক্যের দিকে এগোবে অনেক ধীরে, অর্থাৎ তার আয়ু বেড়ে যাবে অনেক গুণ। মহাকাশের নাবিকদের হয়তো এই রকম ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে বহু কালের মত, তার পর পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী

লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে তারা জেগে উঠবে। আর একটি সম্ভাবনা আছে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বে। আলোর ৯৯ শতাংশ বেগে ছুটলে ১০·৪ আলোকবর্ষ দূরে প্রোসায়ন তারায় গিয়ে ফিরে আসতে লাগবে ২১ বছর, কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে যাত্রীর বয়স বাড়বে মোটে তিন বছর, তার ঘড়িও তাই বলবে। অনুরূপ বেগে ছায়াপথের বাইরে অ্যান্‌ড্রমিডা নীহারিকা ঘুরে আসতে নাবিকদের বয়স বাড়বে মোটে ৫৫ বছর—ফিরে এসে তারা হয়তো দেখবে ৪০ লক্ষাধিক বছর প্রাচীন পৃথিবাতে তখন মানুষই নেই, থাকলেও এই আশ্চর্য কীর্তি সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন! কিন্তু মানুষবাহী যান এতটা বা এর তুল্য দ্রুতি কোন শক্তিতে পাবে, প্রায় আলোর পাখায় ভর করে কি করে চলবে তা এখনও কল্পনা করা যায় না।

যা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত হতে পারে তা হল দূর জগতের মানুষের সঙ্গে যোগ স্থাপন। হয়তো লেজ়ার বা রেডিও/রাডার এদের উদ্দেশ্যে সংকেত বহন করে নিয়ে যাবে। লেজ়ার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আবিষ্কার এক শ্রেণীর দৃশ্যগোচর আলো, তার রশ্মি সমান্তরাল ও সংহত বলে তীক্ষ্ণতা ও শক্তি অসাধারণ। যে সব তারার প্রাণোপযোগী গ্রহ থাকতে পারে তাদের মধ্যে নিকটতম দুটি (এপ্‌সিলন এরিডানি ও টাউ সেটি) আছে দশ আলোকবর্ষের অল্প বেশী দূরে, লেজ়ার বা রেডিও বার্তার জবাব আসতে প্রায় ২১ বছর লাগবে, এবং হিসাবে দেখা গিয়েছে যে এই পরিধির মধ্যে সংকেত পাঠিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা দশ লক্ষে এক। যারা অতিজ্ঞানী তারা হয়তো জবাব দেওয়াও দরকার মনে করবে না। অনেকের মতে এমন চেষ্টার চেয়ে বরং অন্যদের বার্তার প্রতি কান পেতে থাকাই বেশী লাভজনক হবে। আরমেনিয়ায় অনুষ্ঠিত উপরোক্ত আন্তর্জাতিক সভা এক বাক্যে এই প্রচেষ্টার সমর্থন করেছে, সেখানে রুশরা খবর প্রকাশ করে তাদের রেডিও দূরবিন এখনই পঞ্চাশটি নিকট তারার দিকে কান খাড়া করে অনুসন্ধানরত। যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ সাইক্লপ্‌স উদ্যোগের আলোচনা চলছে। অবশ্য এই রকম অনুসন্ধানে নিয়মিত সংকেত পেয়ে এর আগেই আমেরিকা ও রাশিয়ায় কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, পরে দেখা গেল প্রথমটি আসছে এক গোপন রাডার পরীক্ষার থেকে,

দ্বিতীয়টি এক কোত্থেকে থেকে। ইংরেজ জ্যোতিষীরা যখন প্রথম পাল্‌সারের রেডিও ধ্বনি শুনলেন তখন তাও দূর গ্রহের বার্তা বলে সন্দেহ করা হয়।

মহাকাশের ভাষা কি হবে, কি করে এক গ্রহের বাসিন্দা অন্য গ্রহে তার কথা বোঝাবে? হয়তো প্রথম সম্ভাষণটি হবে সংখ্যার দ্বারা, এবং তা জানানো হবে সহজ টেলিগ্রাফীয় সংকেতে। আলাপের প্রাথমিক বিষয়টি হবে এমন সব জ্যোতিষ্ক যা দুই অঞ্চল থেকেই দেখা যায়। এই রকম জ্যোতিষ্কের ব্যাসকে দৈর্ঘ্যের মাপ এবং আলোর দ্রুতিকে কালের মাপ বলে ধরা যেতে পারে, কারণ তা সবার চোখেই সমান।

চিত্ররূপী বাণী পাঠানোও সম্ভব হতে পারে। টেলিগ্রাফের ভাষায় বিন্দু ও রেখা দরকার মত সাজানো হবে, একটি উজ্জ্বল আর একটি অনুজ্জ্বল অংশের জন্য। দুইয়ে মিলে সাদা কালো এক মূর্তি গড়ে উঠবে। যুক্তরাষ্ট্রে এক পরীক্ষায় এমন এক বাণী কয়েকটি বিজ্ঞানীকে পাঠানো হয়েছিল, অনেকেই অতি অল্প সময়ে বিন্দু ও শূন্য স্থান যথাযথ সাজিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার করেছিলেন। মর্ম এই যে এক তারার চতুর্থ গ্রহে আছে এক দ্বিপদ জাতির বাস, তাদের দুই লিঙ্গ; তারা মহাকাশ বিহার শিখেছে, প্রতিবেশী গ্রহে গিয়ে সেখানে মাছের মত সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কার করেছে; এই মানুষরা সাড়ে সাত ফুট লম্বা, তাদের হাতে ছয় আঙুল, এমনি আরও কিছু কিছু খবর।

দূর গ্রহের বার্তা যদি ধরা পড়ে তো তার একটা কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মহাকাশে দিকে দিকে যারা তা পাঠাবার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রগতি সভ্যতা সংস্কৃতি হয়তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রাচীন ও অগ্রসর। বর্তমান মানুষের যে সব দুরূহ সমস্যার কথা গত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তারা অনেক আগেই তার সমাধান করে থাকতে পারে। কল্পনার রাশ একটু ছেড়ে দিলে আশা করা যায় সেই জ্ঞানের ভাগ পেয়ে আমাদের উপকার হবে।

নির্ঘণ্ট

পরিভাষা

অক্ষ axis
অক্ষ বিচলন nutation
অক্ষাংশ latitude
অগস্ত্য Canopus
অতিদানব (তারা) supergiant
অতিনোভা supernova
অতিবেগনি ultra-violet
অধিবৃত্ত parabola
অনন্ত infinity
অবতল concave
অন্ধকূপ black hole
অবলোহিত infra-red
অভিকর্ষ gravity
অভিজিৎ Vega
অয়নচলন precession
অস্থিরদ্যুতি (তারা) variable
—গ্রহণী অস্থিরদ্যুতি eclipsing variable
—প্রকৃত অস্থিরদ্যুতি intrinsic variable

আঙ্গারিক গ্যাস carbon dioxide
আপেক্ষিকতা relativity
আবহ atmosphere
আবহাওয়া weather
আয়ত ক্ষেত্র rectangle
আয়ন মণ্ডল ionosphere
আলোক মণ্ডল (সূর্য) photosphere

উচ্চভূমি highland
উত্তল convex
উপগ্রহ satellite
—কৃত্রিম উপগ্রহ artificial satellite

উপবৃত্ত ellipse
উর্বরতা সাগর (চাঁদ) sea of fertility

উলকা meteor, meteorite

এক-বংশীয় (তারা) Population I
একীভূত ক্ষেত্র unified field

কক্ষ orbit
কর্কটক্রান্তি summer solstice
কর্কট নেবুলা crab nebula
কলা phase
কালপুরুষ Orion
কুণ্ডলী পুঞ্জ galactic cluster
কোআজ়ার quasar, quasi-stellar radio source

ক্ষুব্ধ মণ্ডল troposphere

খাদ crater

গ্রহাণু, গ্রহিকা asteroid
গোল পুঞ্জ globular cluster

গোলার্ধ hemisphere
ঘন cubic
ঘূর্ণবাত tornado
ঘূর্ণি নীহারিকা Whirlpool galaxy

চাপ pressure ; arc
চুম্বক মণ্ডল magnetosphere
চুম্বকী ক্ষেত্র magnetic field

ছায়াপথ Milky Way

জলবায়ু climate

ঝটিকা সাগর (চাঁদ) sea of storms

তল area
তারামণ্ডল constellation
তেজ energy

দানব (তারা) giant
দুই-বংশীয় (তারা) Population II
দেশ space

নতি inclination
নাভি focus, centre
নিয়ত বায়ু trade wind
নিরক্ষ রেখা equator
নিহিত দ্যুতি intrinsic brightness
নীল নাক্ষত্র বস্তু blue stellar object
নীহারিকা galaxy
—অবিন্যস্ত irregular
—উপবৃত্তিক elliptical
—কুণ্ডলিত spiral
—দণ্ডিত কুণ্ডল barred spiral
নোভা nova

প্রজাতি species
প্রতিফলন reflection
প্রতিবস্তু antimatter
প্রতিসরণ refraction
প্রতীপ গতি retrograde motion
প্রদক্ষিণ revolution
প্রধান অনুক্রম (তারা) main sequence
প্রশান্তি সাগর (চাঁদ) sea of serenity

বর্ণ মণ্ডল (সূর্য) chromosphere
বর্ণাপেরণ chromatic aberration
বর্ণালী spectrum
—বিকিরণ emission
—বিশোষণ absorption
বর্ষণ সাগর (চাঁদ) sea of rains
বলয় (শনি) ring
বহির্মণ্ডল exosphere
বহির্মুখী বেগ centrifugal force
বহুসঙ্গী তারা multiple star
বামন (তারা) dwarf

বায়ুমণ্ডল atmosphere
বিকিরণ radiation
বিকিরণের বলয় radiation belt
বিদ্যুৎ-চুম্বকী electromagnetic
বিষুব equinox
—মহাবিষুব vernal equinox
বুধ Mercury
বৃষ Taurus
বৃহস্পতি Jupiter
বেষ্টনী belt
ব্যস্ত অনুপাত inverse ratio
ব্যাস diameter
ব্যাসার্ধ radius
বংশকণা gene

ভর mass
ভরবেগ momentum
—কৌণিক ভরবেগ angular momentum
ভূমিক্ষয় erosion

মকরক্রান্তি winter solstice
মঙ্গল Mars
মধ্য মণ্ডল mesosphere
মহাকর্ষ gravitation
মহাকাল time
মহাকাশ space
মহাজাগতিক রশ্মি cosmic ray
মাত্রা dimension
মান (তারা) magnitude
মেরুজ্যোতি aurora
মৌলিক পদার্থ element

যুগ্ম তারা binary star, double star

লম্বন parallax
লাল অপসরণ red shift
লুব্ধক Sirius

শক্তি energy
শনি Saturn
শান্তি সাগর (চাঁদ) sea of tranquillity
শিশুমার Ursa minor
শীতল সংগ্রহ cold accretion
শুক্র Venus

সপ্তর্ষিমণ্ডল Great Bear
সমক্ষেত্র, সমভূমি plane
সমান্তরাল parallel
সমুদ্রপৃষ্ঠ sea level
সৌর উৎক্ষেপ solar prominence
সৌর কলঙ্ক sunspot
সৌর বায়ু solar wind
সৌর মুকুট solar corona
সৌর শিখা solar flare
স্তব্ধ মণ্ডল stratosphere
স্বকীয় দ্যুতি intrinsic brightness
স্বাবর্তন rotation

'বিশ্ব বিচিত্রা' পাঠককে নিয়ে যাবে মহাকাশ ও জ্যোতির্লোকের পরিক্রমায়—ব্রহ্মাণ্ড, নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উলকা, ধূমকেতু ইত্যাদির সঙ্গে একে একে পরিচয় করাতে। এ বইতে এই সব জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ছাড়া আছে নতুনতম আবিষ্কারের খবর, মহাকাশ অভিযানের কাহিনী, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের ইতিহাস এবং বিশ্বের অন্যত্র প্রাণ আছে কিনা তার আলোচনা। সহজ ভাষা ও সাবলীল রচনাভঙ্গির গুণে কঠিন বিষয়ও সরল হয়েছে বিজ্ঞান-অজ্ঞানী ও অল্পবয়স্ক পাঠকদের সকলের পক্ষেই। মহাকাশ ও বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে সাধারণের ক্রমবর্ধিষ্ণু কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মেটাতে 'বিশ্ব বিচিত্রা' নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী ও সুযোগ্য বই। এতে পাওয়া যাবে এমন অনেক সাম্প্রতিক তথ্য যা এখনও কোথাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

ডঃ শচীন্দ্রনাথ বসুর রচিত এবং রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত বই 'প্রাগিতিহাসের মানুষ' পড়ে যাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা জানেন সহজ ভাষায় সাধারণের জন্য বিজ্ঞান পরিবেশনের ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। কারণ তিনি একাধারে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক।

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী

Basu, Sachindranath : VISVA VICHITRA (Bengali)
1974 Rs. 12·50